আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় মৃৎশিল্প – এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা :

চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল (ইতিহাস)
উপাধির জন্য প্রদত্ত – গবেষণা সন্দর্ভ

সায়নী রায়
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৬-২০১৯
ক্রমিক সংখ্যা(শ্রেণী) - ১০১৬০০৬০৩০১০
ক্রমিক সংখ্যা(পরীক্ষা সংক্রান্ত) – MPHFHI1901
রেজিস্ট্রেশন নং - ১৩৮৫২৮ (২০১৬-২০১৭)

ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা – ৭০০০৩২

CERTIFICATE

Date: 13.05.2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the dissertation titled "**আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় মৃৎশিল্প - এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা : চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড়**" being submitted by Ms. Sayani Roy has been written under my guidance and supervision during 2017-2019.

This dissertation is approved for the submission towards the partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Philosophy, in the faculty of Arts, Jadavpur University.

Chandrani Banerjee Mukherjee
13/05/19

Supervisor
Dr. Chandrani Banerjee Mukherjee
Assistant Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata – 700032

ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF HISTORY
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA - 700 032

13/5/19

Head of the Department
Department of History
Jadavpur University
Kolkata – 700032

Head
Department of History
Jadavpur University
Kolkata- 700 032

Scanned by CamScanner

DECLARATION

I, Ms, Sayani Roy, Roll Number - MPHFHI1701 do hereby declare that the dissertation titled "আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় মৃৎশিল্প - এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা : চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড়" submitted by me in order to fulfill the partial requirement for the degree of Master of Philosophy (M.Phil) in History at Jadavpur University, session 2016-2019.

This work is original and no part of it is submitted anywhere else for any other degree or diploma.

Sayani Roy
13.05.2019
(Signature of the Student)

Scanned by CamScanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এম.ফিল উপাধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণা পত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে। এই কাজটি সম্পূর্ণ করার পশ্চাতে একাধিক মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের অবর্ণনীয় ভূমিকা রয়েছে, যাদের কথা না বলতে পারলে পুরো কাজটিই আদতে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-কে, যারা আমাকে এই গবেষণা কার্যটি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ডঃ চন্দ্রানী ব্যানার্জী মুখার্জী মহাশয়ার নিকট। তাঁর সু-পরামর্শ, উৎসাহ, বিপুল সহযোগিতা ও সস্নেহ তত্ত্বাবধান এই গবেষণা নিবন্ধটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বদা আমার প্রধান পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে। একইসাথে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই প্রফেসর নূপুর দাশগুপ্ত ম্যামকে। তাঁর উপযুক্ত পরামর্শ, সহায়তা, উপদেশ আমাকে প্রতিটি মুহূর্তে প্রকৃত ইতিহাস বোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং সমগ্র গবেষণা পত্রটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রধান অনুপ্রেরণা প্রদান করেছে। উভয়ের বিপুল সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান ব্যতীত আলোচ্য গবেষণা নিবন্ধটি যে সম্পন্ন হতনা বলা বাহুল্য। শত ব্যস্ততার মাঝেও তাঁরা সর্বদা যেভাবে আমার পাশে থেকেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন আমি প্রকৃতই তাঁদের সান্নিধ্যে কাজ করার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞ। এই উপলক্ষে তাঁদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করছি।

আমার ইতিহাস বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপক, অধ্যাপিকাবৃন্দ যাদের কাছে বিভিন্ন সময় নানান সহায়তা ও পরামর্শ পেয়েছি তাদের প্রতিও আমার ধন্যবাদ ও প্রণাম। পাশাপাশি বিভাগীয়

গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক বনানী রায় এবং জয়শ্রী চৌধুরী দিদিকেও অসংখ্য ধন্যবাদ যারা বিভিন্ন সময়ে নানান রকম ভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন।

পাশাপাশি অন্যান্য একাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিও আমি দায়বদ্ধ ও কৃতজ্ঞ যেখান থেকে সমগ্র গবেষণা পর্ব জুড়ে একাধিক সহযোগীতা লাভ করেছি। যেমন- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহালয় এবং অবশ্যই তাদের গ্রন্থাগার, আশুতোষ সংগ্রহালয়, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার, দ্য রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার, চন্দ্রকেতুগড় স্মৃতি শহীদুল্লাহ মহাবিদ্যালয় এই সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি বিশেষ রূপে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহালয়ের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক জীবনানন্দ বসু সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমার গবেষণার কাজে বিপুল সহায়তা করেছেন।

এই গবেষণার ক্ষেত্রে নানান সময়ে নানাভাবে আমাকে সহায়তা করার জন্য আমি আরও কিছু মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইব। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপিকা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষিকা প্রীতা ভট্টাচার্য দিদিকে, বিভিন্ন সময়ে নানান ভাবে সহায়তা করার জন্য। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য কিছু গবেষক, গবেষিকা বৃন্দ যথা- তৃণা মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ংকরা ভট্টাচার্য, পৌলমী রায়, ইন্দিরা ব্যানার্জী, ঋত্বিক বাগচী, আনিসুল হক, মৌসুমী পাল, শ্রাবন্তী কর্মকার সকলকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমার পাশে থাকার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই আমার পরিবারের প্রতিটি মানুষকে যাদের অদম্য প্রচেষ্টা, অনুপ্রেরণা, বিশ্বাস, সহযোগিতা ও আশীর্বাদ আমাকে মানসিক দৃঢ়তা প্রদান করে এসেছে সর্বদা। প্রথমেই আমার বাবা স্বর্গীয় শ্রী সুভাষ রঞ্জন রায়কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমি কৃতজ্ঞ আমার পরিবারের অন্যান্য প্রতিটি মানুষের নিকট যাদের অবদান আমার জীবনে অপরিসীম। তাদের সকলের অফুরন্ত আশীর্বাদ ব্যতীত জীবনের এই অধ্যায়ে প্রবেশ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হতনা। এই উপলক্ষে তাই আমি আমার জেঠু, বড়মা, মা, ভাই, পিসি, পিসেমশাই সকলকে আমার আন্তরিক প্রণাম ও ভালোবাসা জানাই। এছাড়া আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ আমার মেসোমশাই শ্রী সুব্রত রাহা, মাসি এবং দাদাভাই এর কাছে। এই সমগ্র গবেষণা পর্বে যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা, আশীর্বাদ ও ভালোবাসা ব্যতীত এই সমগ্র কাজটি করে তোলা কখনোই সম্ভবপর ছিলনা তাই তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক প্রণাম। এছাড়াও ধন্যবাদ জানাই আমার বান্ধবী রূপা ঘোষকে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সবসময় আমার পাশে থাকার জন্য এবং গবেষণা কার্যটি সম্পাদনে অনবরত মানসিক বিশ্বাস প্রদান করার জন্য আন্তরিক ভালোবাসা। পাশাপাশি অন্যান্য সেসকল মানুষ যারা নীরবে সর্বদা আমার পাশে থেকেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, সাহস প্রদান করেছেন কিন্তু স্বল্প পরিসরে সকলের কথা উল্লেখ করা সম্ভব নয় তাই সেই সকল মানুষকে আমার ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।

সায়নী রায়
এম ফিল গবেষিকা
ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পৃষ্ঠা

১) সূচনা ১- ১৯

২) প্রথম অধ্যায় - প্রাচীন বাংলার নির্বাচিত প্রত্নস্থল চন্দ্রকেতুগড়-মহাস্থানগড়ঃ প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যালোচনা ২০-৬৯

৩) দ্বিতীয় অধ্যায় - চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড়ের শিল্পধারাঃ এক প্রতীকী অনুসন্ধান ৭০- ১১১

৪) তৃতীয় অধ্যায় - আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় টেরাকোটা ও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা ১১২- ১৬৬

৫) চতুর্থ অধ্যায় - প্রাচীন বঙ্গের মৃৎশিল্প ও সামাজিক প্রেক্ষিত ১৬৭ -২০১

৬) উপসংহার ২০২ – ২১২

৭) গ্রন্থপঞ্জী ২১৩ – ২২২

সূচনা

মানুষের দৈনন্দিন ব্যস্ততা, ক্লান্তি, অবসাদকে মুহূর্তে ঘুচিয়ে তার অন্তরের সৌন্দর্যবোধ, নান্দনিকতা, সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটায় যে উপাদান তা হল তার শিল্পস্বত্তা। নিয়ম মাফিক শিল্পী না হলেও কম বেশি প্রায় সকলেই কোন না কোন শিল্পরসে সমৃদ্ধ, হয়তো তার ক্ষেত্রটি কেবল আলাদা। আর সেকারণেই শিল্প ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্র আজ ব্যাপক ও সুপ্রসারিত। কখনো মৃৎশিল্প, কখনো রং তুলির চিত্রণ, কখনো পাথরের স্থাপত্য-ভাস্কর্য, আবার কখনো কাষ্ঠশিল্প, শঙ্খশিল্প, কাঁথাশিল্পের ন্যায় কারিগরী শিল্প থেকে বর্তমান অত্যাধুনিক গ্রাফিক্স বা ডিজিটাল কার্টুন প্রভৃতি কোনকিছুকে বাদ দেওয়াই সমীচীন হবেনা– এই সবকিছুকে নিয়ে আজ শিল্পইতিহাসের বিশ্ব সংসার।

উল্লেখ্য ভারতীয় ইতিহাসের পরিধি বর্তমানে ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত, অতীতের রাজনৈতিক পরিচিতির সীমানা অতিক্রম করে তা পৌছে গেছে সমাজের নানান প্রান্তে, নানান বিচিত্র মাধ্যমের ধারক ও বাহক রূপে। বিগত বেশ কিছু সময়ে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষীকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে নতুন নতুন অসংখ্য ক্ষেত্র বা বিষয়ের ওপর গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু সম্প্রসারিত হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম নিঃসন্দেহে এই শিল্পচর্চার ইতিহাস। শিল্পের সংজ্ঞা প্রদানে ঐতিহাসিক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, মানুষ তার জীবনধারণের প্রয়োজন মেটাতে যা তৈরি করে তার মূলে থাকে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান, অনেক সময় প্রয়োজনীয় বস্তুর বাইরেও সে এমন অনেক সম্ভার তৈরি করে যা হয়তো জাগতিক ভাবে অপ্রয়োজনীয় কিন্তু সেগুলি দেখেও মনে নিঃস্বার্থ আনন্দ, ভালোলাগা তৈরি হয় যার উৎস বিশুদ্ধ শিল্পবোধ। শিল্প মানুষের নান্দনিক সৃষ্টি ক্ষমতার মূর্ত প্রকাশ, যার স্রষ্টা হলেন শিল্পী।[১] অর্থাৎ শিল্পকর্ম বস্তুতপক্ষে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার মধ্যে শিল্পী, শিল্পকর্ম বা শিল্পবস্তু এবং সাধারণ মানুষ পরস্পর পরস্পরের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে। শিল্পকলার সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সম্পর্ককে অনুধাবন করা যায় এবং সমসাময়িক ইতিহাসের সমাজ গঠন প্রক্রিয়াকেও চিহ্নিত করা যায়। শুধু সমাজ নয় শিল্পের সাথে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় মতাদর্শ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ঐতিহ্য সবকিছু বিশেষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর মধ্য দিয়েই জীবনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম দিকগুলিকেও সহজ সরল ও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভবপর হয়।

সভ্যতার সেই আদিপর্ব থেকেই মানুষের মধ্যে নান্দনিকতার সূক্ষ্ম ধারা নিহিত ছিল, যার প্রকাশ মানুষ ঘটিয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমকে আশ্রয় করে। বর্তমানে আলোচ্য গবেষণা পত্রটির মূল আলোচনা ‘পোড়ামাটি শিল্প’ কেন্দ্রিক যার নিদর্শন মেলে ইতিহাসের সুদূর গভীরে।

সার্বিকভাবে আদিমতম মৃৎশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় মেহেরগড়ের প্রথম পর্ব থেকে, উৎখননকারীগন যার সময়সীমা অনুমান করেন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম সহস্রাব্দ তবে তা পোড়ামাটি ছিলনা। 'টেরাকোটা' বা 'পোড়ামাটি'র উপকরণ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় মেহেরগড়ের ৩য় পর্যায়ে এবং ক্রমে তার বিকাশও পরিলক্ষিত হয় ৪র্থ থেকে ষষ্ঠ পর্যায়ের মধ্যবর্তী সময়কালে যার ফলস্বরূপ একাধিক নারী ও পুরুষ মূর্তিরও সন্ধান পাওয়া যায় উক্ত প্রত্নস্থলের সাম্প্রতিক স্তরগুলিতে। মেহেরগড়ের এই ধরনের অবয়বগুলিকে সাধারণত শিল্পক্ষেত্রে মানবীয় উপস্থাপনার অগ্রদূত বলে মনে করা হয়ে থাকে ।[২] আর ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রায়-ঐতিহাসিক পর্যায় বা হরপ্পা সভ্যতার কালপর্ব থেকে শুরু করে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজও সমৃদ্ধ টেরাকোটা শিল্প সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যা ইতিহাসে এই শিল্পকে এক বিশেষ স্থান প্রদান করে।

প্রশ্ন হল এই 'টেরাকোটা' ঠিক কি? সেক্ষেত্রে বলা যায় এটি মূলত একটি লাতিন শব্দ যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'পোড়ামাটি' বা ইংরেজিতে 'Fired Clay'. এই মৃত্তিকা সাধারণত সিলিকা, লোহা, চুন, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি যৌগ সহযোগে গঠিত নমনীয় আঠালো পদার্থ ; জলের সংমিশ্রণে যাকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করা বা রূপ দেওয়া যায় সহজেই এবং তারপর তাকে শুকনো করে সাধারণত ৭৫০°-৮০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মোটামুটি প্রায় ৬-৮ ঘন্টা আগুনে পোড়ানো হয়। তবে এক্ষেত্রে পোড়ানোর সময়সীমা সাধারণত উক্ত নির্মিত উপকরণের আকৃতি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে থাকে। এই প্রক্রিয়ার পর তা দৃঢ় ও স্থিতিশীল হয় এবং পোড়ামাটি উপকরণ রূপে পরিচিতি লাভ করে।[৩] তবে এটি টেরাকোটা প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় একেবারেই জটিলতা বিহীন অতি সহজ সরল প্রাথমিক ধারণা, ইতিহাসের সুদীর্ঘ অধ্যায়ের সাক্ষী এই শিল্পধারা সম্পর্কে যা একেবারেই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে নানাবিধ প্রযুক্তি, কলা কৌশল যা সময়ের ব্যবধানে নানারুপে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। তা খুব স্পষ্টতই সমাজের প্রযুক্তিগত বিবর্তন ও শিল্পী বা কারিগর সম্প্রদায়ের কর্মের প্রতি দক্ষতা, দায়বদ্ধতা সর্বোপরি সমাজে উক্ত দ্রব্যাদির চাহিদা হ্রাস-বৃদ্ধির ইঙ্গিতবাহী।

এক্ষেত্রে প্রধান আলোচ্য কেন্দ্র হল বাংলা, সমগ্র আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ে (আনুমানিক তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দ) ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্প এক সম্পূর্ণ নতুন সংজ্ঞা লাভ করে যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বঙ্গীয় টেরাকোটা। উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা কেন্দ্রিক বিস্তৃত উত্তর ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্প উক্ত প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে প্রযুক্তিগত, গুনগত, বিষয়গত, সংখ্যাগত বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন করে। প্রাকমৌর্য পর্ব থেকে শুরু করে প্রায় গুপ্ত পর্ব পর্যন্ত এই শৈলীর সন্ধান পাওয়া যায় বৈশালী, কুমরাহার, বুলন্দীবাগ, পাটলিপুত্র, রাজগীর, অহিচ্ছত্র, ভিটা, হস্তিনাপুর, কৌশাম্বী,

মথুরা, রাজঘাট প্রভৃতি অজস্র কেন্দ্রে। যেখানে কালভেদে নানান নতুন চরিত্র বৈশিষ্ট্য অর্পিত হয় উক্ত ধারায়, আর বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়। নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা বা বঙ্গীয় পটভূমিতেও আদি ঐতিহাসিক পর্বে সমৃদ্ধ টেরাকোটা শিল্পধারার বিকাশ ঘটে, আবিষ্কৃত অসংখ্য টেরাকোটা সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল যার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রূপে দণ্ডায়মান। যার মধ্যে বর্তমান পরিসরে বিশেষ উল্লেখ্য 'চন্দ্রকেতুগড়' ও 'মহাস্থানগড়' প্রত্নস্থলদ্বয়, এই দুই অঞ্চলকে ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রধান কেন্দ্র রূপে নির্বাচন করা হয়েছে। তবে আদি ঐতিহাসিক বাংলার টেরাকোটা শিল্প ইতিহাস কিন্তু এই দুই কেন্দ্রের মধ্যে কখনোই সীমিত থাকেনা, আরও টেরাকোটা সম্বলিত একাধিক প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া যায় আলোচ্য প্রেক্ষাপটে। যেমন তমলুক, বাহিরি, পান্না, তিলদা, মঙ্গলকোট, পাণ্ডু রাজার ঢিবি, হরিনারায়নপুর, তিলপি, ধোসা প্রভৃতি আরও অন্যান্য যারা আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় টেরাকোটার চরিত্র নির্ধারণে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে স্বল্প পরিসরে সকল প্রত্নস্থলের ওপর সমান গুরুত্ব প্রদান সম্ভবপর নয় ফলত নির্দিষ্ট অংশের প্রয়োজনে বঙ্গীয় বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্র গুলিতে আলোকপাত করা হলেও বিশেষ রূপে চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড়কে প্রধান কেন্দ্র রূপে নির্বাচন করা হয়েছে।

'চন্দ্রকেতুগড়ে'র খুব বেশি পরিচয় দেওয়ার হয়তো প্রয়োজনীয়তা নেই কেননা তার সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ টেরাকোটা শিল্পের বিস্তার ইতিহাসে তার পরিচয় তৈরি করেছে এবং এর ব্যপ্তি এত বেশি যে বঙ্গীয় অন্য সকল প্রত্নস্থলকে তা ছাপিয়ে যায়। তা স্বত্তেও বলা যায় অধুনা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা থানার অন্তর্ভুক্ত বেড়াচাঁপা অঞ্চলে বিদ্যাধরী নদী সংলগ্ন ভাবে একাধিক গ্রামের সমন্বয়ে এই অঞ্চল অবস্থিত। প্রাকমৌর্য পর্যায় থেকে শুরু করে প্রাক-গুপ্ত ও গুপ্ত পর্যায়ের সাক্ষ্য বিদ্যমান এঅঞ্চলে। বিভিন্ন দেবদেবীর অবয়ব, যক্ষ- যক্ষিণী, পশুপাখি, কৃষি-শিকার, নৃত্য-গীত, মিথুন ফলক, নানা কাহিনী সম্বলিত বর্ণনামূলক ফলক প্রভৃতি নানান ধাঁচের জাঁকজমকপূর্ণ পোড়ামাটি উপাদান ছাড়াও এন বি পি এবং রুলেটেড সহ নানান রীতির মৃৎপাত্র , বিভিন্ন প্রস্তর ও টেরেকোটার পুঁতি, শাঁখের বালা, হাতির দাঁতের উপকরণাদি, হাড়ের উপাদান, পাঞ্চ মার্ক কয়েন, কাস্ট কপার কয়েন প্রভৃতি নানান অসংখ্য প্রত্নসম্ভারে পরিপূর্ণ এই অঞ্চল।

অপরদিকে দ্বিতীয় প্রত্নস্থলটি হল অধুনা বাংলাদেশের বগুড়া জেলার অন্তর্গত 'মহাস্থানগড়' অঞ্চল। আমরা জানি দেশবিভাগের সূত্রে আজ বাঙালি ২টি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক পরিসরে অধিষ্ঠিত ; ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অপর দিকে সার্বভৌম রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে তথা অধুনা বাংলাদেশে। কিন্তু প্রাচীন পর্বে তার চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই প্রাচীন বাংলার আলোচনা করলে স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান বাংলাদেশের বহু অংশ তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

উল্লেখযোগ্য ভাবে এই অঞ্চলেও কিন্তু প্রাক-মৌর্য পর্যায় থেকে পাল সেন পর্যন্ত দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রকেতুগড় অপেক্ষা আদি ঐতিহাসিক পর্বের সাক্ষ্য এখানে কিছুটা সীমিত হলেও বিচিত্র টেরাকোটা উপাদান যথা- যক্ষ যক্ষিণী, পশুপাখি, মিথুন শৈলী, কাহিনী সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক সহ অন্যান্য উপাদান যথা পাঞ্চমার্ক মুদ্রা, এন বি পি মৃৎপাত্র, ব্রোঞ্চ দর্পন, সর্বোপরি ব্রাহ্মী লিপি সম্বলিত মৌর্য শিলালিপির প্রাপ্তি বিশেষ রূপে প্রাকগুপ্ত বঙ্গীয় প্রেক্ষাপট সহ প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এই কেন্দ্রকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উভয় প্রত্নস্থলেই কিন্তু মোটামুটি সমজাতীয় প্রত্নউপাদানের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। যেহেতু প্রধান আলোচনা পোড়ামাটি কেন্দ্রিক ফলত উভয় অঞ্চলের টেরাকোটা শিল্পউপাদানগুলি যদি লক্ষ করা যায় দেখা যাবে বাহ্যিক আঙ্গিকে বা সংখ্যাগত উপস্থাপনায় কিন্তু তারতম্য বিদ্যমান। কেননা উভয় ক্ষেত্রের শিল্পধারা দুই পৃথক ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক পরিসরে বিকশিত, ফলত উক্ত পার্থক্য স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষ উল্লেখ্য শিল্পের বাহ্যিক আকার আঙ্গিক ছাড়াও তার বিষয়বস্তু বা সম্পৃক্ত চিন্তন কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা তা সমকালীন মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির ফলশ্রুতি, সুতরাং উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে অবশ্যই মাথায় রাখা প্রয়োজন। শিল্প ইতিহাস চর্চার স্বার্থকতা এখানেই। তা অবয়বের উর্ধ্বে গিয়ে নিহিত পটভূমি, সম্পর্কিত মানুষ ও তার চিন্তনকে প্রকাশ করে বা বলা ভাল দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও তা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ মাধ্যম রূপে কাজ করে।

সমগ্র ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আলোচনার পাশাপাশি কিন্তু বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটেও এই শিল্পধারা সম্পর্কিত একাধিক রচনা বিদ্যমান। ফলত মূল বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে উক্ত তথ্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। আদি ঐতিহাসিক টেরাকোটা শিল্পকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন ঐতিহাসিকরা যা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে নানান বৈচিত্র্যের সংযোগ ঘটায়। কখনো তার ওপর প্রযুক্ত রীতি বা কলাকৌশল এর ভিত্তিতে এই শিল্পের চরিত্র নির্ধারন করা হয় আবার কখনো উপস্থাপিত বিষয়বস্তু, তার ব্যবহার, কিংবা আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত প্রভৃতি নানান দিক থেকে এই শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। যেমন- প্রথমেই বলা যায় ঐতিহাসিক ষ্টেলা ক্র্যামরিশ, এর কথা যিনি 'ইন্ডিয়ান টেরাকোটা'[৪] নামক প্রবন্ধে পোড়ামাটি অবয়বগুলির কারিগরী প্রযুক্তি পদ্ধতি ও সম্ভাব্য ব্যবহারের প্রেক্ষিতে তাকে 'চিরন্তন' (Ageless) ও 'সময়াবদ্ধ' (Timed Variation) এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম প্রকারটি দ্বারা বুঝিয়েছেন মূলত সেই সকল শিল্প উপাদান যেগুলি অপরিবর্তিত রূপে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান এবং অপরটি

সময়ের সাথে পরিস্থিতির সাথে নানান প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারন করেছে। চিরন্তন প্রকৃতির উপাদানগুলি মূলত হাতে তৈরি, খুব সাধারণ আকৃতি বিশিষ্ট যার নিদর্শন হরপ্পা সংস্কৃতি থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতের গ্রামাঞ্চল সর্বত্র মেলে। এর মধ্যে মূলত রয়েছে আদিম মাতৃকামূর্তি ও অসংখ্য পশুমূর্তিগুলি, প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসে যাদের গুরুত্ব অসামান্য। তাঁর মতে এগুলির নির্ধারিত কোনও ব্যবহার নেই, ক্ষেত্র হিসেবে তা যেমন উপাসনার অঙ্গ তেমনি শিশুর নিকট তা খেলনা হিসেবে গৃহীত হতে পারে। অপর দিকে দ্বিতীয় প্রকৃতির শিল্পে ছাঁচের প্রয়োগ বিশেষ লক্ষণীয়। নিত্য নতুন ধাঁচে, নতুন নতুন পদ্ধতি ও বিষয়াদিকে কেন্দ্র গড়ে উঠেছে সময়ের ব্যবধানে। যথা সূক্ষ্ম কারুকার্য সম্পন্ন বিভিন্ন যক্ষ-যক্ষী অবয়ব, মিথুন অবয়ব, পৌরাণিক কাহিনী সম্বলিত উপস্থাপনা প্রভৃতি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তার এই চরিত্রায়ন আজও গবেষকদের নিকট সাদরে গৃহীত। এই বিভাজন ধরেই উত্তর ভারতীয় কেন্দ্র যথা- পাটলিপুত্র, হস্তিনাপুর, বুলন্দীবাগ প্রভৃতি অঞ্চল প্রাপ্ত বিভিন্ন মাতৃ অবয়ব, নাগিনী, পঞ্চচূড়া যক্ষিণী বা পশুপাখি অবয়বগুলিকে তিনি নিখুঁত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ তাদের দৈহিক ভঙ্গিমা, প্রযুক্ত কলাকৌশল, পোশাক, উষ্ণীষের ধরণ প্রভৃতি বিস্তারে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও প্রাক মৌর্য পর্যায় থেকে ক্রমে গুপ্ত পর্বীয় অবয়বের ক্রমবিকাশ এবং এসকল বিভিন্ন অবয়বের সহিত সম্পৃক্ত ধর্মীয়-সামাজিক প্রেক্ষিত ও জীবন দর্শনের দিকগুলিকেও উপস্থাপিত করেন বলা চলে।

আবার অরুন্ধতী ব্যানার্জী তাঁর 'ইমেজ, অ্যাট্রিবিউট ও মোটিফ'[৫] গ্রন্থে সমগ্র উপমহাদেশীয় পটভূমিতে টেরাকোটা শিল্পের ক্রমবিকাশের এক সার্বিক চিত্র তুলে ধরেছেন। সুদূর অতীতে মেহেরগড় সভ্যতা থেকে শুরু করে হরপ্পা সংস্কৃতি এবং পরবর্তীতে আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা ব্যাপী যে সমৃদ্ধ পোড়ামাটি শিল্পধারার প্রসার ঘটেছিল তার এক সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করেছেন। প্রাপ্ত বিভিন্ন অবয়বগুলির ক্রমবিকাশ, তার নির্মাণের উদ্দেশ্য বা সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করেছেন নিজের লেখনীতে।

আদি ঐতিহাসিক পর্বের টেরাকোটা শিল্পক্ষেত্রে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ লেখনী দেবাঙ্গনা দেশাই এর 'সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস'[৬] । তিনি দেখান ভারতে মূলত দুটি কালপর্বে সমৃদ্ধ টেরাকোটার বিকাশ ঘটেছিল; প্রথম, হরপ্পার নাগরিক সভ্যতায় এবং পুনরায় দ্বিতীয় নগরায়ন কালে অর্থাৎ আদি ঐতিহাসিক পর্বে গাঙ্গেয় উপত্যকা ব্যাপী। ফলত তিনি এই শিল্পধারার বিকাশকে মূলত উক্ত পর্বীয় নগরায়ন ও আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির ফলশ্রুতি বলে উল্লেখ করেন। কেননা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা, বাজার, তার পৃষ্ঠপোষক, সেই অনুযায়ী শিল্পের জাঁকজমক বা রুচিশীল চরিত্রের বিকাশ উপযুক্ত নাগরিক পরিবেশেই সম্ভব আর আলোচ্য

অধিকাংশ টেরাকোটা সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল ছিল নগরকেন্দ্র। ফলত তৎকালীন বিকশিত এই সমৃদ্ধ, বিচিত্র শিল্পের চরিত্র একান্তই নাগরিক ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। যদিও এপ্রসঙ্গেই অপর এক মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ, সোনালিকা কল তাঁর সম্পাদিত উক্ত 'কালচারাল হিস্ট্রি অফ আর্লি সাউথ এশিয়া'[৭] গ্রন্থেরই সূচনায় দেশাই এর এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন এই ধরণের শিল্প অবয়বের চরিত্রকে 'গ্রামীণ' বা 'নাগরিক' রূপে আখ্যায়িত করা সম্ভবপর নয়। কেননা এগুলি অধিকাংশ সাধারণ মানুষের ধর্মীয় চিন্তন বা বিশ্বাসের সাথে জড়িত ছিল ফলে উক্ত আদর্শকে বাদ দিয়ে কেবল তাঁর বাহ্যিক চাকচিক্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট রূপে সংজ্ঞায়িত না করার পক্ষেই মত প্রকাশ করেন।

এছাড়া ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্পধারাকে বুঝতে হলে পরমেশ্বরী লাল গুপ্তা, এস কে শ্রীবাস্তব, এস সি কলা প্রমুখের রচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন প্রথমে পরমেশ্বরী লাল গুপ্তার কথা বলা যেতে পারে যার 'গাঙ্গেটিক ভ্যালী টেরাকোটা আর্ট'[৮] নামক গ্রন্থটি আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বিশেষ রূপে পাটনা মিউজিয়াম, এলাহাবাদ মিউজিয়াম, ভারত কলা ভবন, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম সহ অন্যান্য সংগ্রহালয়ে রক্ষিত গাঙ্গেয় উপত্যকীয় টেরাকোটা উপাদান সমূহের বিস্তীর্ণ চিত্র উপস্থাপনা করেন। পাশাপাশি টেরাকোটা শিল্পধারার সহিত সম্পর্কিত নানান প্রযুক্তি পদ্ধতি, সম্প্রসারণের কেন্দ্র, বিষয়বস্তু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রেক্ষিত গুলিকে পৃথক পৃথক অধ্যায়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এস কে শ্রীবাস্তব ও একইভাবে তাঁর 'টেরাকোটাস অফ নর্দান ইন্ডিয়া'[৯] গ্রন্থে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষান ও গুপ্ত পর্বে সম্প্রসারিত টেরাকোটার বিভিন্ন দিক ও ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক গুলিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি মৃৎশিল্পের সহিত সম্পর্কিত নানান দিকের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণে নানা সাহিত্যিক বা তাৎপর্যপূর্ণ লিখিত উপাদানের যুক্তির প্রয়োগ করেছেন তাঁর লেখনী ব্যাপী। এছাড়া এস সি কলার গ্রন্থটির 'টেরাকোটা আর্ট অফ নর্থ ইন্ডিয়া'[১০] তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল তা একপ্রকার ক্যাটালগের কাজ করে। সমগ্র গ্রন্থটি জুড়ে টেরাকোটা চিত্রের বিপুল সম্ভার বিদ্যমান যা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে এক সার্বিক ধারণা পোষণ করে। শিল্পধারার আলোচনায় এজাতীয় চিত্র সম্বলিত গ্রন্থের আবশ্যিকতা নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

এপ্রসঙ্গে অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত,'ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড'[১১]। যেখানে সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় টেরাকোটা শিল্পের এক বিস্তীর্ণ চিত্র উপস্থাপিত। বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক রচিত ভিন্ন অঞ্চল ও সময়পর্বে বিকশিত টেরাকোটা শিল্পইতিহাসের একাধিক প্রবন্ধের উপস্থাপনা রয়েছে গ্রন্থটিতে যা নিঃসন্দেহে আলোচ্য পরিসরে বিশেষ সহায়ককারী উপস্থাপনা। যার মধ্যে বিশেষ রূপে ২টি প্রবন্ধের উল্লেখ করা চলে যা

আলোচ্য পরিসরে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমটি সমীর কুমার মুখার্জ্জী রচিত 'টেরাকোটা আর্ট ইন দ্য গাঙ্গেটিক ভ্যালী আন্ডার দ্য কুষানাস্'[১২], যেখানে লেখক বাংলা সহ সমগ্র গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ব্যাপী বিস্তীর্ণ টেরাকোটায় কুষান শৈলীর বিশেষত্বের দিকটি তুলে ধরেছেন। উক্ত পর্বে এই শিল্পধারার প্রযুক্তিগত, বিষয়বস্তুগত তথা চারিত্রিক বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিকগুলিকে সূক্ষ্ম ভাবে তুলে ধরেছেন। ধর্মীয় অবয়বের পাশাপাশি কিছুটা ভিন্ন প্রবণতা সম্পন্ন অবয়বেরও উপস্থাপনা করেছে এবং পাশাপাশি ধর্মীয় অবয়বের সহিত সম্পর্কিত সাংকেতিক দিকগুলিরও উল্লেখ করেছেন তিনি। অপরদিকে অন্য প্রবন্ধটি হল অশোক কুমার ভট্টাচার্যের 'টেরাকোটাস্ অফ বেঙ্গল', শুঙ্গ কুষান পিরিয়ড[১৩], যেখানে তিনি মূলত শুঙ্গ কুষান পর্বে বিকশিত বঙ্গীয় টেরাকোটার এক বিস্তীর্ণ ধারণা পোষণ করেছেন। প্রবন্ধের প্রথমাংশে বাংলায় টেরাকোটা প্রাপ্তির স্থান সমূহের আলোচনা সহ তার নির্মাণ শৈলী গত বৈচিত্র্য অর্থাৎ হাতে গড়া অবয়ব, চাকা নির্মিত অবয়ব, ছাঁচ নির্মিত পোড়ামাটি ফলক, যুগ্ম ছাঁচ নির্মিত গোলাকৃতি অবয়ব প্রভৃতি বিভিন্ন দিকগুলিকে তিনি তুলে ধরেছেন। অপরদিকে বাকি অংশে তিনি এই শিল্পের বিষয়বস্তুগত দিকটি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন যেখানে 'ধর্মীয়' অবয়ব ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' অবয়বে বিভাজিত করে বিভিন্ন টেরাকোটা অবয়বগুলিকে তাঁর আলোচ্য পরিসরে উপস্থাপিত করেছেন।

এরপর যদি বিশেষ রূপে বঙ্গীয় পরিসরে প্রবেশ করা যায় দেখা যাবে বাংলার টেরাকোটা শিল্প নিয়েও কিন্তু আলোচনা বহুল। প্রথমেই বলা যায় সরসী কুমার সরস্বতীর, 'আর্লি স্কাল্পচার অফ বেঙ্গল'[১৪] আলোচ্য পরিসরে প্রথম দিকের উপস্থাপনা যেখানে অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের পাশাপাশি বাংলার পোড়ামাটি শিল্পধারা বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। প্রায় মৌর্য পর্বের তমলুক, চন্দ্রকেতুগড় থেকে শুরু করে পাল পর্বীয় পাহাড়পুর শিল্পরীতির এক বিস্তীর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে নানান শিল্পশৈলী, রীতি পদ্ধতি, পোড়ামাটি উপাদানের সম্ভাব্য ব্যবহার, তাদের সমস্যা ও বিচিত্র বিষয় সম্পন্ন পোড়ামাটি অবয়বের ক্রমবিকাশ জনিত দিকগুলিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন বঙ্গীয় টেরাকোটা অবয়বের সময়সীমা নির্ধারিত নয়। এর জন্য তিনি সমকালীন প্রস্তর শিল্পের সহিত তুলনামূলক আলোচনা এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের ভিত্তিতে সময়সীমা নির্ধারনের কথা উল্লেখ করেছেন।

এই সূত্রেই বলা যায় বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পধারায় অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা সীমা রায় চৌধুরীর 'স্টাইল এন্ড ক্রোনোলজি' : প্রবলেমস্ ইন ইভলভিং আ টেম্পোরাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য আর্লি হিস্টোরিকাল টেরেকোটাস ফ্রম বেঙ্গল'[১৫] প্রবন্ধটি। যেখানে তিনি যথাযথ উৎখনন নথীর অভাবে বঙ্গীয় টেরাকোটার সময়কাল নির্ধারনের জটিলতার দিকটি উপস্থাপনা করে দেখিয়েছেন

এই সমস্যার দরুন সাধারণত অবয়বের শৈলীর (Style) ওপর নির্ভর করে উত্তর ভারতীয় টেরাকোটা শৈলী কিংবা প্রস্তর শিল্পের সহিত তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে এর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া যথাযথ নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন এবং পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত উৎখনন বা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদানের কথা বলেন। তবে যেহেতু আরোপিত শৈলী যেকোনো শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাই যদিও বা শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলোচনা করতে হয় সেক্ষেত্রে সমজাতীয় ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে অবস্থিত অঞ্চলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় অধিক আলোকপাত করা উচিৎ কেননা ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে ভিন্ন আর্থ-সামাজিক,রাজনৈতিক উপাদানের ফলে শিল্প বিকাশের প্রেক্ষিতও সম্পূর্ণ ভিন্ন, ফলে সেক্ষেত্রে এইরূপ আলোচনা সংশয়াত্মক ফলপ্রদান করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

আবার কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই টেরাকোটাকে তুলে ধরেছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় তার 'টেরাকোটা অবজেক্টস ইন আর্কিওলজিঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি'[১৬] নামক প্রবন্ধে যা আলোচ্য গবেষণা পত্রটির প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তাঁর ক্ষেত্র সমীক্ষার কেন্দ্র বা পরিসর ভিন্ন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেছেন যে এই জাতীয় আলোচনায় কখনোই শিল্পের ফর্ম বা বাহ্যিক আঙ্গিকগত আলোচনার মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিৎ নয়। এসকল অবয়বের সহিত একটি নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপট বা নির্দিষ্ট চিন্তন জড়িত থাকে যার দ্বারা দীর্ঘকাল ব্যাপী তা সমাজে প্রবহমান থাকে। ফলত উক্ত সামাজিক প্রক্রিয়াকে অন্বেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

এরপর এস এস বিশ্বাসের 'টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল'[১৭] এর কথা উল্লেখ্য যেখানে তিনি বঙ্গীয় বিভিন্ন টেরাকোটা সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলের উল্লেখ সহ এই শিল্পধারার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন শৈলী বা ভঙ্গীর দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। তবে শুধু যে অবয়বের বাহ্যিক আঙ্গিক বা শৈলীই যথেষ্ট নয় সে দিকটিও উল্লেখ করেন এবং এর পশ্চাতে নিহিত সামাজিক প্রেক্ষিতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই শিল্পধারাকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন।

আলোচ্য ক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখ্য গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল[১৮] গ্রন্থটি। এটি মূলত কলকাতার স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম এ সংরক্ষিত প্রাচীন বঙ্গীয় বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা উপাদান সমূহের বিস্তীর্ণ উপস্থাপনা, যেখানে সুস্পষ্ট চিত্র সহকারে

বিষয় ভিত্তিক বিভাজন দ্বারা প্রতিটি অবয়বের নিখুঁত বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে। সমগ্র শিল্পধারাকে মোট ৬ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ১) ঐশ্বরিক ও অর্ধ ঐশ্বরিক অবয়ব ২) মিথুন অবয়ব ৩) পশু বাহক ৪) কাহিনী সম্বলিত ফলক ৫) পশুপক্ষী অবয়ব ও ফলক ৬) অন্যান্য। শুধু তাই নয় পাশাপাশি গ্রন্থের প্রথমার্ধে আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পের সাথে সম্পর্কিত পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন দিক এবং প্রত্নস্থল সমূহেরও বিস্তীর্ণ উল্লেখ করা হয়েছে। আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় টেরাকোটা শিল্পের আলোচনায় এটি বিশেষ আকর গ্রন্থ সন্দেহ নেই।

বঙ্গীয় টেরাকোটা শিল্পক্ষেত্রে অন্যতম পথপ্রদর্শক গ্রন্থ অবশ্যই ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত ‘লোকশিল্প বনাম “উচ্চ” মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে’[১৯]। প্রাক গুপ্ত বঙ্গীয় বাংলার বিভিন্ন শিল্পের আভাষ থাকলেও তার রচনাটিতে বিশেষ জায়গা জুড়ে রয়েছে পোড়ামাটি শিল্পের উল্লেখ। যেখানে তিনি উক্ত পর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি-কলাকৌশল, বিচিত্র বিষয় সম্পন্ন টেরাকোটা অবয়বের উপস্থাপনা সহ উক্ত শিল্পের সহিত সম্পৃক্ত বহির্বঙ্গীয় ঐতিহ্যের দিকটিকে উপস্থাপিত করেন এবং বঙ্গীয় টেরাকোটায় উত্তর ভারতীয় আদর্শ কিরূপে সংমিশ্রিত তার আভাষ দেন। পাশাপাশি এই শিল্পের চরিত্র নিয়ে ভাবনার দিকটিকেও সম্প্রসারিত করেন অর্থাৎ বহুক্ষেত্রে খুব সহজ ভাবে এরূপ শিল্পকে লোকশিল্প বা প্রান্তীয় শিল্প রূপে গন্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেছেন একই শিল্পী লোকশিল্পের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ মার্গের শিল্পের সৃষ্টিকর্তা রূপে পরিচিতি লাভ করতে পারে উপযুক্ত আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ পেলে। ফলত সর্বদা শিল্পের মাধ্যম, আর্থ-সামাজিক পটভূমি, পৃষ্ঠপোষকের চরিত্র প্রভৃতি বিষয় খেয়াল রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এরপর নির্বাচিত অঞ্চল কেন্দ্রিক আলোচনা যদি লক্ষ করা যায় প্রথমেই উল্লেখ্য, এনামুল হক চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তার ‘চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেসার হাউস অফ বেঙ্গল টেরাকোটাস’[২০] গ্রন্থে চন্দ্রকেতুগড়ের ভৌগলিক অবস্থান, উৎখনন সংক্রান্ত বিবিধ তথ্যাবলী, ও অন্যান্য প্রত্নসাক্ষ্য সহ প্রায় ৯৬৩ টি পোড়ামাটি অবয়বের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেখানে মৌর্য থেকে গুপ্তপর্ব পর্যন্ত এই শিল্পের রীতি শৈলী, বিষয়বস্তু সহ নানা দিকের পাশাপাশি তৎকালীন শিল্পীদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু চিত্র তুলে ধরেন যা অন্যত্র বিরল। চন্দ্রকেতুগড়ের নাগরিক সংস্কৃতির ইঙ্গিতবাহী রূপে তিনি শিল্পধারার বিকাশকে উল্লেখ করেছেন।

আবার চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কে দীর্ঘ কাজ রয়েছে গৌরীশংকর দে-র। গৌরীশংকর বাবু এবং তার পুত্র শুভ্রদ্বীপ দে কর্তৃক সম্পাদিত দুই খণ্ডে বিভক্ত ‘চন্দ্রকেতুগড় আ লস্ট সিভিলাইজেশন’[২১] নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী রাখে। একটি খণ্ডে(দ্বিতীয়) চন্দ্রকেতুগড়ের অবস্থান, পরিবেশ, বাণিজ্য

বা আনুসাঙ্গিক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিতের উপস্থাপনা করেছেন এবং অপর খণ্ডটি(প্রথম) বিশেষ রূপে শিল্প উপাদান কেন্দ্রিক যার মূল অংশ জুড়ে রয়েছে পোড়ামাটি শিল্প উপাদানের বিস্তৃত বর্ণনা। এনাদের অপর এক গ্রন্থ রয়েছে চন্দ্রকেতুগড় সংক্রান্ত, 'প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়'[২২] যেখানেও প্রায় পূর্বোক্ত গ্রন্থটির ন্যায়ই চন্দ্রকেতুগড়ের সার্বিক দিকের প্রায় সমজাতীয় উপস্থাপনা রয়েছে বাংলায়। যেখানে চন্দ্রকেতুগড়ের পোড়ামাটি শিল্পে উপস্থাপিত বিভিন্ন দেবদেবী উপস্থাপনা, মিথুন ফলক, কাহিনী মূলক ফলক, উপস্থাপিত নৃত্যগীত, শিল্পে বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতি নানান বিষয় সম্পর্কিত একাধিক প্রবন্ধের রয়েছে তাদের উভয় গ্রন্থেই।

চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কিত আলোচনায় অপর যে লেখনী বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তা হল সীমা রায় চৌধুরীর 'আর্লি হিস্টোরিকাল টেরাকোটাস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ স্টাডি ইন থিমস্ অ্যান্ড মোটিফস'[২৩]। তিনি প্রাপ্ত টেরাকোটা অবয়ব সমূহকে থিম (বিষয়বস্তু) ও মোটিফ হিসেবে বিভাজন করে বিভিন্ন অবয়বগুলির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মোট ৭টি থিমের উপস্থাপনা করেছেন এবং উল্লেখ করেন প্রতিটি বিষয় বা থিমের মধ্যে আবার একাধিক মোটিফ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যেমন- ঐশ্বরিক – অর্ধ ঐশ্বরিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রী লক্ষ্মী, পঞ্চচূড়া অবয়ব, লজ্জাগৌরী, স্বপক্ষ অবয়ব প্রভৃতি সবকিছু অন্তর্ভুক্ত যা একাধারে থিম ও মোটিফ উভয় পর্যায়ভুক্ত হতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও 'ইতিহাস অনুসন্ধান', 'জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট', 'পুরাবৃত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকা সমূহে চন্দ্রকেতুগড়ের টেরাকোটা সম্পর্কিত অসংখ্য বিষয় ভিত্তিক প্রবন্ধের উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়, যেমন মিথুন শৈলী কেন্দ্রিক, কাহিনী মূলক শৈলী কেন্দ্রিক, বৈদেশিক প্রভাব কেন্দ্রিক ও আরও অন্যান্য। এই সকল প্রবন্ধের কথা আলোচ্য পরিসরে তুলে ধরা সম্ভবপর নয় কিন্তু তা স্বত্তেও চন্দ্রকেতুগড়ের পোড়ামাটি শিল্প সম্পর্কিত পরিসরে এদের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অপরদিকে চন্দ্রকেতুগড়ের পাশাপাশি মহাস্থানগড়ের কথা যদি উল্লেখ করতে হয় সেক্ষেত্রে প্রথমেই বলা চলে মহাস্থানগড়ের টেরাকোটা সংক্রান্ত আলোচনা কিন্তু অত্যন্ত সীমিত। ফ্রান্স বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত উৎখনন জনিত কর্মকান্ডের (১৯৯৩-১৯৯৯) রিপোর্টে বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত টেরাকোটা অবয়বগুলির উপস্থাপনা থাকলেও এই সংক্রান্ত অন্যান্য সহায়ককারী তথ্য বা সেকেন্ডারি উপাদান কিন্তু একান্তই সীমিত। তা স্বত্তেও অবশ্য উল্লেখ্য যে প্রবন্ধটির কথা বলতে হয় এম এফ ব্যুসাক ও স্যান্ড্রিন গিল রচিত 'মোল্ডেড টেরাকোটা প্লাকস্ ফ্রম মহাস্থান'[২৪] যেখানে উৎখননের স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন টেরাকোটা অবয়বের প্রাপ্তিকে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করা

হয়েছে। তারা উল্লেখ করেছেন মহাস্থানগড়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দিক হল চন্দ্রকেতুগড় বা অন্যান্য গাঙ্গেয় উপত্যকীয় কেন্দ্রের তুলনায় এখানে আদি ঐতিহাসিক পর্বীয় টেরাকোটার প্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে। কিন্তু প্রাপ্ত উপাদানগুলির শৈল্পিক দক্ষতা, উপস্থাপিত বিষয়াবলী বা সংখ্যাগত দিক থেকে অন্যান্য কেন্দ্রের তুলনায় সীমিত হলেও এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ন বিষয় হল, পূর্ববর্তী অধিকাংশ প্রত্নস্থলগুলির ক্ষেত্রে শিল্প উপাদান যত্রতত্র প্রাপ্ত হওয়ায় সময়কাল জনিত সংশয় বিদ্যমান কিন্তু মহাস্থানে অধিকাংশ টেরাকোটাগুলি উৎখনন সূত্রে নির্দিষ্ট স্তরে প্রাপ্ত, ফলে তা কালপর্যায় নির্ধারনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ন। উল্লেখ্য এখানেও কিন্তু মৌর্য রীতি থেকে শুরু করে সমৃদ্ধ শুঙ্গ ও কুষান শৈলীর আড়ম্বরপূর্ণ পদ্মে দন্ডায়মান নারীমূর্তি, অর্ধনগ্ন বা অলংকারে সুসজ্জিতা নারী মূর্তি, মাথায় পাগড়ি পরিহিত বিভিন্ন ভঙ্গিতে দন্ডায়মান পুরুষ মূর্তি, বিচিত্র ভঙ্গিতে যক্ষী মূর্তি, ডানাযুক্ত অর্ধ-ঐশ্বরিক নারী ও পুরুষ মূর্তি, অশ্বারোহী মানব মূর্তি প্রভৃতি একাধিক উপস্থাপনার সন্ধান মেলে।

তারা আরও উল্লেখ করেছেন সাধারণত একই উৎখনন স্তরে বিচিত্র শৈলী ও মোটিফ সম্পন্ন অবয়বের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় তবে আবার প্রাপ্ত সকল শ্রেণীর অবয়ব যে একই সময়ে বিকাশ ঘটেছিল এমনটা নয়। লেখকগণ উল্লেখ করেছেন এসকল টেরাকোটা উপাদান এবং পাশাপাশি আরও একাধিক প্রত্নউপাদান গাঙ্গেয় উপত্যকার সাথে সংযোগের দিকটিকে ইঙ্গিতবাহী করে তোলে। এছাড়া অপর একটি বিষয় তারা উল্লেখ করেছেন যে এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত অন্যতম সুপরিচিত টেরাকোটা অবয়ব পদ্মের ওপর উপবিষ্ট দেবী মূর্তিটির সন্ধান মেলে তৃতীয় খ্রীঃপূঃ নাগাদ, কিন্তু একই অবয়ব কৌশাম্বী, চম্পা বা চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায় ২০০-১০০ খ্রীঃপূঃ কালপর্বে, যা থেকে অনুমান করেছেন অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা এখানকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কিছুটা পূর্ববর্তী, কিংবা হয়তো স্থানীয় ভাবে শিল্প বিকাশের পর্যায় ছিল কিছুটা ভিন্নধর্মী। অর্থাৎ এই পর্বে মহাস্থানে টেরাকোটা শিল্পের বিকাশকে হয়তো গাঙ্গেয় উপত্যকার ন্যায় একই ধারায় বিশ্লেষণ করা যথাযথ নয়, এক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রবণতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে আবার এই অঞ্চলকে আমরা গাঙ্গেয় ঐতিহ্যের থেকে বিচ্ছিন্নও বলতে পারিনা নিঃসন্দেহে।

পরবর্তীতে উল্লেখ করা চলে আফরোজ আকমাম রচিত 'মহাস্থান'[২৫] গ্রন্থটির, উল্লেখ্য আদি ঐতিহাসিক পর্বের টেরাকোটা সাক্ষ্য কিছুটা সীমিত হলেও গুপ্ত পরবর্তী ও পাল পর্যায়ের ক্ষেত্রে এই চিত্রটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। লেখিকা উক্ত পরবর্তী পর্যায়েরই কিছুটা ভিন্নধর্মী টেরাকোটা উপাদানের বিপুল সম্ভারের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন যা নিঃসন্দেহে সামগ্রিকরূপে মহাস্থানগড়ের পোড়ামাটি শিল্প ঐতিহ্যকে বিশেষ খ্যাতি প্রদান করে সন্দেহ নেই। তিনি প্রত্নস্থলরূপে মহাস্থানগড়ের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, মূল উৎখনন সংক্রান্ত নানান নথী সহ পারিপার্শ্বিক বিস্তৃত

অসংখ্য স্তূপ, প্রাপ্ত প্রত্নসাক্ষ্য সম্পর্কেও লিপিবদ্ধ করেছেন। পাশাপাশি গুপ্ত ও তৎ পরবর্তী পর্যায়ের প্রাপ্ত অসংখ্য অবয়ব যথা- বিভিন্ন ভঙ্গীর বোধিস্বত্ব, ভৈরব, তীর্থংকর, নানান পশুপাখি, গান্ধর্ব প্রভৃতি আরও নানান উপস্থাপনার চিত্র সহ উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি অন্যতম উল্লেখ্য আবার মহাস্থান দূর্গাঞ্চলের নিকটবর্তী একটি ঢিবি পলাশবাড়ি থেকে গুপ্ত পর্বীয় বেশ কিছু ফলক পাওয়া যায় যেখানে রামায়নের আদিকান্ড ও অযোধ্যাকান্ডের প্রায় সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণিত বিস্তীর্ণ ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেগুলি প্রতিটি ব্রাহ্মী লিপি সম্বলিত, ফলে উক্ত অঞ্চলে একাধারে বর্ণনা মূলক শৈলীর উপস্থিতি ও রামায়ণ কাহিনীর জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় আলোচ্য উপাদান থেকে। বলা বাহুল্য আলোচ্য পরিসরের শিল্পধারা অপেক্ষা এই শৈলী যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা কিন্তু তা স্বত্তেও মহাস্থানগড়ের শিল্প ইতিহাসে তা অসামান্য।

সুতরাং উপরিল্লিখিত এই আলোচনার ভিত্তিতে দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে পোড়ামাটি শিল্প সম্পর্কে মোটামুটিভাবে এসকল গবেষকরা কি ধরণের কাজ করেছেন। দেখা যায় নির্দিষ্ট কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণত কিছুটা বর্ণনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়েছে, অর্থাৎ নানান বিষয়ের উপস্থাপনা, তাদের শ্রেণীবিভাগ, প্রযুক্ত কলাকৌশল, বাহ্যিক গড়ন প্রভৃতি বিষয়ের ওপরই বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত নির্দিষ্ট আকৃতির অবয়ব গড়ে তোলার তাৎপর্য কি বা প্রতি অবয়বে সন্নিহিত প্রতীকের তাৎপর্য কি সেজাতীয় আলোচনা বিশেষ লক্ষণীয় নয়, আবার সামাজিক প্রেক্ষিতের কথা বললেও তা বিশ্লেষণের ভঙ্গীও বহুক্ষেত্রেই সীমিত। খুব সাধারণভাবে দেবদেবী অবয়ব সমূহকে নির্দিষ্ট নামে অভিহিত করে ধর্মীয় ইতিহাসের অঙ্গ রূপে বা অন্যান্য অবয়বগুলিকে সামাজিক জীবনযাত্রার অঙ্গ রূপে তুলে ধরা হয় কিন্তু কয়েক সহস্র বছর পূর্বের সমাজকে বা মানুষের চিন্তনকে কি প্রকৃতই ততখানি সহজে নিশ্চিত রূপে তুলে ধরা সম্ভব? সে জাতীয় কোনও বিশ্লেষণ কিন্তু অনুপস্থিত। ফলত একাধিক প্রেক্ষিত কিন্তু জড়িয়ে রয়েছে বাংলার টেরাকোটা শিল্প সংক্রান্ত আলোচনায়,যেখানে খানিক আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে হয়। ফলত আলোচ্য গবেষণা পত্রটিতে উক্ত উপেক্ষিত প্রেক্ষিত গুলিকেই তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে।

সরাসরি গবেষণা পত্রটির মূল আলোচনার বিষয়গুলি তুলে ধরা যেতে পারে, এক্ষেত্রে প্রধান বিষয় হল আদি ঐতিহাসিক পর্বে বিকশিত এই পোড়ামাটি শিল্পধারার সামাজিক- সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষিতের অনুধাবন, যেক্ষেত্রে একাধিক প্রশ্নের সম্ভাবনা লক্ষ করা যায়। দেখা গেছে এই সমগ্র পর্ব জুড়ে বাংলায় ভিন্ন ধাঁচের ভিন্ন প্রকৃতির একাধিক বিষয়বস্তু সম্পন্ন টেরাকোটা শিল্প অবয়বের বিকাশ ঘটেছে কিন্তু প্রশ্ন হল তাদের বিকাশের চরিত্র বা উদ্দেশ্যকে আমরা কিভাবে

দেখব? অর্থাৎ নির্দিষ্ট অবয়ব নির্মাণের পশ্চাতে শিল্পীর প্রেরণা কি ছিল? এগুলি কেবলই শিল্প অবয়ব রূপে মানুষের নান্দনিক চেতনার ফলশ্রুতি নাকি এর পশ্চাতে কোনও বিশেষ কোনও চিন্তন সম্পৃক্ত ছিল? পাশাপাশি লক্ষ করলে দেখা যাবে এই অঞ্চল দুটি ছাড়াও আদি ঐতিহাসিক বঙ্গের একাধিক কেন্দ্র থেকে অসংখ্য পোড়ামাটি শিল্পধারার সন্ধান পাওয়া যায় এবং আমরা জানি সমসাময়িক কালেই উত্তর ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও মূলত সমৃদ্ধ পোড়ামাটি শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল এবং বিশেষ উল্লেখ্য দেখা যায় আপাত দৃষ্টিতে তার উপস্থাপনা বহুলাংশে সমগোত্রীয় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাহলে প্রশ্ন করা চলে উক্ত প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এইরপ শিল্পধারার বিকাশকে কোন পর্যায়ে রাখা যায়? এই চন্দ্রকেতুগড় বা মহাস্থানগড়ে বিকশিত শিল্পধারার ব্যপকতা কতখানি ছিল? যথার্থই কি আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা ব্যাপী এক সার্বিক শিল্প ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটেছিল? যদি ঘটে থাকে তার চরিত্র কিরূপ কিংবা যদি নাও থাকে তাহলেও এইরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ শিল্পধারার পশ্চাতে নিহিত সম্ভাবনাগুলি কিরূপ ছিল? ফলত এক বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা আবশ্যক বঙ্গীয় টেরাকোটার সামাজিক সাংস্কৃতিক চরিত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য। যা এই গবেষণা পত্রটির মধ্য দিয়ে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। সর্বোপরি উল্লেখ্য এই শিল্পের সামাজিক প্রেক্ষিতের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কেননা অবশ্যই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শিল্প অবয়বের রীতি, আঙ্গিক অপেক্ষা সম্পৃক্ত সামাজিক প্রবণতা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে থাকে। সমগ্র বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটেই দেখা গেছে প্রাপ্ত টেরাকোটা অবয়বের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আরাধ্য নারী-পুরুষ অবয়ব বা দেবদেবী অবয়ব, পাশাপাশি কৃষি, শিকার, নৃত্য- গীত- বাদ্য সম্বলিত অবয়ব, মিথুন শৈলী, বর্ণনামূলক শৈলী প্রভৃতি একাধিক উপস্থাপনা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতেই পারে প্রাচীন জনগণের জীবনযাত্রাকে এই উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে কতখানি পুনর্গঠন করা যায়? অর্থাৎ এসকল উপস্থাপনার সাথে প্রকৃতই প্রচলিত সামাজিক প্রথা রীতিনীতি, ঐতিহ্যের সংযোগ কতখানি ছিল? প্রাক গুপ্ত বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে এই শিল্পধারা অন্য যেকোনো প্রত্ন উপাদান অপেক্ষা অধিক দৃঢ় স্থানে বিরাজমান, ফলত সমসাময়িক কালপর্বে বাংলার মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, বিশ্বাসকে এই শিল্পধারা কতখানি তুলে ধরতে সক্ষম তা বিশ্লেষণের প্রয়াস নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলা চলে। এইরূপ একাধিক প্রশ্ন কিন্তু সম্পৃক্ত থাকতে পারে বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে, যার উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে আলোচ্য গবেষণা পত্রটির মধ্য দিয়ে। তবে বিশেষ উল্লেখ্য এই ধরণের প্রশ্ন বা প্রেক্ষিত উত্থাপন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হলেও তাদের সবগুলির নির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া কতখানি সম্ভব সেটি যথেষ্ট সংশয়াত্মক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ অন্যান্য বঙ্গীয় প্রত্নস্থলের প্রাপ্ত বিভিন্ন অবয়ব এবং পাশাপাশি উত্তর ভারতীয় কেন্দ্রেও প্রাপ্ত বিভিন্ন সাদৃশ্যপূর্ণ অবয়বগুলিকে কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের পারস্পরিক সংযোগকে দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে। কেননা নাহলে এইরূপ দীর্ঘ অঞ্চলে দীর্ঘ কালপর্যায়ে বিস্তৃত শিল্পের যথাযথ চরিত্র নির্ধারণ সম্ভবপর নয় কিংবা কেবল আঞ্চলিক স্তরে ২টি কেন্দ্রের ভিত্তিতে একে আলোচনা করার অর্থ হয়তো অসম্পূর্ণ ইতিহাসচর্চা। সেই সূত্রে তৎকালীন বিভিন্ন বাণিজ্যিক পথ বা সংযোগ পথেরও উপস্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের সম্ভাবনার দিকগুলিকে তুলে ধরার জন্য। এছাড়া বলা যায় শিল্প ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি অবয়বের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা একই ভঙ্গীযুক্ত ২টি অবয়বও ভিন্ন পরিসরে ভিন্ন আদর্শ উপস্থাপন করতে পারে। ফলত নির্দিষ্ট অবয়বের প্রেক্ষিত অনুধাবন আবশ্যক। এক্ষেত্রে উত্তর ভারতীয় পোড়ামাটি অবয়বগুলির পর্যবেক্ষণে বিশেষ সহায়ক হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থের ক্যাটালগ। পাশাপাশি বাংলার ক্ষেত্রে কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহালয়, রাজ্য প্রত্নতত্ত্বশালার সংগ্রহালয়, কলকাতা যাদুঘর, চন্দ্রকেতুগড় স্মৃতি শহীদুল্লাহ মহাবিদ্যালয়ের সংগ্রহালয় প্রভৃতি কেন্দ্রে সংরক্ষিত আদি ঐতিহাসিক বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত শিল্প অবয়বগুলির গভীর পর্যবেক্ষণ উক্ত অবয়বের চরিত্র নির্ধারণে সহায়ক হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নিছক শিল্প অবয়ব অপেক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা, আদর্শ বা চিন্তন যে এসকল উপাদানের নির্মাণ, বিকাশ ও ক্রমপ্রবহমানতার পশ্চাতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং একাধারে তা কিরূপে সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের সহিতও সম্পৃক্ত সমগ্র আলোচনার মধ্য দিয়ে তা দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে।

সমগ্র বিষয়টিকে মূলত চারটি অধ্যায়ের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি মূলত প্রাচীন বাংলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ নির্বাচিত প্রত্নস্থলগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, উৎখনন জনিত নথী এবং আবিষ্কৃত বিবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাদি জনিত আলোচনার ওপর নির্মিত। যেখানে মূলত প্রত্নকেন্দ্র রূপে বঙ্গীয় ইতিহাসে তাদের সার্বিক অবস্থান বা তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।

পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূলগতভাবে পোড়ামাটি অবয়বগুলির আলোচনায় প্রবেশ করা হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন প্রতীকী তাৎপর্য সম্বলিত অবয়বগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে যা মানুষের উপাসনার অঙ্গ তথা আরাধ্য দেবদেবীর অবয়ব ছিল। যার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় এই পর্যায়ে প্রাথমিক পর্বের বিভিন্ন হাতে গড়া মাতৃ অবয়ব সহ, ধান্যদেবী, মৎস্য দেবী, শ্রী লক্ষ্মী, বিভিন্ন যক্ষ যক্ষিণী, কুবের, পক্ষযুক্ত অবয়ব প্রভৃতি আরও একাধিক অবয়বের বিকাশ ঘটেছে

যেগুলি মানুষের প্রাথমিক ধর্মচিন্তার ফলশ্রুতি ছিল। সমাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন পরিস্থিতে মানুষের উপাসনার অঙ্গ হয়ে উঠেছে এই অবয়বগুলি এবং ক্রমে এদের সাথে নির্দিষ্ট প্রতীকের সংযোগ ঘটেছে যা শিল্পক্ষেত্রে এক নির্দিষ্ট পরিচিতি বা শৈলীর বিকাশ ঘটায়। মোটামুটি চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় উভয় অঞ্চলেই এজাতীয় অবয়বের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, অর্থাৎ উক্ত অঞ্চলদ্বয়ের সমকালীন ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে এক বিস্তীর্ণ ধারণা পাওয়া যায় এজাতীয় অবয়বের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি এসকল অবয়বের সহিত সম্পৃক্ত উক্ত প্রতীকী গুলিকে বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে, যে সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাদের প্রাসঙ্গিকতা বা তাৎপর্য কতখানি এবং আলোচ্য শিল্প অবয়বের চরিত্র নির্ধারনে তা কিরূপ ভূমিকা পালন করে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়ের শিল্পধারাকে এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে একদিকে নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা বা সমকালীন বাংলার অন্যান্য প্রত্নকেন্দ্র এবং অপরদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্যান্য অংশে বিকশিত টেরাকোটা সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলগুলি থেকে প্রাপ্ত শিল্প অবয়ব গুলিকে পাশাপাশি উপস্থাপন করে নির্বাচিত প্রত্নস্থলদ্বয়ের শিল্পধারার সহিত এক তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। দেখা যায় এই ২টি অঞ্চল ব্যতীত বাংলার অন্যান্য অঞ্চল যথা তমলুক, পান্না, তিলদা, তিলপি, ধোসা, হরিনারায়নপুর সহ আরও একাধিক কেন্দ্রে কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়ের ন্যায় সমজাতীয় শিল্প অবয়বের বিকাশ ঘটেছিল এবং অপর দিকে উত্তর ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিকশিত শিল্পধারার সাথেও যে চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থান তথা সমগ্র বঙ্গীয় টেরাকোটার এক সাদৃশ্য বজায় ছিল তাও অনুধাবন সহজতর হয়। যা আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় টেরাকোটার ব্যপকতাকে তুলে ধরে এবং বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পধারার বিকাশে উত্তর ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রভাব জনিত দিকগুলিও সুস্পষ্ট হয়। পাশাপাশি সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার সংস্কৃতির অনুধাবনে সহায়ক হয় এইরূপ আলোচনা দ্বারা। অপর একটি বিষয় যে অবয়বের প্রতীকের কথা বলা হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে, দেখা যায় বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় সমভূমি ব্যাপী সমজাতীয় অবয়বের বিকাশে কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট প্রতীকীর বিকাশ ঘটে যেগুলি বৃহত্তর প্রেক্ষিতে উক্ত অবয়বের এক সার্বিক পরিচিতি গড়ে তোলে। ফলত তার সাথে সম্পৃক্ত চেতনা বা আদর্শের ক্ষেত্রটি কিন্তু আরও নির্দিষ্ট হয় যেখানে কোনও দৃঢ় উদ্দেশ্য থেকে এরূপ প্রতীকের বিস্তার ঘটছে যা নান্দনিকতার চেতনা অপেক্ষা গভীরতর। পাশাপাশি উভয় অঞ্চলের স্থানীয় বৈচিত্র্য বা তারতম্যের দিকটিকেও উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সমগ্র বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে মৃৎশিল্পের সামাজিক প্রেক্ষিতটি তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সমগ্র বাংলা জুড়ে যে সাদৃশ্যপূর্ণ অবয়বের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়

ফলত কিভাবে তা থেকে বাংলার সমকালীন জনজীবনের বিভিন্ন দিকের আভাষ পাওয়া যায় এবং প্রকৃতই তার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি হতে পারে সেদিকটি তুলে ধরা হয়েছে। কেবল ফলকে প্রদর্শিত দৃশ্য নয়, তার অন্তর্নিহিত চিন্তন যে সামাজিক ইতিহাসের বিশ্লেষণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আলোচ্য টেরাকোটা অবয়ব সমূহ। দুটি পর্যায়ে অধ্যায়টি আলোচনা করা হয়েছে প্রথম পর্যায়ে সুস্পষ্ট ধর্মীয় চেতনা বা দ্বিতীয় অধ্যায়ের উল্লিখিত নির্দিষ্ট প্রতীকী সম্পন্ন অবয়বগুলির সূত্রে প্রকাশিত সমকালীন ধর্মীয় ইতিহাসের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যা মানব জীবন বা সমাজ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর বাকি অংশে তুলে ধরা হয়েছে সেসকল অবয়ব যেখানে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড যথা- কৃষি, শিকার, নৃত্যগীত, মিথুন ইত্যাদি আরও অন্যান্য। যা সমাজে এসকল কর্মকাণ্ডের জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত দেয় এবং অবশ্যই সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু পাশাপাশি অপর একটি দিকের প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে যে এসকল উপাদানে সামাজিক দৃশ্যের প্রতিফলন থাকলেও এর উদ্দেশ্য বা চরিত্র কিন্তু ভিন্ন হতে পারে। পূর্ববর্তী ধর্মীয় ইতিহাস থেকে এগুলি কতখানি বিচ্যুত ছিল বা প্রকৃতই তা কতখানি বিষয়ী মনোভাবাপন্ন শৈল্পিক অবয়বের প্রকাশ ছিল উক্ত সম্ভাবনার দিকটি উপস্থাপন করা হয়েছে আলোচ্য পরিসরে।

শেষে উপসংহারে দেখানো হয়েছে কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবন, ঐতিহ্য বা বিশ্বাসের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থেকেছে পোড়ামাটি অবয়বগুলি। সর্বোপরি মানুষের উর্বরতা, শুভ চেতনা বা মঙ্গলময়তার চেতনা কিরূপে সমগ্র শিল্পের চরিত্র নির্ধারণে তৎপর ছিল। সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হওয়া স্বত্তেও আদতে তা নির্মাণের মূল উদ্দেশ্যের সাথে কিন্তু জনগণের প্রয়োজনীয়তা বা বিশ্বাস জড়িত ছিল, সেই ক্ষেত্র গুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অঞ্চলভেদে, সময়ভেদে বিকশিত ভিন্ন ভিন্ন শিল্প অবয়বে প্রযুক্ত ভিন্ন কলাকৌশল, শৈলী, আঙ্গিক, বা বিষয়গত ভিন্নতা স্বত্তেও কিন্তু তার পশ্চাতে মানুষের মূল চিন্তন ছিল এক, সার্বিক সমৃদ্ধি।

বর্তমান আলোচনায় সেকারণে উপরিউক্ত বিষয় গুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ক্ষেত্র সমীক্ষার মূল কেন্দ্র রূপে ২টি বঙ্গীয় সমৃদ্ধ কেন্দ্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কেননা আদি ঐতিহাসিক পর্যায় বাংলা তথা ভারতীয় ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়, দীর্ঘ বিরতির পর নগরায়ন, কৃষি, বাণিজ্য তথা সার্বিক সমৃদ্ধির যুগ। আর উক্ত প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, শিল্প-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই অঞ্চলদ্বয় ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। চন্দ্রকেতুগড় একদিকে সমৃদ্ধ পোড়ামাটি শিল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার যাকে বাদ দিলে বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসের বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, পাশাপাশি তা ছিল সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দর

নগরী। বিশেষ উল্লেখ্য, উত্তর ভারতীয় বণিকদের সমুদ্রে পৌঁছনোর একমাত্র পথ ছিল এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে। ফলত উভয় সংস্কৃতির পারস্পরিক সংযোগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রই ছিল এই অঞ্চল, যার দরুন বঙ্গীয় টেরাকোটা এক বিশিষ্ট চরিত্র লাভ করতে সক্ষম হয়। অপর দিকে মহাস্থানের টেরাকোটার নির্ধারিত উৎখনন নথীর পাশাপাশি অন্যতম বিশেষত্ব ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকীয় অঞ্চল থেকে ভিন্ন পরিসরে অবস্থিত হলেও তার প্রাপ্ত পোড়ামাটি অবয়ব কিন্তু কোন অংশে গাঙ্গেয় উপত্যকীয় শৈলী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই উপাদান উক্ত অঞ্চলের সহিত গাঙ্গেয় উপত্যকার সংযোগের দিকটিকে ইঙ্গিতবাহী করে। ফলত তাদের শিল্প নিদর্শন যে সমকালীন বাংলা তথা গাঙ্গেয় উপত্যকীয় সংস্কৃতির এক বৃহৎ অংশকে নিবেদন করে বলা বাহুল্য এবং এই বিপুল শিল্প ঐতিহ্য দ্বারা সমকালীন বাংলার মানুষ, তাদের জীবন ও সংস্কৃতিকেও উপলব্ধি করা সহজতর হয়।

তথ্যসূত্র

১) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা -১৩

২) অরুন্ধতী ব্যানার্জ্জী, "আর্লি ইন্ডিয়ান টেরাকোটা আর্ট" ২০০০ -৩০০০ বিসি – নর্দান-ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া, হারমন পাবলিকেশন হাউস,নিউ দিল্লী, ১৯৯৪ পৃষ্ঠা- ৭

৩) অর্পুঠারানী সেনগুপ্ত, 'আর্ট অফ টেরাকোটাঃ কাল্ট অ্যান্ড কালচারাল সিন্থেসিস ইন ইন্ডিয়া', আগম কলা প্রকাশন ২০০৫ পৃষ্ঠা- ১

৪)স্টেলা ক্র্যামরিশ, 'এক্সপ্লোরিং ইন্ডিয়াস সেক্রেড আর্ট' , ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভ্যানিয়া পাবলিকেশন,১৯৮৩

৫) অরুন্ধতী ব্যানার্জী, "ইমেজ, অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড মোটিফস, স্টাডিস ইন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড নিউমিসমেটিকস্", খন্ড-১, সন্দীপ প্রকাশন, দিল্লী ,১৯৯৩ প্রথম মুদ্রণ

৬) দেবাঙ্গনা দেশাই- 'সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস' ; সোনালিকা কল সম্পাদিত, 'কালচারাল হিস্ট্রি অফ আর্লি সাউথ এশিয়া', ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড,২০১৪

৭) সোনালিকা কল সম্পাদিত, 'কালচারাল হিস্ট্রি অফ আর্লি সাউথ এশিয়া', ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড,২০১৪

৮) পি এল গুপ্তা, 'গাঙ্গেটিক ভ্যালী টেরাকোটা আর্ট', পৃথিবী প্রকাশনী, বারাণসী-৫(ইন্ডিয়া), ১৯৭২

৯) এস কে শ্রীবাস্তব, 'টেরাকোটা আর্ট ইন নর্দান ইন্ডিয়া', পরিমল পাবলিকেশন, দিল্লী, ১৯৯৬

১০) এস সি কলা, 'টেরাকোটাস অফ নর্থ ইন্ডিয়া' আগম কলা প্রকাশন,দিল্লী, ১৯৯৩

১১) প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত, "ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড", মার্গ, ২০০২

১২) সমীর কুমার মুখার্জ্জী, 'টেরাকোটা আর্ট ইন দ্য গাঙ্গেটিক ভ্যালী আন্ডার দা কুষানাস', ইন প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত, "ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড", মার্গ, ২০০২

১৩) অশোক কুমার ভট্টাচার্য, 'টেরাকোটাস্ অফ বেঙ্গল', শুঙ্গ কুষান পিরিয়ড - প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত, "ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড", মার্গ, ২০০২

১৪) সরসী কুমার সরস্বতী , আর্লি স্কাল্পচার অফ বেঙ্গল, সম্বোহী পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৬২

১৫) সীমা রায় চৌধুরী, 'স্টাইল এন্ড ক্রোনোলজি' : প্রবলেমস্ ইন ইভলভিং আ টেম্পোরাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য আর্লি হিস্টোরিকাল টেরেকোটাস ফ্রম বেঙ্গল' ; গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত - 'আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া , নিউ পার্সপেক্টিভস " , সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, কলকাতা – ২০০২

১৬) কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, 'টেরাকোটা অবজেক্টস ইন আর্কিওলজিঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি' , গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত - 'আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া , নিউ পার্সপেক্টিভস " ,প্রাগুক্ত

১৭) এস এস বিশ্বাস , 'টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল' , আগম কলা প্রকাশনী, দিল্লি,১৯৮১

১৮) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’, আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল , কলকাতাঃ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম , ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৭

১৯) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম “উচ্চ” মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৯

২০) এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, ‘চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরাকোটাস, আই সি এস বি এ, ঢাকা ২০০১

২১) গৌরীশঙ্কর দে, দে শুভ্রদীপ – ‘চন্দ্রকেতুগড় আ লস্ট সিভিলাইজেশজন’- আর্ট এন্ড আর্ট মোটিফসাগ্নিক বুকস ,, কলকাতা, ২০০৪

২২) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে’ -প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড় , ‘বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স ,কলকাতা, ২০১৩

২৩) সীমা রায় চৌধুরী, ‘আর্লি হিস্টোরিক টেরাকোটাস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ স্টাডি ইন থিমস্ অ্যান্ড মোটিফস’, “প্রত্নসমীক্ষা”, খণ্ড- ৪ ও ৫, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম গভঃ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৯৫-৯৬

২৪) এম এফ ব্যুসাক ও স্যান্ড্রিন গিল, ‘মোল্ডেড টেরাকোটা প্লাকস্ ফ্রম মহাস্থান’, জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, খন্ড-৬, ২০০১

২৫) আফরোজ আকমাম – ‘মহাস্থান’, বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ঢাকা ২০১৬

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার নির্বাচিত প্রত্নস্থল চন্দ্রকেতুগড়-মহাস্থানগড়ঃ প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

বর্তমান এককে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু প্রাচীন বাংলা, মূলত আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় প্রত্নস্থলদ্বয় চন্দ্রকেতুগড়,মহাস্থানগড় ও তার পারিপার্শ্বিক প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটি তথা তার প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণাদির তত্ত্বতলাশ। দীর্ঘকালব্যাপী প্রাচীন বাংলার ইতিহাস কিছুটা নির্লিপ্ত থাকলেও বা গুপ্তপূর্ব লিখিত উপাদানের অভাব থাকলেও প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের সহায়তায় আজ সেই চিত্র বহুলাংশে পরিবর্তিত এবং প্রাচীন বঙ্গীয় ইতিহাস বৃহত্তর ভারতীয় ইতিহাসচর্চার অঙ্গ হয়ে উঠেছে ক্রমশ। শুধু বাংলা বা ভারত নয় সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসে অতীত ঐতিহ্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের প্রধান ভরসাই যে আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রত্নস্থল এবং অগণিত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যসমূহ তা বলা বাহুল্য।

এই সকল নিদর্শনের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় প্রাচীন সভ্যতা সমূহের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি,রীতিনীতি, আচার আচরণ, জীবনপ্রবাহের বিভিন্ন দিক যা হয়ত এতটা স্পষ্ট রূপে অন্যত্র বিরল। প্রত্নতত্ত্ব যেমন সমকালীন আর্থসামাজিক বা ধর্মীয় দিক সমূহের অন্যতম দলিল তেমনি পাশাপাশি শিল্প সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাসেও এদের গুরুত্ব অপরিসীম, কেননা সমাজের এক বৃহত্তর অংশ জুড়ে থাকে শিল্পভাবনা। তাই হয়ত তাকে বাদ রেখে সামাজিক ইতিহাসের পর্যালোচনা সম্পূর্ণ হয়না। প্রাচীন সভ্যতার শিল্প সাধনা ও ধর্মীয় স্বরুপ নির্ধারনের ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে আলোচ্য গবেষনা পত্রটির বিষয়ও মূলত বাংলার আদি ঐতিহাসিক পর্বের কিছু নির্বাচিত প্রত্নস্থলের প্রাপ্ত শিল্পদ্রব্য মূলত পোড়ামাটি শিল্প সমূহকে কেন্দ্র করে সমকালীন ইতিহাসের নানান দিকের পুনর্গঠনের প্রয়াস। বিভিন্ন স্থলের পোড়ামাটির উপকরনগুলি সংশ্লিষ্ট সমাজ ইতিহাসেরই অঙ্গ, তাই সমকালীন ইতিহাস বিশ্লেষণের অন্যতম মাধ্যম আজ এই শিল্পধারা।

যেকোনো অঞ্চল, দেশ বা জাতির প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে তার যথার্থ ভৌগোলিক অবস্থান বা পরিচয় সম্পর্কে অবহিত থাকাটাও বাঞ্ছনীয়। সেজন্যই নিঃসন্দেহে শিল্প ইতিহাস কেন্দ্রিক গবেষণা পত্রটির প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর কাঠামোও বাংলার নির্বাচিত প্রত্নস্থলগুলির ভৌগোলিক অবস্থান,পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাদি জনিত আলোচনার ওপর নির্মিত।

তবে সরাসরি নির্দিষ্ট প্রত্নকেন্দ্রের আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে সামগ্রীক রূপে বাংলার ভৌগোলিক বিবরণী সম্পর্কিত দু চার কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। যেকোনো স্থান বা দেশের রাষ্ট্রীয় সীমা এবং ভৌগোলিক বিস্তৃতি সর্বদা এক নাও হতে পারে, তা পরিবর্তনশীল। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়, ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক অঞ্চল হিসেবে এর সীমানার পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্বে। এর তিন দিকে (উত্তর,পূর্ব ও পশ্চিমে) অবস্থিত বিস্তীর্ণ পর্বতমালা, অসংখ্য নদনদী, মালভূমি- সমভূমি অঞ্চল, দক্ষিণের সমুদ্র ও বিস্তৃত উপত্যকীয় অঞ্চলের উপস্থিতি একে ভৌগোলিক গুরুত্বের নিরিখে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে।[১] নদীপ্রবাহের মধ্যে গঙ্গা ও তার প্রবাহ পদ্মা, ভাগীরথী বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এছাড়া ব্রহ্মপুত্র এবং উত্তরবঙ্গের নদীগুলির মধ্যে তিস্তা ও তার ৩টি ধারা যথা- করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভবা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ। এই করতোয়া নদীর তীরেই অবস্থিত বর্তমান আলোচনার অন্যতম প্রধান প্রত্নস্থল মহাস্থানগড়, যা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সাধারণত মনে করা হয় প্রাচীন যুগে সমগ্র বাংলাদেশের কোন নাম ছিলনা, এর বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল যথা- উঃ বঙ্গে পুন্ড্র ও বরেন্দ্র, পঃ বঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি এবং দঃ ও পূঃ বঙ্গে বঙ্গ,সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। এছাড়া উঃ ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল।[২]

তবে বিভিন্ন সময়ে সীমা হ্রাসবৃদ্ধি হওয়ার দরুন এই সমগ্র দেশের সীমানা যথার্থ ভাবে নির্ধারণ করা যায়না। মুসলিম যুগেই প্রথম এই সকল অঞ্চল একত্রে 'বাংলা' বা 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয় যা থেকে ব্রিটিশরা 'বেঙ্গলা' (Bengala) বা 'বেঙ্গল' (Bengal) নামের উৎপত্তি ঘটান। অর্থাৎ বর্তমানের 'বেঙ্গল' নামটি সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন ব্রিটিশরা,[৩] ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সূত্রে আজ বাঙালি ২টি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক পরিসরে অধিষ্ঠিত; ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অপর দিকে সার্বভৌম রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে তথা অধুনা বাংলাদেশে। যদিও ইতিপূর্বে কিছু প্রাচীন সাহিত্যাবলী যথা 'ঐতরেয় আরণ্যক'[৪], 'বৌধায়ন ধর্মসূত্র'[৫], কৌটিল্যর 'অর্থশাস্ত্রে'[৬] নানাভাবে বাংলা বা বঙ্গ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া বৈদেশিক উপাদান যথা- গ্রীক বর্ণনায় বাংলায় রাজতন্ত্রের পরিচয় মেলে 'গঙ্গারাষ্ট্রের' বিবরণীর মধ্য দিয়ে; খ্রিষ্টীয় ৩য় শতকের চীনা গ্রন্থ 'উই-ল্যু' – এ ইঙ্গিত রয়েছে যে এই বঙ্গের অন্য নাম ছিল 'গঙ্গা রাষ্ট্র' আবার গ্রীক বর্ণনা অনুসারে গঙ্গা দেশের সর্বত্র গঙ্গানদী ও তার শাখাপ্রশাখা দ্বারা পরিবৃত, এজাতীয় নানান তথ্যের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকগন অনুমান করেছেন এই 'গঙ্গা' রাষ্ট্রই হল প্রাচীন বঙ্গ।[৭]

প্রত্নউৎখননের সূত্রে হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কার কিংবা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবিষ্কৃত প্রস্তর যুগের নানাবিধ নিদর্শন এর সূত্রে আজ ভারতীয় ইতিহাস যেমন সামগ্রীকভাবে

প্রাগইতিহাসের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, লক্ষ লক্ষ বছরের অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে বাংলাও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ক্রমে সমগ্র বাংলাতেও রাঢ়, বরেন্দ্র বা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চল প্রভৃতি নানান প্রান্তে প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে শুরু করে আদি ঐতিহাসিক বা ঐতিহাসিক পর্বের একাধিক প্রত্নস্থল ও প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে বা আজও হয়ে চলেছে বাংলার ইতিহাসে যার গুরুত্ব অসামান্য। যেমন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রস্তর ও তাম্র যুগের নানান আয়ূধ বা উপকরণাদি আবিষ্কৃত হয়েছে যা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের প্রধান নিদর্শন, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নাম এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক বর্ধমানে অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর তীরে উৎখননের ফলে বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে পাণ্ডু রাজার ঢিবি ও তার নিকটবর্তী কিছু অংশে যা প্রায় খ্রিষ্ট জন্মের ১৫০০ বছর পূর্ববর্তী সিন্ধু উপত্যকা, মধ্য ভারত বা রাজস্থানের প্রাপ্ত তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির অনুরূপ। এছাড়াও প্রাচীন বাংলা অর্থাৎ অধুনা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের আরও কিছু প্রত্নস্থলের নাম এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি একাধারে যেমন বাংলার বিভিন্ন কালপর্যায়ের ইতিহাসকে তুলে ধরে, তেমনই গবেষণা পত্রটির মূল প্রতিপাদ্য প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসের ধারাতেও এই সকল কেন্দ্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যেমন- বর্ধমানের মঙ্গলকোট, বীরভূমে কোটাসূর, বাঁকুড়ার পুষ্করনা বা পোখন্না ও ডিহর, পূঃ মেদিনীপুরে তিলদা, পান্না, বাহিরি,তমলুক, দঃ ২৪ পরগনা জেলার আটঘরা,হরিনারায়নপুর, দেউলপোতা,বোড়াল,তিলপি ইত্যাদি ও উঃ ২৪ পরগণার চন্দ্রকেতুগড়, গোপলাপুর, বর্তমান দঃ পঃ দিনাজপুরে বানগড়, বাংলাদেশের বগুরা জেলার মহাস্থানগড়, আবার কিছুটা পরবর্তী পর্যায়ের সংস্কৃতির সাক্ষ্য রূপে কর্ণসুবর্ন, মোঘলমারি, পাহাড়পুর, ময়নামতি, জগজ্জীবনপুর প্রভৃতি প্রত্নস্থলগুলি ক্রমেই আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে দিনদিন এবং সমৃদ্ধ করে চলেছে বাংলার সুপ্ত প্রাচীন ইতিহাসকে।[৮] এখানে উল্লিখিত প্রতিটি প্রত্নস্থলই যে তার আকৃতি, অবস্থান বা চরিত্র বৈশিষ্ট্যে সমগোত্রীয় তা নয়, কিন্তু প্রাচীন বাংলার টেরাকোটা শিল্প ইতিহাস তথা সামগ্রীক প্রাচীন বঙ্গীয় ইতিহাসের পুনর্গঠনে এই প্রতিটি কেন্দ্র নিজ নিজ ভূমিকায় অসামান্য।

বর্তমানে বাংলার ইতিহাস চর্চায় বিশেষ স্থান করে নিয়েছে এসকল অধিকাংশ প্রত্নস্থল, তাদের প্রত্নসাক্ষ্যের প্রাচুর্য তথা ঐতিহাসিক তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে ; সেরকমই ২টি বিশেষ উল্লেখ্য নাম হল পশ্চিমবাংলার **'চন্দ্রকেতুগড়'** ও বাংলাদেশের **'মহাস্থানগড়'** যা বর্তমান আলোচনার প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে। এই স্থান ২টির অন্যতম বিশেষত্ব হল সমৃদ্ধ পোড়ামাটির শিল্প, ২টি ক্ষেত্র থেকেই মৌর্য, শুঙ্গ, কুষান, গুপ্ত যুগের প্রভাব সম্পন্ন বিপুল পরিমাণ পোড়ামাটি

ফলক ও অন্যান্য বিবিধ প্রত্নউপকরণের সন্ধান মেলে যা সংশ্লিষ্ট সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকে। বেশ কিছু সময় ধরে ইতিহাসচর্চার ধারায় আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা বিশেষ স্থান লাভ করেছে, দেখা যায় বহু ক্ষুদ্র অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস গুলিই আদতে বৃহত্তর সংস্কৃতি বা সভ্যতার ইতিহাস অনুধাবনের রসদ জোগায়, বৈচিত্র্য এনে দেয়, বহু নতুন দৃষ্টিভঙ্গির চিন্তাধারার বিকাশ ঘটায়। আলোচ্য পত্রটিতেও বাংলার দুপ্রান্তে ২টি ভিন্ন স্থান, ভিন্ন ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে অবস্থিত স্বত্ত্বেও সমজাতীয় শিল্প সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বিদ্যমান। কিন্তু ইতিহাসের ধারায় রাজনৈতিক বা আর্থ সামাজিক দিক থেকে এদের কালানুক্রমিক গুরুত্বের দিকটিও ভাবা প্রয়োজন, তা নাহলে এ জাতীয় শিল্পের বিকাশের কারণ বা তাগিদটি খুঁজে পাওয়া হয়তো দুর্লভ। তাই অধ্যায়টির পরবর্তী অংশে এই প্রত্নস্থল ২টির অবস্থান, ভূ- প্রাকৃতিক বিষয়, পারিপার্শ্বিক কাঠামো, উৎখনন পর্যায় ও তার বিভিন্ন নথী তথা প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যসমূহ অর্থাৎ ইতিহাসের ধারায় প্রত্নস্থল হিসেবে অঞ্চল ২টির গুরুত্ব বা ক্ষেত্র আলোচনার কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচনের প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে।

চন্দ্রকেতুগড়

কখনো ‘প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়’[৯] কখনো ‘A Lost Civilization’[১০] আবার কখনো বা ‘Treasure house of Bengal Terracottas’[১১] বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিধায় গবেষকবৃন্দের দ্বারা অভিহিত হয়ে এসেছে পশ্চিমবাংলার এই আলোচ্য প্রত্নস্থলটি, যা আমাদের পরিচয় ঘটায় ২৫০০ বছর পূর্বেকার বাংলার সাথে। বিগত কয়েক দশকে ও সাম্প্রতিক কালেও নানান ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে এসেছে প্রাচীন বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বানিজ্যকেন্দ্র, বন্দর নগরী ও শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল চন্দ্রকেতুগড়। শুধু ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বই কেন বিভিন্ন শিল্পরসিক, ভূবিজ্ঞানী, প্রকৃতিবিজ্ঞানী দের নিকটও আজ চন্দ্রকেতুগড় আলোচনার অন্যতম কেন্দ্র, তাই অধুনা পশ্চিমবঙ্গের আবিষ্কৃত প্রত্নস্থলগুলির মধ্যে এটি যে বিশেষ স্থান অর্জন করে রয়েছে বলা বাহুল্য। চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শন সর্বদাই বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল গবেষক দের এবং কালক্রমেই সময়ের ব্যবধানে তা আরও বৃদ্ধি পায় ও নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার প্রসার পরিলক্ষিত হয় এর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। গৌরীশঙ্কর দে যথার্থই মন্তব্য করেছেন ‘ বিগত কয়েক দশকের মধ্যে চন্দ্রকেতুগড়ের বিশ্বায়ন ঘটেছে’ ।[১২]

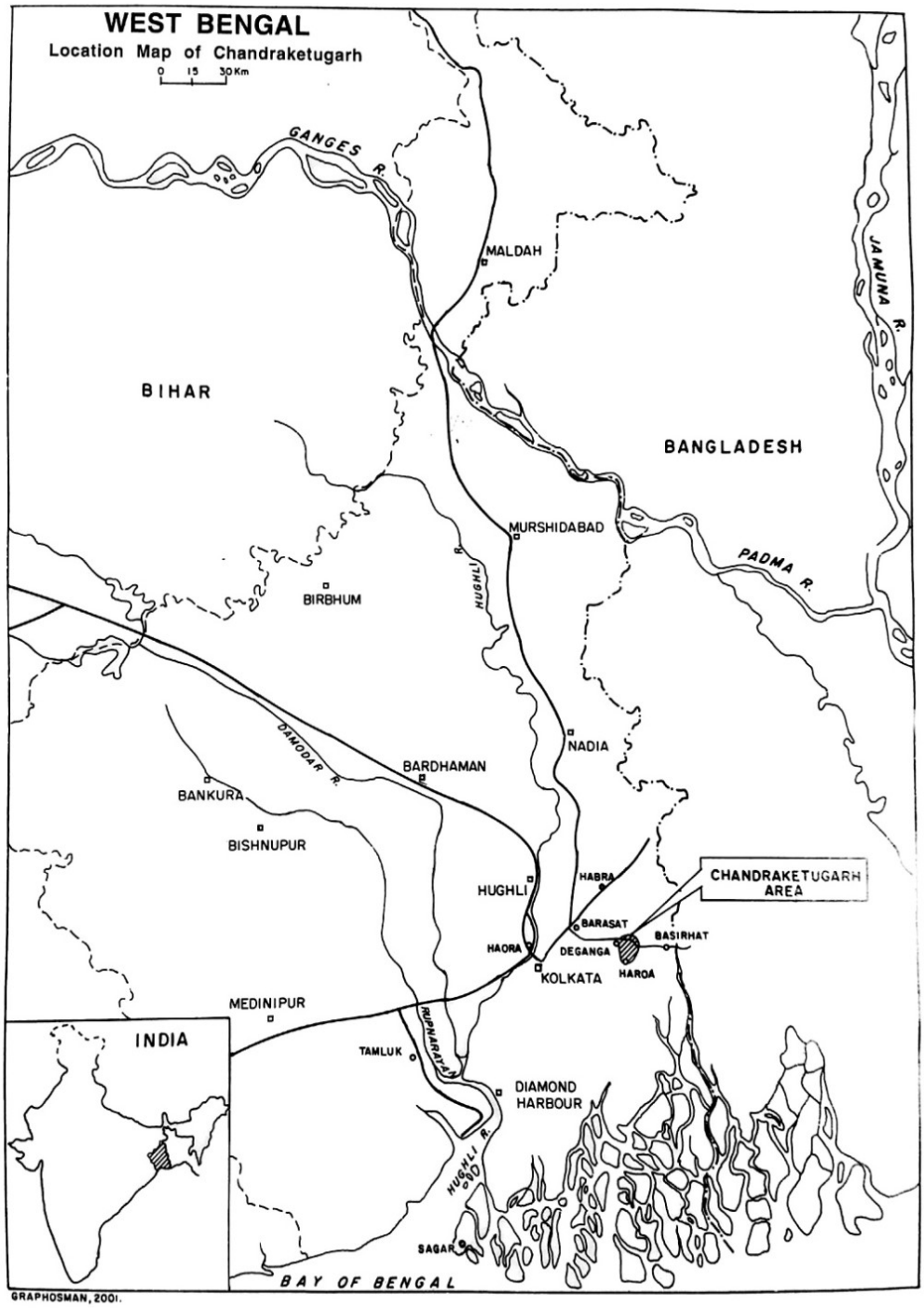

চন্দ্রকেতুগড়ের অবস্থান প্রদর্শিত মানচিত্র

সৌজন্যে-এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজঃ নং-৪ , 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অফ বেঙ্গল টেরাকোটাস', ঢাকা, আই–সি-এস-বি-এ, ২০০১

ভৌগোলিক বৃত্তান্তঃ

চন্দ্রকেতুগড় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা থানার অন্তর্ভুক্ত বেড়াচাঁপা অঞ্চলে বিদ্যাধরী নদী সংলগ্ন ভাবে ২২ ডিগ্রী ৪১ সেকেন্ড উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৮ ডিগ্রী ৪২ সেকেন্ড পূঃ দ্রাঘিমার মধ্যে কলকাতা থেকে প্রায় ৩৫ কিমি উত্তর পূর্বে অবস্থিত। দুর্গ প্রাকার বেষ্টিত এই নগরীটি বর্তমানে বেশ কিছু গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত, যথা বেড়াচাঁপা, দেউলিয়া, হাদিপুর, শানপুকুর,ঝিকরা,গাজীতলা, চুপড়িঝারা, মাঠবাড়ি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১৩] তবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাস এই চন্দ্রকেতুগড় এখন প্রায় অবহেলায় ধুঁকছে, চোরাকারবারিদের সৌজন্যে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন বহুমূল্য ইতিহাসের নিদর্শনের যে বিদেশ যাত্রা বহু সময় ধরে চলে আসছে চন্দ্রকেতুগড় ও তার থেকে বাদ পড়েনি, নানাভাবে তা লুণ্ঠিত হয়েছে। নিজ স্বার্থ সিদ্ধিতে ইতিহাসের হত্যালীলার কর্মকান্ড কবে বন্ধ হবে বা আদৌ তা কখনো সম্ভবপর হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সদ্য প্রয়াত চন্দ্রকেতুগড়ের স্থানীয় গবেষক দীলিপ কুমার মৈতের ব্যাক্তিগত তত্ত্বাবধানে তার বাড়িতে দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রচুর প্রত্নসামগ্রী সংরক্ষিত ছিল যার ভূমিকা অনবদ্য। তবে ইতিমধ্যে কিছু সংবাদমাধ্যমে ঐ অঞ্চলে সরকারী উদ্যোগে একটি মিউজিয়াম গড়ে তোলার উদ্যোগ প্রকাশিত হয়েছে,এটি সম্পন্ন হলে তা যে অসামান্য পদক্ষেপ হবে বলার অপেক্ষা রাখেনা।[১৪]

বর্তমান এই চন্দ্রকেতুগড় আসলে অতীতের কোন জায়গা বা তার নাম কি ছিল তা নিয়ে কিন্তু ঐতিহাসিকদের মধ্যে সংশয় বিদ্যমান। আলোচ্য অঞ্চল থেকে কোনরকম রাজকীয় তাম্রশাষনাদি বা উক্ত তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়ায় বা প্রাচীন কোনো সাহিত্য তথা লিখিত উপাদানেও এই নামের উল্লেখ না থাকায় এর যথাযথ প্রাচীন অবস্থান বা পরিচয় এর দিকটি কিছুটা দ্বিধান্বিত। তবে কোন ভারতীয় সাহিত্যে এর উল্লেখ না থাকলেও এক্ষেত্রে কিছু বৈদেশিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। ইতিপূর্বে গ্রীক সাহিত্যে বর্ণিত ‘গঙ্গারাষ্ট্র’ –র কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা মূলত ‘গাঙ্গেরিডাই’ নামটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাতিন ভাষায় রচিত কয়েকটি উপাদান থেকে এই দেশের কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৫] প্লিনির বর্ণনায় ‘প্রাসী’ ও ‘গাঙ্গেরিডাই’ রাজ্যের নাম মেলে, নানা প্রমান সাক্ষ্য থেকে মনে করা হয় প্রাসী বলতে মগধ কে বোঝান হয়েছে অপর দিকে প্লিনি মন্তব্য করেছিলেন যে গঙ্গার শেষ পর্যায়ের স্রোতধারা গঙ্গারিদ্ বা গাঙ্গেরিডাই দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত যার নামানুসারেই উক্ত দেশের নামকরন হয়েছে ‘গঙ্গা’। ‘পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সী’ নামক গ্রীসিয় রচনা তে রয়েছে ‘গাঙ্গে’ নামক বন্দর নগরীর কথা যা গঙ্গার পঞ্চমুখের একমুখে অবস্থিত ছিল এবং সমসাময়িক কালের সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বাণিজ্যের

কেন্দ্র হিসেবে উল্লিখিত।[১৬] আবার টলেমীর মতে এটি ছিল গঙ্গানদীর মোহনায় অবস্থিত গাঙ্গেরিদাই এর রাজধানী ও প্রধান নগর,[১৭] অর্থাৎ তা নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা বা বাংলার প্রতি দিকনির্দেশ করে। বর্তমান বারাসাতের নিকটস্থ 'দেগঙ্গা' নামের মধ্যে তার মিল খুঁজে পাওয়ায় অনেকে বলেন সম্ভবত এই ভৌগোলিক তথ্যের ইঙ্গিত রয়েছে 'দেগঙ্গা' নামটির মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্য নানান তথ্যাদি বিশ্লেষণ করেও সাধারণত অনুমান করা হয় পেরিপ্লাস ও টলেমী বর্ণিত গাঙ্গে নগরীর অবস্থান ছিল দেগঙ্গার নিকটবর্তী 'চন্দ্রকেতুগড়' অঞ্চলেই। অর্থাৎ একদিকে 'চন্দ্রকেতুগড়', যা পুরাতন প্রত্নসম্পদের প্রাচুর্যে বহু সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলকে পেছনে ফেলতে পারে অতি সহজেই কিন্তু তার প্রাচীন পরিচিতির কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য নেই, অপর দিকে অসংখ্য সমৃদ্ধ প্রাচীন সাহিত্যে বারংবার উল্লিখিত 'গাঙ্গে' যার বর্তমান পরিস্থিতি, বা অবস্থান সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই।[১৮] এভাবে দেখা যায় চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাচীন অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন গবেষক ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। তবে সাধারণভাবে যে মতটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপে গৃহীত হয় তা হল খ্রিষ্টপূর্ব কাল থেকেই প্রাচীন বঙ্গদেশে 'গাঙ্গে' নামে এক বন্দর ছিল যা অবস্থিত ছিল অধুনা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দেগঙ্গা এলাকায়, এবং বর্তমান 'চন্দ্রকেতুগড়' এর সাথে মূলত একে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[১৯] চন্দ্রকেতুগড়ের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যসমূহ একে এই পরিচিতি প্রদান করেছে বলা বাহুল্য।

নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় নদী সমৃদ্ধ এলাকায় উপস্থিতির দরুন চন্দ্রকেতুগড় নানান দিক থেকে যে বিশেষভাবে পরিপূর্ণ হয়ে এসেছে বলা চলে। পূর্বে এই অঞ্চলটি মূলত বিদ্যাধরী ও পদ্মা নদী সংলগ্নরূপে ছিল ও এর মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে সংযুক্ত ছিল। বর্তমানে গঙ্গার সহিত বঙ্গোপসাগরের যোগ রয়েছে তার একাধিক শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়ে যার অন্যতম হল পশ্চিমে ভাগীরথী- হুগলী এবং পূর্বে পদ্মা, যা ক্রমে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। সমগ্র উঃ পূঃ ভারতের জলনিষ্কাশন প্রণালী এই নদী প্রবাহের দ্বারা সম্পন্ন হয়। বর্তমানের শুষ্ক প্রবাহ বিদ্যাধরী একসময় ভাগীরথী হুগলীর গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহ ছিল যা বর্তমানে চন্দ্রকেতুগড়ের ৬ মাইল দঃ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং ভাগীরথী হুগলীর অপর শাখার নাম ছিল পদ্মা, বর্তমানে চন্দ্রকেতুগড়ের উত্তরে মাত্র ১ মাইলের মধ্যে দিয়ে প্রায় বিলীয়মান পদ্মার শুষ্ক ধারা বিদ্যমান। নদীপ্রবাহের পরিবর্তন কোনো অঞ্চলের সামগ্রীক অধিবসতির ধাঁচে পরিবর্তন আনে তা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু সেই পরিবর্তনকে যথাযথ আনুধাবন করাটা বেশ জটিল তাই নিশ্চিত ভাবে কখনই বলা যায়না বর্তমানের শুষ্ক খাতে উক্ত নদীসমূহ একই ভাবে একই নামে প্রবহমান ছিল কিনা। তবে নদী সংলগ্ন ভাবে চন্দ্রকেতুগড়ের অবস্থান যে এই নগরের গুরুত্বকে ভীষণভাবে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে

তাতে সন্দেহ নেই। এরূপ অনুমান করা হয় যে ভাগীরথী হুগলীর নিম্ন প্রবাহ একদা অন্য খাতে প্রবাহিত হত যা বর্তমানে আদি গঙ্গা নামে খ্যাত, অর্থাৎ ভাগীরথীর নিজের সমুদ্রগামী স্রোত বইত কলকাতার দঃ পূঃ দিক দিয়ে প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে যার কিছু চিহ্ন আজ আদি গঙ্গা নামে পরিচিত। এনামুল হক মন্তব্য করেছেন এর প্রাচীন প্রবাহ গুলিকে খুব সহজেই আনুমান করা যায় বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় তীর্থক্ষেত্র, মেলাকেন্দ্র বা দাহঘাটের উপস্থিতির প্রেক্ষিতে। যাইহোক, এই অঞ্চলের একাধিক পরিত্যাক্ত নদী খাত ইঙ্গিত দেয় যে বিদ্যাধরী এক সময় আদিগঙ্গা বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রগামী নদীপথ দ্বারা বাহিত হত এবং সেকারণে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাণিজ্যের জন্য নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবেও বিবেচ্য ছিল।[২০]

চন্দ্রকেতুগড় ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থিত একাধিক জলাভূমি এবং শুষ্ক জমি অতীতের একাধিক নদীপ্রবাহের অস্তিত্বের[২১] ইঙ্গিত দেয় যা নিঃসন্দেহে চন্দ্রকেতুগড়ের অন্তর্দেশীয়–বহির্দেশীয় উভয় সংযোগকে সুদৃঢ় করে তুলত বলাই চলে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিকের প্রতি এনামুল হক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন- তিনি বলেন এই নদী সংলগ্ন এলাকায় চন্দ্রকেতুগড়ের অবস্থানের দরুন পলল মৃত্তিকার প্রাচুর্য এখানকার পোড়ামাটির শিল্পের সমৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে তেমনই আবার পাশাপাশি নদী সংলগ্ন বিভিন্ন তীর্থস্থান ও বাণিজ্য কেন্দ্র গুলি এই শিল্পের বাজার প্রস্তুত করেছিল[২২] অর্থাৎ শিল্পের সাথে যুক্ত অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বা একে কেন্দ্র করে স্থানীয় সাধারন মানুষের জীবিকা সম্পর্কিত দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তিনি এবং চন্দ্রকেতুগড়ের আর্থ – সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটের অবদানের ইঙ্গিতও মেলে তার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

প্রচলিত কিংবদন্তিঃ

চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কিত একটি বিশেষ চমকপ্রদ দিক হল ভারতীয় মানচিত্রে এই নামের কোন অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়না,[২৩] তাহলে খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে ‘চন্দ্রকেতুগড়’ নামটি এল কোথা থেকে? কেনই বা এর উৎপত্তি? সে দিকটিতে আলোকপাত করলে দেখা যাবে আলোচ্য প্রত্নস্থলটির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু লোককথা বা কিংবদন্তি। ‘চন্দ্রকেতু’ নামটাই স্বয়ং একটা মিথ , কোনরকম প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত হয়না যে উক্ত অঞ্চলে এই নামে কোন রাজা ছিল। তবে হ্যা এই অঞ্চলে কিছু সামন্ত রাজার অবস্থান ছিল বলে মনে করা হয় এবং এরকমই এক স্থানীয় হিন্দু শাসক চন্দ্রকেতুর নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নামকরন বলে অনুমান

করা হয়ে থাকে। সাধারণত বেড়াচাঁপা বা দেউলিয়া গ্রামে অবস্থিত যে স্তূপ তা আদতে 'চন্দ্রকেতুর গড়' (Fort of king chandraketu) যা পরবর্তীতে লোকমুখে সংযুক্ত রূপে চন্দ্রকেতুগড় নামে পরিচিত হয়। এই রাজা চন্দ্রকেতু সম্ভবত মধ্যযুগীয় বাংলায় পরিচিত ছিলেন, যার সাথে মুসলিম সন্ত পীর গোরাচাঁদ এর দ্বন্দের নানান কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে। সাধারণত বলা হয় রাজা চন্দ্রকেতু প্রভাবশালী, প্রতিপত্তিসম্পন্ন শাসক ছিলেন যিনি তার রানী পদ্মাবতী র সাথে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতেন কিন্তু ইতিমধ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী পীর গোরাচাঁদের সাথে তার সংঘর্ষ বাঁধে সেখানেও তার ফলাফল নিয়ে নানান মতামত রয়েছে। স্থানীয় কেউ কেউ বলেন চন্দ্রকেতু পরাজিত হয়েছিলেন কেউ বা বলেন না তিনি সফল হন ,তবে ভুলবশতই হোক বা যাই হয়ে থাকুক তার রানী স্বামীর মৃত্যু সংবাদে প্রান ত্যাগ করেন এবং সেই সময়েই চন্দ্রকেতু বা তার শাসনের অবসান ঘটে বলে মনে করা হয় । যদিও এই কাহিনীর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সম্পূর্ণই সংশয় রয়েছে কেননা এর কোনোরূপ যুক্তি সঙ্গত তথ্য প্রমান আমাদের হাতে নেই। সাধারণত এই কাহিনী মধ্যযুগীয় পর্বে বাংলায় হিন্দু শাসনের ধারা থেকে মুসলিম শাসনে রুপান্তরের পর্বকে চিহ্নিত করে কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়ের সমৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য সমূহ এই অঞ্চলকে , রাজা চন্দ্রকেতুর পরিচিতিকে সংযুক্ত করে আরও হাজার বছর পূর্বের বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে ।[২৪] আর এখানেই প্রত্নতত্ত্বের স্বার্থকতা।

উৎখননজনিত তথ্যাবলীঃ

ভারতের বহু প্রত্নস্থলের ন্যায় চন্দ্রকেতুগড়ের ইতিহাসও সুদীর্ঘ যা বিশ্বসংস্কৃতির দরবারে বাংলা তথা ভারতকে বিশেষ স্থান দিয়েছে এবং বাংলার শিল্পইতিহাসকে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করে। কিন্তু এর সূচনা পর্ব এমনটা ছিলনা, দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছিল উপেক্ষিত । চন্দ্রকেতুগড় নামটি সর্বপ্রথম পরিচিতি পায় বিশ শতকের প্রথমার্ধে, স্থানীয় অধিবাসী তারকনাথ ঘোষ ও অন্যান্য কিছু ব্যাক্তিবর্গের উদ্যোগে। তাৎক্ষনিক ভাবে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে তারা এ .এস. আই (A.S.I) এর নিকট স্থলটির উৎখনন বা পরীক্ষা নিরীক্ষার আবেদন জানান। তৎকালীন এক অধিকর্তা লং-হার্স্ট স্থানটি দেখে বলেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয়, পরবর্তীতে ১৯০৯ সালে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে পরিদর্শনে আসার পর উৎখনন সংক্রান্ত কিছু উদ্যোগ গৃহীত হয়। তারপর ও কিছু সময় পর্যন্ত বাংলার এই সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলটি অবহেলায় পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আশুতোষ সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হলে তারা ১৯৫৬-৫৭

সাল থেকে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রায় ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়িক উৎখনন কার্য পরিচালনা করেন[২৫] যা চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নথী যদিও এর উৎখনন সংক্রান্ত সমীক্ষার পূর্নাঙ্গ কোন রিপোর্ট অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। এই উৎখননে প্রথম ৬ বছর (১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬১-৬২) নেতৃত্ব দেন মূলত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, এবং পরবর্তী বছর গুলিতে (১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৭-৬৮) এর নেতৃত্বে ছিলেন সি আর রায়চৌধুরী এবং ১৯৬৪-৬৫ তে যুক্ত ভাবে উৎখননে নেতৃত্ব দেন দেবপ্রসাদ ঘোষ।[২৬] পরবর্তী কালে পরেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর দে, প্রতাপাদিত্য পাল, এনামুল হক, দিলীপ কুমার চক্রবর্তী প্রমুখ পণ্ডিতগণ চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কে চর্চায় নিমগ্ন হন যা চন্দ্রকেতুগড়ের সমৃদ্ধিরই পরিচয়ক।

ইতিপূর্বেই উল্লিখিত বর্তমানে চন্দ্রকেতুগড় তার চারিপাশের একাধিক গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত যেখানে ছড়িয়ে রয়েছে একাধিক স্তূপ এবং আবিষ্কৃত হয়েছে অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য সমূহ। সাধারণত এই প্রত্নস্থলটির ৫টি অংশে উৎখনন কার্য পরিচালনা করা হয়েছিল সামগ্রিক বছর গুলিতে। যথা-

১) বেড়াচাঁপা=দেবালয়=দেউলিয়া যা লোকমুখে চন্দ্রকেতুগড় নামেও অভিহিত হয়, বেড়াচাঁপা- হাড়োয়া পথের পশ্চিমে অবস্থিত।

২) খনা মিহিরের ঢিবি – এটি মূলত বেড়াচাঁপার উত্তরপূর্বে এবং বারাসাত – বসিরহাট রাজপথের উত্তরে অবস্থিত ১৪ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ১টি স্তূপ।

৩) ইটাখোলা – বেড়াচাঁপা হাড়োয়া পথের পশ্চিমে অবস্থিত ধানক্ষেত।

৪) নুনগোলা - খনা মিহিরের ঢিবি ও ইটাখোলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কেন্দ্র।

৫) হাদিপুর – দুর্গপ্রাকারের বাইরে চন্দ্রকেতুগড়ের দক্ষিণাংশে অবস্থিত গ্রাম।

এই পাঁচটি অংশে মূলত উৎখনন পরিচালনা হয় চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে ।[২৭]

চন্দ্রকেতুগড় সংলগ্ন এসকল ক্ষেত্র গুলিতে উৎখনন পরিচালিত হলেও উৎখনন কারীদের নিকট সর্বদা আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল খনা মিহিরের ঢিবি, সর্বাধিকবার খনন হয় এই অঞ্চলে। প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে খুব সহজেই দূর্গাঞ্চলের আভ্যন্তরীণ বসতির পরিমাপ ১ বর্গমাইল অনুমান করা যায় এবং দূর্গাঞ্চলের বাইরের দিকের অধিবসতিও যথেষ্টই বিস্তীর্ণ ছিল বলে মনে করা হয়।[২৮] কিন্তু কেবলমাত্র আই.এ.আর (ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি – এ রিভিউ) এর বাৎসরিক প্রকাশনায়

উৎখনন সংক্রান্ত তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ ব্যাতীত কোন পূর্নাঙ্গ বিস্তৃত আলোচনা বা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। যা প্রায় ১৯৯৬ পর্যন্ত গবেষকদের নিকট চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কিত একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত লিখিত তথ্য। এরপর ১৯৯৬ সালে এনামুল হক সকল উৎখনন জনিত বিভিন্ন তথ্যাবলীকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে,নানান দিক সমূহের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা সহ প্রথম পুর্নাঙ্গ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। যা নিঃসন্দেহে বর্তমানে চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কিত চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সহায়ক হয় ।

তবে চন্দ্রকেতুগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ কিছু সমস্যা বা জটিলতা রয়েছে যা অবশ্য উল্লেখ্য, বহু গবেষক এই সমস্যাজনিত দিকগুলির কথা বলেছেন। এনামুল হক এই সমস্যার কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন - প্রথমত, প্রত্নস্থলটির উৎখনন বা স্তরবিন্যাস সংক্রান্ত যে সকল নথী প্রকাশিত রয়েছে তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয় বেশ কিছু সংশয় জড়িত । তাই এর ধারাবাহিক পর্যায়ক্রম এর সম্পর্কেও নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা মুশকিল হয়। দ্বিতীয়ত, এখানকার ৫টি স্তূপের মধ্যবর্তী আভ্যন্তরীণ দূরত্বের ও সঠিক উল্লেখ পাওয়া যায়না । এছাড়া উৎখননকারীদের বিভিন্ন স্তরগুলির যুগ ও সময়কাল নির্ধারণের প্রয়াসে এতটাই জটিলতা রয়েছে যে সামগ্রীক স্তরবিন্যাস অনুধাবনের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণতই দিধাগ্রস্ত । যেমন- এখানে খনা মিহিরের ঢিবির কথা যদি বলা যায় সেখানে দেখা যাবে মোট ১০ বার এই নির্দিষ্ট স্থলে উৎখনন চালানো হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর পর্যায়ক্রম স্পষ্ট নয়। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে, যেমন- ১৯৫৭-৫৮ সালে এই অঞ্চলের উৎখননে মূলত ৬টি অধিবসতির স্তরের উল্লেখ করা হয়ে থাকে, প্রথম স্তর আবিষ্কৃত মন্দিরটির পূর্ববর্তী, যা গুপ্ত পূর্ববর্তী সময়কালীন। ২য় স্তর প্রাথমিক গুপ্ত পর্বীয়, ৩য় ও ৪র্থ স্তর কোনোভাবে চিহ্নিত নয়, ৫ম স্তর পালপর্বীয়, এবং ষষ্ঠ স্তর আবার কোনরকম চিহ্নিত নয়। ১৯৫৮-৫৯ সালের উৎখননে মাত্র ৩টি স্তরের কথা নথীবদ্ধ রয়েছে যার প্রথম পর্যায় মন্দিরের সময়কালকে কিছু পূর্ববর্তী রূপে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং পরবর্তী স্তর ২টি নির্ধারিত নয়। ১৯৫৯-৬০ সালের উৎখননে মৌর্য থেকে পরবর্তী গুপ্ত যুগের মধ্যে ৭টি স্তরকে চিহ্নিত করা হয় যার মধ্যে ৫ম পর্যায়কে গুপ্তযুগীয় বলা হয়। ১৯৬০-৬১ সালে ৬টি স্তর উন্মোচিত হয় যার প্রথম ৩টি নির্ধারিত নয় তবে ৪র্থ পর্যায় গুপ্ত যুগ বলে অনুমিত হয়। এরপর ১৯৬১-৬২ তে প্রায় ৮টি সাংস্কৃতিক পর্যায়ের সন্ধান মেলে যার প্রথম স্তর জলস্তরের নীচের এবং ৮ম স্তর গুপ্ত পরবর্তী ও পাল যুগের, মূলত ৭ম স্তরটিকে গুপ্ত যুগীয় বলে চিহ্নিত করা হয়। এই পর্বের ফলাফল স্বয়ং উৎখনন কর্তাদের নিকটই ছিল সংশয়াত্মক। ১৯৬২-৬৩ থেকে গভীর ভাবে খননকার্য হলে ৬টি অধিবসতির স্তরের নিদর্শন পাওয়া যায় যা যথাক্রমে মৌর্য,শুঙ্গ, কুষান, গুপ্ত, গুপ্ত পরবর্তী ও পাল

যুগের নিদর্শনের সাক্ষ্য বহন করে। পরে আরও ৪ বার এখানে উৎখনন করা হয়, ১৯৬৩-৬৪ তেও ৬টি স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় তবে কেবল ২টি পর্যায় কে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে- প্রথম পর্যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতাব্দী, এবং ২য় পর্যায় খ্রিষ্টীয় যুগের প্রাথমিক পর্বের সাথে সংযুক্ত করা হয়, বাকি ৪টি স্তরের কোন চিহ্নিতকরণ তথ্য নেই। এরপর ১৯৬৪-৬৫ এর রিপোর্টে বলা হয় খনা মিহিরের উৎখনন দ্বারা মন্দির কাঠামোটির কালানুক্রম নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়েছে যদিও শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছুই বর্ণনা করা হয়নি। ১৯৬৫-৬৬ তে এর স্তরায়ন সম্পর্কিত কিছুই বলা নেই , এবং শেষ বছর অর্থাৎ ১৯৬৬-৬৭ তে স্পষ্টভাবে ৩টি স্তরকে যথাক্রমে মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষান যুগের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।[২৯]

অর্থাৎ উপরিউক্ত এই আলোচনা থেকে খুব স্পষ্টভাবেই এর জটিলতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এবং শুধু খনা মিহিরের ঢিবি নয় এই প্রত্নস্থলের বাকি অংশ গুলির ক্ষেত্রেও কম , বেশি একই ধারা বিদ্যমান। এর কালানুক্রম বা যুগ বিভাজনের বিষয়টি যেন এক গোলকধাঁধা, যার রহস্য উন্মোচনের প্রচেষ্টা ঐতিহাসিক গবেষকদের দ্বিধান্বিত করে বারংবার। তবে সাধারণভাবে আই.এ.আর এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় উৎখননের দ্বারা বেড়াচাঁপায় ৫টি অধিবসতির পর্যায়, খনা মিহিরের ঢিবিতে ৬-৮ টি পর্যায়, ইটাখোলা তে ৪-৬ টি পর্যায় এবং নুনগোলা ও হাদিপুরে ৬টি করে অধিবসতির স্তর উন্মোচিত হয়। কিন্তু টানা ১২ বছর কাজের পর আকস্মিকভাবে কোনরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে না পৌঁছেই এই উৎখননের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ। ফলস্বরূপ অঞ্চলটি শেষ পর্যন্ত এক অধরা রহস্য হিসেবেই রয়ে যায়।[৩০]

খনা মিহিরের টিপি, প্রবেশ ভাগ সৌজন্যে- ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে সংগৃহীত

খনা মিহিরের ঢিপি, মন্দির চত্বরের দেওয়ালের ভগ্নাংশ , সৌজন্যে- ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে সংগৃহীত

খনা মিহিরের ঢিপি, সৌজন্যে- ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে সংগৃহীত

গৌরীশঙ্কর দে আবার উৎখনন সম্পর্কিত অপর ১টি দিকের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন তার মতে প্রাচীন জনগনের নগরায়ন প্রক্রিয়া, তার স্থাপত্য বিন্যাস, পুরাদ্রব্যের অবস্থান, বাসগৃহ, প্রশাসনিক কেন্দ্র তথা সামগ্রিক নগরের অবয়বকে বুঝতে হলে তাতে অবশ্যই আনুভূমিক উৎখননের প্রয়োজন। কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়ের যে উৎখনন তা উলম্ব পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতে একই প্রত্নস্থলের বিস্তৃত অংশের একাধিক স্থানে উৎখনন চালান হয়। এই উৎখননে সাংস্কৃতিক নিদর্শনের নমুনা, বিভিন্ন অধবসতি পর্ব তাদের বৈশিষ্ট্য ক্রমানুবর্তিতা প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তবে এর সীমাবদ্ধতা হল এর দ্বারা একটি প্রত্নস্থলের সার্বিক চিত্র উদ্ধার সম্ভব হয়না। একারণে সকল পুরাতাত্ত্বিক এই পদ্ধতির সাথে সহমত নন। তবে আবার চন্দ্রকেতুগড়ের ন্যায় বহুস্তর বিশিষ্ট প্রত্নস্থলের ক্ষেত্রে সঠিক চিত্র অনুধাবনের ক্ষেত্রে উলম্ব পদ্ধতিই উপযুক্ত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন কেননা উৎখননের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল স্তরবিন্যাস, এর দ্বারাই প্রাচীন সভ্যতার ধারাবাহিক নানা পর্ব উন্মোচিত হয় যা আনুভূমিক উৎখননে সম্ভব নয় ; সাধারণত বিস্তীর্ণ বা একস্তর বিশিষ্ট প্রত্নস্থলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি মূলত কার্যকর। অর্থাৎ কোন প্রক্রিয়াই যে স্বয়ংসম্পুর্ণ নয়, একে অপরের পরিপূরক সে বিষয় টি তুলে ধরে বলেছেন চন্দ্রকেতুগড়ের ন্যায় জটিল প্রত্নস্থলের ক্ষেত্রে ২টি পদ্ধতিরই উৎখনন প্রয়োজন একে সঠিক ভাবে জানার জন্য। তাই আশুতোষ সংগ্রহশালা কর্তৃক প্রাথমিক ও উলম্ব উৎখনন দ্বারা চন্দ্রকেতুগড়ের বিস্তীর্ণ ইতিহাস উন্মোচিত হলেও এর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস উদ্ধারের জন্য আনুভূমিক পদ্ধতির উৎখননের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।[৩১] এছাড়া শুধু গৌরীশঙ্কর দে –ই নন আরও বিভিন্ন গবেষকও কিন্তু চন্দ্রকেতুগড় সংক্রান্ত আলোচনায় এজাতীয় সমস্যার দিকটি উল্লেখ করেন ।

এই সূত্রেই বলা যায় চন্দ্রকেতুগড়ের স্তরায়ন বা যুগ বিভাজনের দিকটিতে জটিলতার পাশাপাশি এই প্রত্নস্থলের সমৃদ্ধির অন্যতম কারন যে বিপুল পরিমাণ টেরেকোটার উপকরন তার সময়কাল নির্ধারণের প্রক্রিয়াকেও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । কেবলমাত্র উৎখনন কালে নির্দিষ্ট ট্রেঞ্চে প্রাপ্ত নমুনা ব্যাতীত বাকি বিপুল পরিমাণ প্রাপ্ত উপকরন গুলির কাল নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব। সেকারণে তার বিকল্প হিসেবে সাময়িকভাবে টেরেকোটা অবয়ব গুলির শৈলীগত রীতি পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে যুগ বিভাজনের এক প্রবনতা গৃহীত হয়। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু সমস্যা রয়েছে, সীমা রায় চৌধুরী[৩২] তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই অধ্যায়ের মূল আলোচনা যেহেতু প্রত্নস্থল কেন্দ্রিক তাই শিল্প সংক্রান্ত অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনা পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে আলোচিত হবে। এই মুহূর্তে যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন

তা হল নানান জটিলতা, বা সমস্যাকে সরিয়ে রেখে উৎখনন সমীক্ষার ভিত্তিতে সাধারণ ভাবে এই চন্দ্রকেতুগড়ের যে কালবিভাজন করা হয় তা নিম্নরূপ –

১ম পর্ব – প্রাক মৌর্য অধ্যায়, ৬০০-৩০০ খ্রীঃ পুর্বাব্দ

২য় পর্ব – মৌর্যযুগ, ৩০০- ১৮৫ খ্রীঃ পুর্বাব্দ

৩য় পর্ব – শুঙ্গ অধ্যায়, ১৮৫ খ্রীঃ পুর্বাব্দ – ৫০ খ্রিষ্টাব্দ

৪র্থ পর্ব – কুষান অধ্যায়, ৫০ খ্রিষ্টাব্দ – ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ

৫ম পর্ব – গুপ্ত অধ্যায় , ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ – ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ

ষষ্ঠ পর্ব – পরবর্তী গুপ্ত অধ্যায়, ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ – ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ

৭ম পর্ব – পাল – চন্দ্র – সেন অধ্যায়, ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ - ১২৫০খ্রিষ্টাব্দ [৩৩]

যেকোনো প্রত্নকেন্দ্র সংক্রান্ত আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার স্তরবিন্যাস নির্ধারণ। আর সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সর্বাধিক বিজ্ঞানসম্মত তথ্য তার উৎখনন সংক্রান্ত রিপোর্টসমূহ। তাই সকল জটিলতা সত্ত্বেও আই.এ.আর কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট গুলি যে চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নথী তা অস্বীকার করার কোন ক্ষেত্র নেই। এগুলির মধ্য দিয়ে চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কে এক সামগ্রীক ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট যে ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছর ব্যাপী চন্দ্রকেতুগড়ের ৫টি স্থানে সার্বিক উৎখনন কার্য পরিচালনা করা হয়েছিল, সুতরাং এর উৎখনন সংক্রান্ত আলোচনা এক দীর্ঘ বিষয়। পরিসরের স্বল্পতায় খুব সংক্ষেপেই এর স্তরায়ন এবং প্রত্নসাক্ষ্য সমূহকে তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে। চন্দ্রকেতুগড়ের ৫টি ক্ষেত্রের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য স্থানাধিকারী **খনা মিহিরের ঢিপি,** ১৯৫৭-৫৮ সালে বারাসাত বসিরহাট রাজপথের উত্তরে অবস্থিত এই খনা মিহিরের ঢিবিতে প্রথম উৎখনন চালানো হয়। যেখানে গুপ্ত পর্বীয় ১টি বহুভুজ ইট নির্মিত বিস্ময়কর কাঠামো উন্মোচিত হয় এবং এর পশ্চিমের দেওয়ালটি নজরে আসে। স্থাপত্য টি ১৪ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং দেওয়াল টি ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৪ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট ছিল। এই স্থাপত্য টি সর্বোতভদ্র রীতির কোন মন্দির হিসেবে অনুমান করা হয় যা একাধিকবার সংরক্ষিত হয়েছে এবং কখনো কখনো এক্ষেত্রে নকশাযুক্ত অলংকৃত ইটের ব্যবহার ও পরিলক্ষিত হয়।[৩৪] ইতিপূর্বেই ক্ষেত্র প্রসঙ্গে এর স্তরবিন্যাস জনিত

বিভিন্ন দিকগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাই বর্তমানে বাকি স্থানগুলির ওপর আলোকপাত করা হবে।

বেড়াচাঁপাঃ

চন্দ্রকেতুগড়ে সর্বপ্রথম উৎখনন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় ১৯৫৬-৫৭ সালে, রাজা চন্দ্রকেতুর গড় এলাকা বা বেড়াচাঁপা অঞ্চলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে, কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে এসময় একটি দুর্গ নগরীর ধ্বংসাবশেষ উদ্ঘাটিত হয় এবং প্রাক মৌর্য থেকে গুপ্ত পর্যন্ত ৫টি অধিবসতির স্তর উন্মোচিত হয় যার প্রতিটিকে চিহ্নিতকরণের মাধ্যম রূপে ভিন্ন স্তরে বিচিত্র মৃৎপাত্র ও প্রত্নদ্রব্যের সন্ধান রয়েছে। যেমন প্রাক মৌর্য পর্যায়ের লাল বর্ণের এবং কখনও তাতে স্লিপের ব্যবহার যুক্ত মৃৎপাত্র, মৌর্য -শুঙ্গ পর্বের সাক্ষ্যস্বরূপ এন বি পি পর্বের আবির্ভাব, কালো চকচকে পাত্র ও মসৃণ- অমসৃণ ধূসর মৃৎপাত্রের নিদর্শন প্রভৃতি লক্ষণীয়। এই পর্বের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পোড়ামাটির নলযুক্ত নর্দমার নিদর্শন। ৩য় পর্ব অর্থাৎ শুঙ্গ পরবর্তী পর্যায়ে লাল বর্ণের মৃৎপাত্রের পাশাপাশি তাম্রমুদ্রা, পাথরের পুঁতি, তামার কাজল কাঠি প্রভৃতি মেলে। এতক্ষন পর্যন্ত কোন টেরেকোটা উপকরন পাওয়া না গেলেও এর পরবর্তী স্তর অর্থাৎ কুষান পর্বে মূলত নির্দিষ্ট কুষান ধাঁচের টেরেকোটা মানব মূর্তির ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে। এবং শেষ পর্বে খুব সামান্য কিছু পোড়া ইটের নির্মিত ধ্বংসাবশেষ ছাড়া সেরম কিছু মেলেনা।[৩৫] আরও ২বার এই অঞ্চলে উৎখনন জনিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, যথাক্রমে ১৯৫৭-৫৮ এবং সর্বশেষ বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ সালে। ১৯৫৭-৫৮ তেও একই ভাবে ৫টি স্তরের কথা পাওয়া যায় এবং যে নর্দমার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল পূর্ববর্তী উৎখননে তা স্পষ্টরূপে প্রকটিত হলে দেখা যায় তা পূর্বাভিমুখে সম্প্রসারিত।[৩৬] এছাড়া শেষ বর্ষে কোন খননকার্য নয় কেবল পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা গভীর অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল, যার দ্বারা কিছু মৃৎপাত্র, টেরাকোটা উপকরণ,পুঁতি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়।[৩৭]

রাজা চন্দ্রকেতুর গড় এলাকার বর্তমান দৃশ্য, সৌজন্যে- ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে সংগৃহীত

রাজা চন্দ্রকেতুর গড় এলাকার বর্তমান দৃশ্য, সৌজন্যে- ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে সংগৃহীত

ইটাখোলাঃ

দীর্ঘ উৎখনন প্রক্রিয়ার মধ্যে ইটাখোলা অঞ্চলে প্রথমবার খননকার্য পরিচালিত হয় ১৯৫৯-৬০ সালে এবং পরবর্তীতে যথাক্রমে ১৯৬৩-১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আরও ৩বার। প্রথমবার ইটাখোলায় উৎখননে ৬টি অধিবসতির স্তর, হাতির দাঁতের উপকরণাদি, ব্রাহ্মী লিপি উতকীর্ণ শুঙ্গপর্বীয় ১টি হাড়ের উপাদান ,নানা মৃৎপাত্র ইত্যাদি মেলে। ২য় পর্ব বা প্রাথমিক মৌর্য পর্যায়ের কাল টি উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে একটি উন্মোচিত ভূ-গর্ভস্থ পোড়ামাটির নলের পয়ঃপ্রণালী র জন্য। তবে স্তরগুলির সবগুলির কাল যথাযথ নির্ধারিত নেই।[৩৮] পরবর্তী ১৯৬৩-৬৪ সালে এন বি পি থেকে আনুমানিক ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চারটি অধিবসতির স্তরের সন্ধান মেলে। এখানে এন বি পি, রুলেটেড প্রভৃতি নানান প্রকৃতির মৃৎপাত্র, মুদ্রা, টেরাকোটা উপাদানের পাশাপাশি বিশেষ উল্লেখ্য গুপ্ত পর্বীয় লিপিতে বৌদ্ধ মন্ত্র 'ইয়ে ধর্ম হেতু প্রভা' খোদিত ১টি সিলের সন্ধান পাওয়া যায় এই পর্বের উৎখনন থেকে। যা হয়তো এই অঞ্চলের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস জনিত আলোচনায় উল্লেখযোগ্য।[৩৯] পরবর্তী উৎখননেও(১৯৬৪-৬৫) এই অঞ্চলের কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকে এবং নগরপ্রাচীর ও পরিখার চিহ্ন সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়।[৪০] ১৯৬৫-৬৬ সালের উৎখননে দেখা যায় প্রথম বসতি গড়ে ওঠে উত্তর ভারতীয় কাল মসৃণ মৃৎপাত্রীয় সংস্কৃতি পর্বে, এই স্তর থেকে মেলে পোড়ামাটি ও পাথরের পুঁতি, পাঞ্চ মার্কড মুদ্রা, মাছের কাঁটা, গৃহপালিত পশুর হাড় ইত্যাদি। ২য় পর্যায়ে শুঙ্গ টেরেকোটা, হাতির দাঁতের উপকরণ ও অন্যান্য নানা পুরাদ্রব্য। ৩য় বা কুষান পর্ব থেকে মেলে রুলেটেড মৃৎপাত্র, পরবর্তী ৪র্থ ও ৫ম পর্ব ছিল গুপ্ত ও পরবর্তী গুপ্ত সংস্কৃতির নিদর্শন।[৪১] এই পর্বই ছিল ইটাখোলা উৎখননের শেষ অধ্যায়।

নুনগোলা ও হাদিপুরঃ

চন্দ্রকেতুগড়ের অপর দুই কেন্দ্র হল নুনগোলা ও হাদিপুর। এই উভয় অঞ্চলেই উৎখনন কার্য পরিচালিত হয় ১৯৬৫-১৯৬৬ সালে। উৎখননকারী গণ উল্লেখ করেছেন নুনগোলাতে উৎখনন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ইটাখোলার ধারাবাহিকতা বা অনুক্রমকে নিশ্চয়তা প্রদান করে। সম্ভবত প্লাবন এর প্রভাব স্বরূপ এখানে ৪র্থ অর্থাৎ গুপ্ত পর্যায়ে ১০-১৫ সেমি পুরু বেলেমাটির স্তর সনাক্ত করা যায়। এছাড়া ২য় পর্ব থেকে খেলনা গাড়ি, টেরেকোটার ফলক প্রভৃতি পাওয়া যায় । এছাড়া চন্দ্রকেতুগড়ের দুর্গাঞ্চলের বাইরে অবস্থিত হাদিপুরেও এই বছর উৎখনন চালানো হয়। এর প্রাথমিক পর্বটি খ্রিস্টীয় যুগের সূচনা পর্ব তথা চন্দ্রকেতুগড়ের ৩য় পর্যায়ের সমসাময়িক, পরবর্তী

স্তরগুলি বাকিদের অনুরূপ। উৎখননে উল্লেখযোগ্য নির্মাণ কাঠামো, পোড়ামাটির উপকরণ, রুলেটেড মৃৎপাত্র, হাতির দাঁতের উপকরণ প্রভৃতি পাওয়া যায়।[৪২]

এই ছিল দীর্ঘ ১২ বছর ব্যাপী চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে উৎখনন সূত্রে আবিষ্কৃত স্তরবিন্যাশের সংক্ষিপ্তায়ন। প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্নকেন্দ্রের স্তরায়ন ব্যতীত অপর আবশ্যক উপাদান হল আবিষ্কৃত প্রত্নরাজি সমূহ যা উক্ত সময়কালীন ইতিহাসের জীবন্ত দলিল। চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু সংখ্যায় অগণিত এবং গুরুত্বে অসামান্য। কেবল প্রথাগত উৎখনন বা অনুসন্ধান পর্বে নয়, খুব সাধারণ ভাবেই চাষের জমি বা খেলার মাঠে মাঝে মধ্যেই তারা উঁকি মারে আজও। যাদের একাধারে শৈল্পিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন সময় প্রাপ্ত চন্দ্রকেতুগড়ের নানান পুরাদ্রব্য সংরক্ষিত রয়েছে চন্দ্রকেতুগড় স্মৃতি শহীদুল্লাহ মহাবিদ্যালয়ের সংগ্রহালয়, দীলিপ মৈতের গৃহস্থ সংগ্রহালয় সহ কলকাতার বিভিন্ন সংগ্রহশালা যথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রত্নতত্ত্বশালার চন্দ্রকেতুগড় গ্যালারী সহ অন্যান্য যাদুঘর এবং নানান ব্যক্তিগত সংগ্রাহকদের তত্ত্বাবধানে। পরিসরের স্বল্পতায় এর বিস্তীর্ণ আলোচনা সম্ভবপর নয়, তাই চন্দ্রকেতুগড়ের এই বিপুল প্রত্নবস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে নীচে ছকের মাধ্যমে তা তুলে ধরার প্রয়াস করব।

মৃৎপাত্র	সামান্য কিছু চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র,লাল বর্ণীয় পাত্র কখনো তাতে স্লিপ যুক্ত(দীর্ঘ গ্রীবাযুক্ত বয়াম, বড় কাপ, বাটি), কালো ও লাল বর্ণীয় পাত্র, অসংখ্য এন বি পি মৃৎপাত্র, মসৃণ ও অমসৃণ ধূসর পাত্র, কৃষ্ণবর্ণীয় চকচকে পাত্র, রুলেটেড মৃৎপাত্র প্রভৃতি।[৪৩]
মুদ্রা	তামা ও রূপার পাঞ্চ মার্কড মুদ্রা,(জলযান,হস্তী ,সূর্য-ও-চক্র,ময়ূর ইত্যাদি মোটিফ সম্পন্ন) কাস্ট কপার কয়েন, পাঞ্চ মার্কড বিলন মুদ্রা, এছাড়া কুষান ও গুপ্ত রাজাদের কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়।[৪৪]
টেরাকোটা উপাদান	ভিন্ন ধাঁচের, ভিন্ন প্রযুক্তি ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য টেরাকোটার ফলক ও পূর্ণাবয়ব মূর্তি,সীল,অলংকার প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড়ের বিভিন্ন স্থানে,[৪৫] দু-এক কথায় যার উপস্থাপনা প্রায় অসম্ভব। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে মূলগতভাবে টেরাকোটা শিল্প কেন্দ্রিক আলোচনাই সুবিস্তারে বর্ণিত হবে।

সীলমোহর	সাধারণত চিত্র সম্বলিত, লেখ সম্বলিত এবং চিত্র ও লেখ উভয় সম্বলিত সীলমোহরের সন্ধান মেলে। বিশেষ উল্লেখ্য খরোষ্ঠী ও খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী লিপি সম্বলিত সীলমোহরের অনুসন্ধান যা চন্দ্রকেতুগড়ের ইতিহাসকে এক বিশেষ স্থানে উন্নীত করে। সীলগুলির বেশির ভাগই পোড়ামাটির তৈরি তবে গজদন্ত ও হাড়ের তৈরি সীলমোহরও পাওয়া গেছে।[৪৬]
গজদন্ত শিল্প	নক্সা করা ফলক, ক্ষুদ্র মনুষ্য মূর্তি, সূচ, চিরুনি, হাতের বালা প্রভৃতি নানান উপকরণ আবিষ্কৃত।[৪৭]
অলংকার সামগ্রী	সোনা,রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু এবং পোড়ামাটি নির্মিত একাধিক অলংকারের সন্ধান মেলে বিভিন্ন সময়ে।[৪৮]
পুঁতি	ছোট, বড় মাঝারি বিভিন্ন মাপের গোল, ডিম্বাকৃতি, ত্রিভুজাকৃতি, চতুষ্কোণ,ঘনক প্রভৃতি আকৃতির কাঁচ,পোড়ামাটি,হাড়,গজদন্তের পাশাপাশি অ্যাজেট,কার্ণেলিয়ান,কোয়ার্টজ, চ্যালসেডনি ইত্যাদি মূল্যবান ও অর্ধমূল্যবান রত্ন নির্মিত পুঁতির নিদর্শনও পাওয়া যায়।[৪৯]
অন্যান্য প্রত্ন উপাদান	এছাড়াও শঙ্খ ও হাড়ের উপকরণ,কাঠের স্থাপত্যাংশ,স্টাকো ভাস্কর্যের অংশবিশেষ, প্রস্তরবলয়, ব্রোঞ্জ নির্মিত মৈত্রেয় মূর্তি, বেলেপাথর নির্মিত বোধিস্বত্ত্ব, সূর্য, বিষ্ণু মুর্তি,[৫০] জৈন মূর্তি[৫১] প্রভৃতি নানাবিধ অজস্র প্রত্নদ্রব্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার দক্ষিণ বঙ্গের এই প্রত্নকেন্দ্র চন্দ্রকেতুগড়।

চন্দ্রকেতুগড় স্মৃতি শহীদুল্লাহ মহাবিদ্যালয়ে সংরক্ষিত প্রত্নদ্রব্যাদি (যথাক্রমে- **টেরাকোটার উপকরণ, মুদ্রা, ও হাতির দাঁতের সামগ্রী**) সৌজন্যে- ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে সংগৃহীত

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা তথা প্রাচীন বাংলার অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন প্রসিদ্ধ প্রত্নস্থল রূপে চন্দ্রকেতুগড় এর অবস্থান নিয়ে কোন সংশয় নেই। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে স্পষ্টতই অনুমান করা যায় যে এটি ছিল এক সমৃদ্ধ ও উন্নত নগরী যা এক দীর্ঘকালীন ইতিহাসের (প্রাক মৌর্য থেকে পাল-সেন-চন্দ্র পর্যন্ত সময়কাল) সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। এখানে প্রাপ্ত অসামান্য প্রত্নসাক্ষ্য চন্দ্রকেতুগড়কে তো বটেই পাশাপাশি বিশ্বদরবারে বাংলার ইতিহাস কেও এক বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছে। আবিষ্কৃত নগর প্রাকার, দুর্গ, মাটির প্রায় ১৩ - ১৪ ফুট গভীরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির নলের পয়ঃপ্রণালী , উপরিল্লিখিত অসংখ্য পুরাদ্রব্য অর্থাৎ বিচিত্র মৃৎপাত্র ,মূল্যবান পাথর, অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক এবং অন্যান্য উপকরণাদি , বিভিন্ন ধাতু, পোড়ামাটি সামগ্রী বা পাথরের নির্মিত অলঙ্কার উন্নত মানের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী সম্বলিত রৌপ্য – স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রা, সীলমোহর প্রভৃতি অসংখ্য উপাদান নানাভাবে একে প্রাসঙ্গিক করে তোলে ইতিহাসের পাতায় । প্রাচীর বেষ্টিত যে দুর্গাঞ্চল সেখানে সম্ভবত শাসক ও উচ্চবিত্ত অভিজাত সম্প্রদায় বাস করত এবং নগরের অন্য অংশে যেখানে প্রাচীরবেষ্টিত ছিলনা সেখানে সম্ভবত ছিল সাধারণ মানুষের বসতি অর্থাৎ সমাজে বিভাজনের রেখাটি স্পষ্ট। এই একই ধারার নগরবিন্যাশ কিন্তু মহাস্থানেও দেখব পাশাপাশি অন্যান্য প্রাচীন কেন্দ্র যথা রামপাল, কোটিবর্ষ সর্বত্র লক্ষণীয় বলে নীহাররঞ্জন রায় তুলে ধরেছেন।[৫২]

এছাড়াও বিশেষ উল্লেখ্য খনা মিহিরের ঢিবির উৎখননে আবিষ্কৃত অসামান্য মন্দিরগুচ্ছ যা একাধিক যুগে নির্মিত বলে গবেষক গন অনুমান করেছেন। পাহাড়পুরের ন্যায় মূল মন্দিরের উত্তরমুখী অবস্থান, প্রাপ্ত ১টি ইস্টক প্রভৃতি বেশ কিছু সূত্র ধরে এর সাথে বৌদ্ধধর্মের সংযোগ এর ইঙ্গিত দিয়েছেন গৌরীশঙ্কর দে।[৫৩] পাশাপাশি খনা মিহিরের ঢিপিতেই প্রাপ্ত ব্রোঞ্চ নির্মিত বৌদ্ধ মৈত্রেয় মূর্তিও উক্ত অঞ্চলে বৌদ্ধ সংযোগকে ইঙ্গিতবাহী করে ঠিকই কিন্তু সকল সম্ভাবনা স্বত্ত্বেও কখনোই নিশ্চিত ভাবে বলা যায়না উক্ত মন্দিরটি কোন ধর্ম বা দেবদেবীর সহিত সম্পর্কিত ছিল কেননা এই অঞ্চল থেকেই একাধারে পার্বতী, বোধিস্বত্ত্ব আবার একটি জিন মূর্তির ও সন্ধান পাওয়া যায় । তাই স্পষ্টতই অনুমান করা চলে এক মিশ্র সংস্কৃতির আভাষ ছিল এ অঞ্চলে। সেই সূত্রে গৌরীশংকর দে চন্দ্রকেতুগড়ের ন্যায় বন্দরনগরীর এমন হওয়া টাই স্বাভাবিক বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৪] তবে এক্ষেত্রে কিছু কথা বলা আবশ্যক, চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণাটি প্রচলিত রয়েছে তা হল এটি আদি ঐতিহাসিক পর্বের বাংলার একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর নগরী যা ভারত তথা আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সাথে বাংলার সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু ইদানিং একটি প্রশ্ন এক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপুর্ন হয়ে উঠেছে যে ,চন্দ্রকেতুগড় প্রকৃতই বন্দর নগরী ছিল কিনা? প্রকৃতই কি এটি বৈদেশিক তথ্যের উল্লিখিত প্রাচীন বন্দর ‘গাঙ্গে’??
কেননা তার সমর্থনে কোন দেশীয় লিখিত উপাদান আমাদের হাতে নেই এবং চন্দ্রকেতুগড় থেকে কোন শিলালিপি বা ঐরূপ কোন নিদর্শন মেলেনা যা একে বন্দর রূপে নিশ্চিত করে। তাই অনেকেই এই বিষয় টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

চন্দ্রকেতুগড়ে এই জাতীয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এবং অবশ্যই তার ভৌগোলিক অবস্থান। প্রাচীন বৈদেশিক লিখিত তথ্যাবলীতে ‘গাঙ্গে’ বন্দরের যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ তা থেকে অধিকাংশ গবেষকই অনুমান করেন যে চন্দ্রকেতুগড় ই হল উক্ত গাঙ্গে বন্দরের বর্তমান অবস্থান। প্রথমত তার ভৌগোলিক অবস্থানগত বিচারে বলা যায় এই অঞ্চলের সঙ্গে ব্যপক নদীসংযোগের ইঙ্গিত আজও পাওয়া যায় অধুনা চন্দ্রকেতুগড়ের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। চন্দ্রকেতুগড় সংলগ্ন প্রবাহিত বিদ্যাধরী, পদ্মার মাধ্যমে রায়মঙ্গলের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত ছিল এই অঞ্চল এবং অজস্র শুষ্ক জলাভূমি, বিল প্রভৃতি নানান নদী প্রবাহের ইঙ্গিত দেয় যা ইতিপূর্বেও বর্তমান অধ্যায়েই আলোচিত। এই বিষয়টি চন্দ্রকেতুগড়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যম হিসেবে সুগম জলপথ এর পাশাপাশি বানিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা কে বহুলাংশে তাৎপর্যপূর্ন করে তোলে। পাশাপাশি

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য যদি দেখা যায় যেমন -ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের রুলেটেড সংস্কৃতির মৃৎপাত্র, উত্তর ভারতীয় মসৃণ কালো মৃৎপাত্র, বিভিন্ন ধাঁচের কখনো উত্তর ভারতীয় বা মধ্য গাঙ্গেয় অঞ্চলের প্রভাব যুক্ত, কখনো গান্ধার অঞ্চলের কখনো বা গ্রেকো-রোমান প্রভাব যুক্ত বা আরও নানা বিচিত্র ধরণের টেরাকোটা সামগ্রী, খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী লিপি সম্বলিত সিল প্রভৃতি বহির্দেশীয় প্রভাবের ছাপ তুলে ধরে বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতিতে। আর সহজেই অনুমেয় এই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে চন্দ্রকেতুগড় গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে এসেছে। তৎকালীন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক আলোচনা করলে চন্দ্রকেতুগড়ের ভূমিকার দিকটি বিশেষ গৌরবের সাথে উচ্চারিত হয়, যার নিশ্চিত আভাষ পাওয়া যাবে পরবর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে। গৌরীশঙ্কর দে উল্লেখ করেছেন, প্রাচীন ভারতে বন্দরের অবস্থান সরাসরি সমুদ্রতটে নয় বরং নদীর মোহনা বা বদ্বীপ অঞ্চলে থাকত অর্থাৎ সমুদ্রের সাথে সংযোগ থাকবে কিন্তু দেশের কিছুটা অভ্যন্তরে অবস্থিত হবে যা তার সুরক্ষার পক্ষে উপযোগী ছিল। একারণে সমুদ্র থেকে কিছুটা দূরে অথচ নদীপথে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত এমন স্থানে গঙ্গা বন্দর ও নগরের অবস্থান স্বাভাবিক, আর সেই ভৌগোলিক সংস্থান কেবল চন্দ্রকেতুগড়ে দেখা যায় তাই এই অবস্থান এবং দীর্ঘকালীন ব্যাপী এর ধারাবাহিকতা ও প্রত্নদ্রব্যের সাক্ষ্য একে গ্রীক লেখকদের বর্ণিত গাঙ্গে বন্দর রুপেই ইঙ্গিত দেয় ।[৫৫] এছাড়াও ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রনবীর চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বহুক্ষেত্রে এপ্রসঙ্গে নানা মন্তব্যের উপস্থাপনা করেছেন। সাধারণত অধিকাংশ গবেষকের চর্চা থেকে অনুমিত হয় এই বন্দর ছিল নদীকেন্দ্রিক বন্দর, কিন্তু উপত্যকীয় ও দূরবর্তী সমুদ্র বাণিজ্য উভয় সুযোগ সুবিধাই বিদ্যমান ছিল।[৫৬]

শেষে বলা চলে বন্দর নগরী হিসেবে চন্দ্রকেতুগড়ের অভিধার বিষয় টি বেশ দ্বিধান্বিত। তবে সংশয় থাকলেও এত সাক্ষ্য অর্থাৎ বন্দর অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান, বিচিত্র পুরাদ্রব্যের প্রাচুর্য প্রভৃতি থেকে চন্দ্রকেতুগড়কে এক শিল্পসমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর নগরী রূপেই অনুমান করা যায়। পাশাপাশি উপরিউক্ত যাবতীয় আলোচনা খুব সহজেই একে প্রাচীন বাংলার অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ প্রত্নস্থল এবং বঙ্গীয় ইতিহাসের ধারক ও বাহক রূপে বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ করে তোলে সন্দেহ নেই।

মহাস্থানগড়

আদি ঐতিহাসিক পর্বীয় বাংলার ইতিহাসে চন্দ্রকেতুগড়ের পাশাপাশি অপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্নস্থল হল অধুনা বাংলাদেশের মহাস্থানগড়। আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য বা ঐতিহাসিক তাৎপর্য উভয় পরিসর থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কেন্দ্রটিও চন্দ্রকেতুগড়েরই ন্যায় এক দীর্ঘ সময়ের ঐতিহ্য বহন করে। তবে প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতক থেকে সূচনা হলেও চন্দ্রকেতুগড়ের ন্যায় পাল পরবর্তী অধ্যায়ে প্রায় বিস্মৃত হয়ে যায়নি তা দীর্ঘদিন সমৃদ্ধ নগরী ও গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান রূপে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ সকল ধর্মবিশ্বাসের নিকট গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল এই অঞ্চল।[৫৭] যদিও আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর নিদর্শন পাওয়া গেলেও ত্রয়োদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী সময়কালীন মহাস্থানের ইতিহাস প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন।[৫৮]

এই গড় বা দূর্গের বিবরন প্রথম লিপিবদ্ধ করেন বুকানন হ্যামিলটন এবং পরবর্তীতে ১৮৭৯-৮০ নাগাদ প্রত্ন অনুসন্ধান পর্বে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম সর্বপ্রথম একে প্রাচীন 'পুণ্ড্রনগরের' সাথে শনাক্ত করেন।[৫৯] এই পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন নগর উত্তর বাংলার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন নগর ছিল । অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় এই প্রত্নস্থল সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন 'বৃহৎকথামঞ্জরী' , 'রাজতরঙ্গিণী' , 'দিব্যাবদান' এছাড়া অন্যান্য অনেক সাহিত্য গ্রন্থ ও লিপিমালায় পুণ্ড্রবর্ধনের অল্পবিস্তর উল্লেখ রয়েছে এছাড়া বর্তমান এই বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থান এর ধ্বংসাবশেষের প্রত্নতাত্ত্বিক বর্ণনা থেকে সুপ্রাচীন এই নগরটি সম্বন্ধে বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যায়।[৬০] প্রকৃতই তার উক্তি যথার্থ, একাধারে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক সাক্ষ্যে এই মহাস্থান বা পুণ্ড্রনগর সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা পাই যা কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতই অনুপস্থিত।

গুপ্ত পর্বে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটু নজর দিলে দেখা যায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের বৃহত্তম রাজ্য বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি , যার অধীনে ছিল যথাক্রমে বিষয় ,মণ্ডল ,বীথি এবং গ্রাম । সেসময় বাংলার বৃহত্তর ভুক্তি বিভাগ ছিল এই 'পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি' প্রত্যক্ষভাবে যার উল্লেখ পাওয়া যায় প্রথম কুমারগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন থেকে, এছাড়া পাহাড়পুর শিলালিপি তেও এই পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির উল্লেখ মেলে যার মুখ্য কেন্দ্র ছিল 'মহাস্থান'।[৬১] এই একই ধারা পাল পর্বেও বিদ্যমান ছিল , নানান সূত্র থেকে এই পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির নাম পাওয়া যায় যার মধ্যে অন্যতম প্রথম মহীপালের বানগড় তাম্রশাসন।[৬২] অর্থাৎ উক্ত পর্বে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশাসনিক কেন্দ্র

হিসেবে পুণ্ড্রনগর বা অধুনা মহাস্থানের গুরুত্ব নিঃসন্দেহেই অস্বীকার করার নয়। অন্যদিকে সাঁচির দুটি নিবেদন শিলালেখর অর্পণকারী রূপে পুণ্ড্রবর্ধনের ২জন অধিবাসীর কথা জানা যায় , যা অন্যতম সমৃদ্ধ প্রাচীন নগরী হিসেবে একে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে।[৬৩] আবার প্রাচীন বেশ কিছু সাহিত্যিক উপাদানে এই নগরী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় । বৌদ্ধ সাহিত্যাবলীতে এর বেশ কিছু উল্লেখ রয়েছে , বৌদ্ধ পুরাণমতে বুদ্ধদেব কিছুদিন পুণ্ড্রনগরে ছিলেন এবং নিজ ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। হিউ এন সাং সপ্তম সতকে বাংলায় আসেন এবং তার রচনা এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ,তার আগমন কালে এই নগর আয়তনে ৬ মাইলের অধিক এবং নানাভাবে ভীষণ সমৃদ্ধ ও সুশোভিত ছিল বলে জানা যায়। আবার সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতমানসে' পুণ্ড্রবর্ধনকে বরেন্দ্রীর মুকুটমণি ,পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান বলে গন্য করা হয়েছে ।[৬৪] আবার কাশ্মীরি ঐতিহাসিক কলহনের রাজতরঙ্গিনী এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ,তার লেখনী থেকে জানা যায় অষ্টম শতকে রাজা জয়পীড় পুন্ড্রবর্ধন পরিদর্শনে আসেন এবং স্কন্দ গোবিন্দ মন্দিরের নর্তকী র প্রতি প্রনয়াসক্ত হন ও উক্ত মন্দিরক্ষেত্রটি বর্তমানে মহাস্থান শহর থেকে কিছু দক্ষিণে বাঘোপাড়া নামক অঞ্চলে চিহ্নিত করা গিয়েছে এবং সেখান থেকে কুষান পর্বের একটি লাল বেলেপাথরে নির্মিত কার্তিকেয় মূর্তির ও সন্ধান পাওয়া যায়।[৬৫] তবে পুন্ড্রবর্ধন ও মহাস্থান যে একই অঞ্চল তার আদিমতম সাক্ষ্য মেলে 'করতোয়া -মাহাত্ম্য' নামক দ্বাদশ শতকীয় একটি সংস্কৃত গ্রন্থে। যেখানে করতোয়া নদী তীরবর্তী অবস্থিত মহাস্থান কে পুণ্য পৌন্ড্রনগর রূপে উল্লেখ করা হয়েছে ,এখনো এই অঞ্চল হিন্দুদের নিকট পবিত্র স্থান বলে গৃহীত হয় এবং প্রত্যেক নারায়নী তিথিতে (প্রতি ১২ বছর অন্তর পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত) হাজার হাজার মানুষ করতোয়া নদীতে স্নান করতে আসেন। মহাস্থানের এই করতোয়ার তীর্থমহিমার কথা আলোচ্য গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লিখিত আছে।[৬৬]

তবে বর্তমানে মহাস্থানগড় সম্পর্কিত যে সাক্ষ্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন রূপে বিবেচিত হয় তা হল – মহাস্থানের সুবিস্তৃত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মৌর্য ব্রাহ্মী লিপিখন্ডের আবিষ্কার । এই লিপিমালাটি ১৯৩১ সালের ৩০শে নভেম্বর মহাস্থানের এক স্থানীয় ফকির আবিষ্কার করেন যা বর্তমানে কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘর এ সংরক্ষিত।[৬৭] একমাত্র এর দ্বারাই খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় -দ্বিতীয় শতকে বাংলার এক অংশের রাস্ট্রবিন্যাসের ধারণা পাওয়া যায় তথা বাংলায় মৌর্য শাসনের একমাত্র কেন্দ্র রূপে মহাস্থানের পরিচয় পাওয়া যায় । প্রাচীন উত্তর বঙ্গে মৌর্য শাসনের কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রনগর বা বর্তমান মহাস্থান ,এই লিপিটি ব্যতীত প্রাচীন বাংলায় আর কোন মৌর্য শাসনাদির সাক্ষ্য নেই এবং বাংলার প্রাথমিক লিখিত উপাদান হিসেবেও এই শিলালিপিটি গুরুত্বপূর্ন। এই লিপিতে মৌর্য সম্রাট অশোকের সুশাসন ও জনকল্যাণের কথা সুবিদিত বলে সাধারণত অনুমান

করা হয় , যেখানে পুন্ড্রনগরের এক দুর্ভিক্ষ এবং উক্ত পর্বের পরিত্রাণ স্বরূপ রাজকীয় উদ্যোগের কথা বর্ণিত । যার সাথে অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত কথনের মিল পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, এই লিপি সংক্রান্ত স্থিত কিছু সংশয়ের কথাও অবশ্য উল্লেখ্য যা বর্তমানে এপ্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই লিপিতে আদতে প্রত্যক্ষ রূপে কোন শাসক এর উল্লেখ নেই, কেবল দুর্ভিক্ষ কালে প্রজাকল্যানের ইঙ্গিত রয়েছে। এই লিপির সাথে অশোকের অন্যান্য শিলাস্তম্ভ বা নির্দেশনামায় বর্ণিত লিপিমালার সাদৃশ্য এবং পাশাপাশি উপস্থাপিত জনকল্যাণের ধারণার প্রেক্ষিতে সাধারণত অনুমান করা হয়ে থাকে মহাস্থানে প্রাপ্ত উক্ত শিলালিপি মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়কালীন তবে তার নিশ্চিত কোন ভিত্তি বা অন্য কোন উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়না যা থেকে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় প্রত্যক্ষ মৌর্য শাসন বাংলায় ছিল কিনা।[৬৮] এই ফলকটি ছাড়া বাংলায় মৌর্য সংস্কৃতির সাথে সংযোগের নিদর্শন স্বরূপ কেবল বিভিন্ন প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত পাঞ্চ-মার্কড মুদ্রা, উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র এবং মৌর্য শৈলীর কিছু পোড়ামাটি উপকরণ বিদ্যমান যা থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের সহিত সংযোগের দিকটি প্রকাশিত হলেও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব জনিত ধারণার ইঙ্গিত কিন্তু মেলেনা। আর তাছাড়া সম্রাট অশোকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে উল্লেখ্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থিত তার অজস্র স্তম্ভলিপি গুলি, অথচ মগধ ও বাংলার অত্যন্ত নিকট ভৌগোলিক অবস্থান এবং মৌর্য রাজধানী পাটলিপুত্রের সহিত বাংলার ঘনিষ্ট সম্পর্ক সত্ত্বেও বাংলায় এরূপ কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না। তাই সেই দিকটি কিন্তু বাংলায় মৌর্য শাসনের বিষয়টিকে সংশয়াত্মক করে বলে অনেকে মনে করেন। সরাসরি মৌর্য শাসক কর্তৃক শাসন প্রবর্তনের বিষয়টিতে দ্বিধা থাকায়, এবং শিলালিপিতে মহামাত্রের উল্লেখ থেকে মনে হয় সম্ভবত জনৈক রাজপ্রতিনিধির নেতৃত্বে বাংলায় তখন মৌর্য শাসন পরিচালিত হত ।[৬৯] তবে যাইহোক সংশয় স্বত্ত্বেও সাধারণত মনে করা হয় আবিষ্কৃত এই ব্রাহ্মী শিলালিপিটি মহাস্থানগড়ের প্রাচীনত্বকে মৌর্য পর্বে নিয়ে যায় পাশাপাশি ‘পুন্ডনগল’ (পুণ্ড্রনগর) শব্দের উল্লেখ ইতিপূর্বে প্রাচীন সাহিত্যিক উপাদানে বর্নিত পুণ্ড্রনগর ও মহাস্থানের অভিন্নতার তথ্য টিকেও প্রামান্যতা প্রদান করে। এছাড়া উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র সংস্কৃতি ,পাঞ্চ মার্ক মুদ্রা প্রভৃতি আরও নানা তথ্যের সূত্রে সাধারণ ভাবে মহাস্থানগড়ের প্রাথমিক পর্যায় রূপে মৌর্যযুগকেই তথা মৌর্য আমলেই নগরীটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনুমান করা যেতে পারে।

মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপি, সৌজন্যে- সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড- ৮, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩ পৃষ্ঠা-৬৭

যদিও কোন কোন গবেষক উপরিউক্ত তথ্য সম্পর্কে দ্বিধা প্রকাশ করে মৌর্য যুগের পূর্বেও এই অঞ্চলের অধিবসতির উপস্থিতির কথা অনুমান করেছেন। যেমন আফরোজ আকমামের মতে, প্রাচীন সাহিত্যে 'পুণ্ড্র' গণ অনার্য জাতি রূপে বর্ণিত এবং ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ীও এই অঞ্চল বেশ প্রাচীন তাই মৌর্য পূর্ব মানুষের বাস এই অঞ্চলে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, এছাড়া সাম্প্রতিক প্রাপ্ত ১ টি কালো ও লাল মৃৎপাত্রের টুকরো এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করে বলে তিনি উল্লেখ করেন ।[৭০] আবার খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডি কে চক্রবর্ত্তী-র একটি বক্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি প্রথম মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়কালীন একজন জৈন ধর্মগুরু ভদ্রবাহুর কথা উল্লেখ করে বলেন ভদ্রবাহু জৈনদের এক সম্প্রদায়কে 'পুণ্ড্রবর্ধনের জৈন' বলে পৃথকীকরণ করেছিলেন। অর্থাৎ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়কালে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৪) পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলের জনবসতি যথেষ্ট প্রাচীন বা সমৃদ্ধ ছিল অনুমান করাই যায় যার দরুন উক্ত অঞ্চলের স্থানীয় জৈন অধিবাসীদের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক স্বত্তা বা পৃথক পরিচিতি প্রদান করা হয়েছিল ।[৭১]

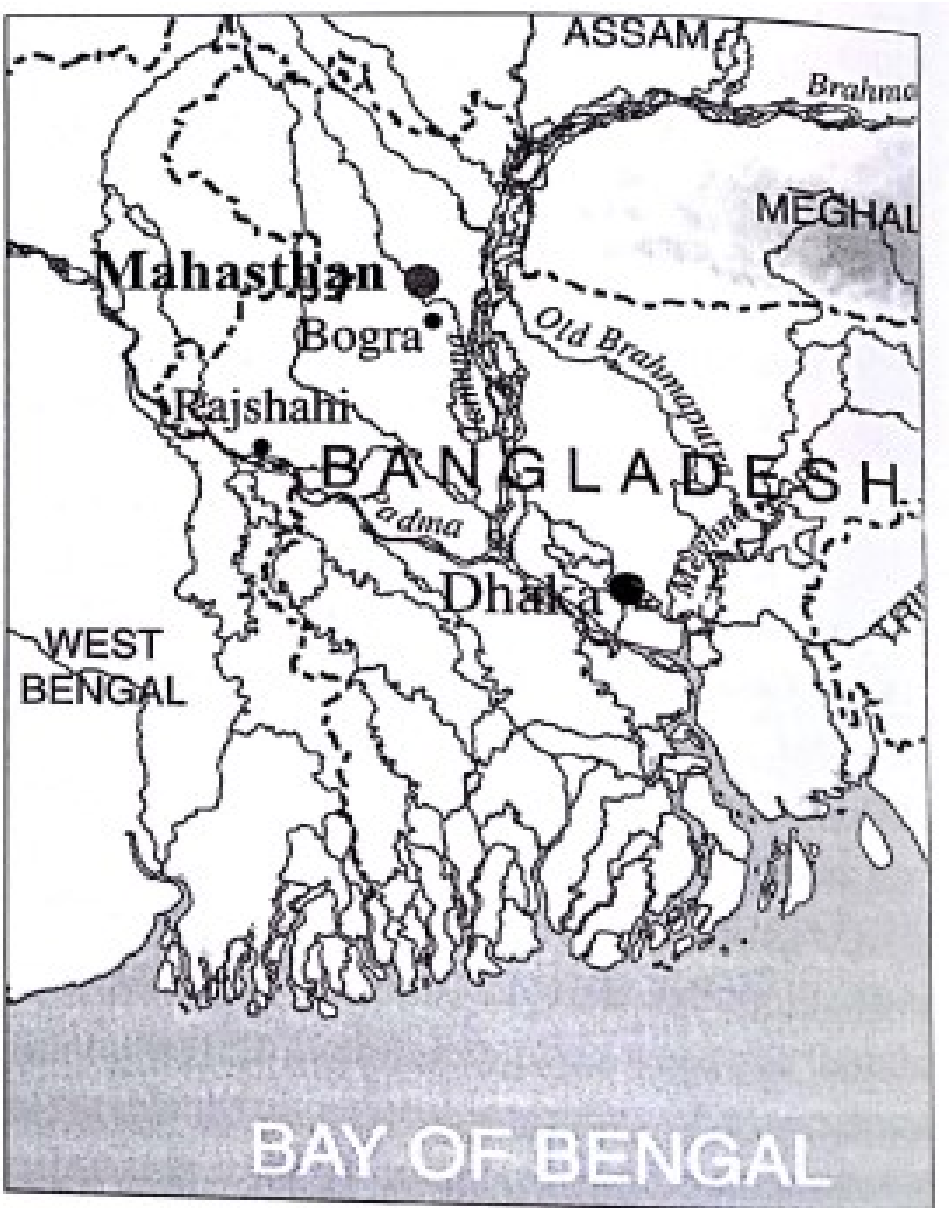

মহাস্থানের অবস্থানগত সাধারণ মানচিত্র

সৌজন্যে- Jean-francois Salles, 'মহাস্থান' , আব্দুল মোমিন চৌধুরী এবং রণবীর চক্রবর্তী সম্পাদিত " হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ" আর্লি বেঙ্গল ইন রিজিওনাল পার্সপেক্টিভস(আপ টু সি. ১২০০ সি ই), খণ্ড- ১, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১৯ পৃষ্ঠা-২২৪

ভৌগোলিক অবস্থান ও উৎখনন জনিত তথ্যাবলীঃ

আলোচ্য প্রত্নস্থলটি বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার প্রায় ১৩ কিমি উত্তরে ঢাকা – দিনাজপুর মহাসড়কের পাশে ২৪ ডিগ্রী ৫৭ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯ ডিগ্রী ৯১ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে করতোয়া নদী সন্নিকটে অবস্থিত । আয়তকার এই ধ্বংসস্তূপটি উঃ-দঃ প্রায় ১৫২৫ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৩৭০ মিটার বিস্তৃত, ও সমতলভূমি থেকে প্রায় ৪.৫ মিটার উঁচুতে অবস্থিত।[৭২] নগরের ২টি অংশ, একটি পরিখা ও প্রাকার বেষ্টিত যা মূল নগর এবং অপরটি প্রাকারের বাইরে যা ছিল নগরোপকণ্ঠ । নগরের চারপাশে সুউচ্চ প্রাকার, চারকোনে চারটি প্রাকার মঞ্চ এবং প্রাকারের বাইরে পূর্ব দিকে করতোয়া প্রবাহিত হত যা তৎকালীন বিশেষ গুরুত্বপুর্ন নদীপ্রবাহ ছিল এবং উত্তর, দক্ষিন ও পশ্চিমে পরিখা বেষ্টিত ছিল । সম্ভবত নগরের সুরক্ষা হেতু এইরূপ ব্যবস্থা বজায় ছিল ।[৭৩] এই করতোয়া নদী ভুটান সীমান্তের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার মধ্য দিয়ে ক্রমে ইছামতী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে , এর উত্তরতম প্রবাহের নাম তিস্তা । করতোয়া ছিল একসময় তিস্তার একটি শাখা , এর মাধ্যমেই তিস্তা গঙ্গার সাথে সংযুক্ত ছিল কিন্তু ১৯৮৭ সালের এক বন্যায় তিস্তা-করতোয়া সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফলে করতোয়া তার মূল স্রোতধারা হারিয়ে খর্বকায় হতে থাকে এবং ক্রমে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে ।[৭৪] বর্তমানে মহাস্থানের এই অঞ্চল সাধারণভাবে জনপ্রিয় প্রাচীরের অভ্যন্তরের দক্ষিন পূর্ব কোণে শাহ সুলতান মাহি সওয়ার বালখির মাযারকে কেন্দ্র করে অবস্থিত যা অন্যতম পবিত্র স্থান রূপে পরিগণিত সাধারণ মানুষের কাছে । এই মাযারের দক্ষিণাংশে ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের একটি মসজিদ বিদ্যমান যা সাম্প্রতিককালে নানাভাবে সংস্কার এবং সম্প্রসারিত হয়েছে। এখানে ১টি উল্লেখযোগ্য দিক হল এই অঞ্চলের ইতিহাসের সাথেও কিন্তু কিছু মৌখিক লোককথা বা কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে এবং বিশেষ আকর্ষনীয় যার সাথে ‘চন্দ্রকেতুগড়ের’ সম্পৃক্ত কিংবদন্তির মূল কাঠামো কিন্তু বহুলাংশে প্রায় একই রকম। এখানেও মুসলিম সন্ত সুলতান বালখির সাথে হিন্দু রাজা পরশুরামের দ্বন্দ , তাতে রাজার পরাজয়, মৃত্যু ও রাজত্বের অবসান এবং রাজকন্যা শিলা দেবীর প্রতিশোধ পরায়নতা ও শেষে করতোয়া নদীতে প্রান বিসর্জনের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ।[৭৫] অর্থাৎ ২টি প্রত্নস্থলের ক্ষেত্রেই প্রচলিত ২টি মিথ্ , একই প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগীয় ইসলামিক শাসনের সূচনার ইঙ্গিতবাহী অথচ প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে তার বহু প্রাচীন ইতিহাস সুস্পষ্ট রূপে বিরাজমান, এবং গল্পের ক্ষেত্রে প্রায় একই গঠন নেহাতই বেশ কৌতূহল উদ্দীপক সন্দেহ নেই।

নগরীটি প্রথম থেকেই সুরক্ষিত ছিল; নগর প্রাচীর ছাড়াও পূর্বে করতোয়া নদী, দক্ষিণে বারানসী খাল, পশ্চিমে গিলাতলা খাল ও উত্তরে কালীদহ সাগর চতুর্দিক থেকে একে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল যা প্রাচীন সমৃদ্ধ নগরের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল বলা যায় ।[৭৬] মূল নগর প্রাকার থেকে বাইরে বিভিন্ন দিকে যাওয়ার জন্য বেশ কিছু প্রশস্ত নগরদ্বারের নিদর্শন পাওয়া যায়, যার মধ্যে প্রধান ছিল পশ্চিম দিকের তাম্র – দরওয়াজা ।[৭৭] এই মহাস্থানগড়ের অন্যতম বিশেষত্ব হল শতাধিক ঢিবি বা স্তূপের উপস্থিতি। মূল দূর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে বেশ কিছু স্তূপ তো রয়েছেই এছাড়াও উত্তর,দক্ষিন ও পশ্চিমে প্রায় ৮ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে নগরের বাইরে বিভিন্ন স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু ঢিবি দেখা যায়।[৭৮] এগুলি প্রাচীন প্রাদেশিক রাজধানীর শহরতলীর সাক্ষ্য বহন করে । মূল নগরের অভ্যন্তরে ছিল রাজকীয় প্রাসাদ, বণিক- সৈন্যসামন্ত দের আবাসস্থল , মন্দির, সভাগৃহ ইত্যাদি এবং অপরদিকে নগরের সাধারণ মানুষ কৃষক, শ্রমিক, সমাজসেবক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষের বাস ছিল নগরোপকণ্ঠে। সেখানেও মন্দিরহাট বাজার , প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।[৭৯] এইরূপে সমগ্র নগর বিন্যাস কাঠামো দুইভাগে বিভাজিত ছিল।

মহাস্থানগড় অঞ্চলে সর্বপ্রথম নিয়মমাফিক উৎখনন কার্য পরিচালিত হয় ১৯২৮-২৯ সালে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে, যার নেতৃত্বে ছিলেন কে.এন.দীক্ষিত । এই উৎখনন প্রক্রিয়া কিছু ঢিবির উৎখননের মধ্যেই সীমিত ছিল যথা গোবিন্দ ভিটা এবং মুনির ঘুন, বৈরাগীর ভিটা। এরপর কিছুকাল উৎখনন বন্ধ থাকার পর ১৯৬০-৬১ সালে তৎকালীন পাকিস্থানের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এই অঞ্চলে উৎখনন কার্য পরিচালনা করলে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসম্পদ আবিষ্কৃত হয়। এই খননকার্য উত্তরদিকের প্রতিরক্ষা প্রাচীর, পরশুরামের প্রাসাদ, মাযার এলাকা, খোদার পাথর ভিটা, মানকালীর ধাপ এবং অন্যান্য স্থানে পরিচালিত হয়। মূলত প্রত্নস্থলটির সাংস্কৃতিক পর্যায়ক্রম নির্ধারনের উদ্দেশ্যে খনন কার্য সম্পন্ন করা হয়েছিল। এসব উৎখননের প্রাথমিক প্রতিবেদন ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়, ১৯৮৮ সালে পুনরায় খননকার্য শুরু হয়। এসময় মাযারের নিকটবর্তী এলাকা এবং উত্তর ও পূর্ব দিকের রক্ষা প্রাচীর সংলগ্ন অংশে খনন সীমাবদ্ধ থাকে, এই পর্যন্ত যা উৎখনন তা এলাকাটির বিশালত্বের তুলনায় নগন্য ছিল।[৮০] ১৯৬০-৬১ র উৎখননে কোন নির্দিষ্ট বর্ননা বিহীন ৩টি নির্মান পর্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু অত্যন্ত ঘন বসতির দরুন নির্মাণ কাঠামো সম্পর্কে কোনও সম্পূর্ণ সুসংগত ধারণা পাওয়া যায়না। অধিবসতির প্রাথমিক স্তরটি ছিল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের। তবে সাধারণত মনে হয় ৪র্থ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে উল্লেখযোগ্য কোন স্থাপত্য কাঠামো ছিলনা এবং বসতির নিদর্শন ও ছিল সামান্য । বিভিন্ন পর্যায়ের নির্মান কাঠামো ছাড়া এই পর্যায়ের

উৎখননে পাঞ্চ মার্ক মুদ্রা, উত্তর ভারতীয় মসৃণ কালো মৃৎপাত্র, নানা ধর্মীয় ও শৈল্পিক নিদর্শন মেলে এই অঞ্চল থেকে। এই খনন সম্পর্কিত নানা তথ্য এন. আহমেদ তার রচনায় তুলে ধরেন,[৮১] মহাস্থানগড়ের স্তরায়ন সম্পর্কিত আলোচনার পথিকৃৎ ইনি। তবে তা স্বত্তেও তার আলোচনা বহুলাংশে সীমিত ছিল বলে পরবর্তীকালে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। ফলে এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস পুনর্গঠন, নগর বিন্যাশ, সাংস্কৃতিক অনুক্রম যথাযথ জানার জন্য ব্যপক অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘকাল অনুভূত হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিদগণের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৩ সাল থেকে বিজ্ঞানসম্মত উৎখনন প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ গৃহীত হয় , তখন থেকে পূর্ব দিকের প্রতিরক্ষা প্রাচীরের মধ্যভাগ সন্নিহিত স্থানে প্রতি বছর উৎখনন কার্য পরিচালিত হতে থাকে। ইতিপূর্বে সুরক্ষিত নগরের বাইরে ভাসু বিহার, বিহার ধাপ, মঙ্গলকোট প্রভৃতি কিছু স্থানে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননকার্য পরিচালিত হয়েছে ।[৮২]

মহাস্থানগড় সম্পর্কে আলচনায় ফরাসী উৎখনন কর্তারা মন্তব্য করেন এই অঞ্চল সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা প্রচলিত যে এটি মৌর্য আমলে প্রথম থেকেই তাদের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল এবং ক্রমে তা প্রশাসনিক ও বাণিজ্য কেন্দ্র রুপেও সমৃদ্ধি লাভ করে যা পুরোটাই বলা হয়ে থাকে পুরাদ্রব্যের প্রেক্ষিতে , কিন্তু এইরপ ধারনায় কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন বলে তারা মত প্রকাশ করেন কেননা ইতস্তত প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত পুরাদ্রব্যের প্রেক্ষিতে সময়কাল নির্ধারন ভুল ব্যখ্যার জন্ম দেয়। ফলত যেকোনো প্রত্নস্থলের ক্রমান্বয়িক পর্যায়ক্রম নির্ধারনের অন্যতম প্রধান শর্ত হল যথাযথ স্তরায়ন। তাদের উৎখনন সংক্রান্ত নথী সংক্ষেপে আলোচনা করব –

(১) এই উৎখননে ১৮টি স্তর উন্মোচিত হয় , যার মধ্যে প্রথম থেকে চতুর্থ স্তরকে প্রাথমিক জনবসতির পর্ব (Early settlement) রূপে অভিহিত করা হয় । মহাস্থানগড় গড়ে ওঠার সঠিক নির্দিষ্ট সময় জানা যায়না তবে কিছু রেডিও কার্বন পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে এর সময়পর্ব খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকের প্রথমার্ধ বলে অনুমান করা হয় । যদিও তার নমুনা পাওয়া যায় পঞ্চম স্তর থেকে । এই প্রাথমিক (১ম-৪র্থ স্তর) পর্যায়ে মৃত্তিকা নির্মিত উন্নত মানের মেঝে, দেওয়াল নির্মানে কাঠের ব্যবহার প্রভৃতি নানা কিছুর ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরে স্তরীয় ক্রমপর্যায়মানতা। তবে তা স্বত্তেও নগর প্রাকার, বড় স্থাপত্য কাঠামো, কর্মশালা প্রভৃতির অনুপস্থিতির দরুন এটি মহাস্থানের মূল ঐতিহ্য থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন বলে ফরাসী অধিকর্তারা মনে করেন । কিছু মৌর্য পুরাদ্রব্য পাওয়া

গেছে যদিও তা মূলত মৃৎপাত্রের মধ্যেই সীমিত কোনরকম মুদ্রার উপস্থিতিও এই পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়না বরং পঞ্চম স্তরে মৌর্য আমলের অন্যান্য কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় ।[৮৩]

(২) এর পরবর্তী পর্যায় (পঞ্চম-একাদশ স্তর) পূর্ববর্তী ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, একে মূলত ২টি উপপর্যায়ে ভাগ করা হয়- (ক) প্রথমটি (পঞ্চম-অষ্টম) রেডিও কার্বন পদ্ধতি দ্বারা কিছুটা স্পষ্ট ভবে চিহ্নিত। পঞ্চম স্তর এর সময়কাল তৃতীয় খ্রীঃ পূঃ, এবং প্রথম খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান অষ্টম স্তর। (খ) দ্বিতীয় উপপর্যায় (নবম-একাদশ স্তর) খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকের শেষভাগ থেকে দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই প্রথম উপপর্যায়টিকে 'রাজধানী শহর' (The Capital City) নামকরন করা হয়েছে। পঞ্চম স্তর থেকে ব্যপক পুরাদ্রব্যের আবিষ্কার অর্থনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্তনের সূচনা করেছিল যা থেকে মৌর্য শাসনের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে অনুমান করেন উৎখননকারীরা। প্রচুর উত্তর ভারতীয় মসৃণ কালো মৃৎপাত্র, প্রস্তর বলয়, বহুমূল্য পুঁতি, পোড়ামাটির উপকরণ, পাঞ্চ মার্ক মুদ্রা, তামার কাজল কাঠি প্রভৃতি নানান প্রত্নদ্রব্যের নিদর্শন মেলে এই পর্বে যা এক উন্নত নগরসভ্যতার পরিচয়বাহী। অর্থাৎ একপ্রকার আকস্মিক পরিবর্তন সূচিত হয় এই সময়ে, স্থানীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি গাঙ্গেয় সংস্কৃতির আভাষ পরিলক্ষিত হতে থাকে। তবে এক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে, এই ৪র্থ থেকে ৫ম স্তরের যে আকস্মিক যুগান্তর সেই পর্যায়টি বেশ দ্বিধান্বিত। এই পর্যায়ের অধিবাসীরা কারা, কোথা থেকে এসেছে? তারা গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিবাসী নাকি অন্য কোন অঞ্চলের তা একটি সংশয়। আবার মহাস্থানের সপ্তম স্তরে প্রাপ্ত ব্রোঞ্চ নির্মিত দর্পনও গাঙ্গেয় উপত্যকার সাথে এই অঞ্চলের সংযোগকে চিহ্নিত করে তবে একাধারে মৃৎশিল্প বা পোড়ামাটি শিল্প ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাব বাংলার স্বতন্ত্র ঐতিহ্যেরও প্রকাশ ঘটায়। এছাড়া সমৃদ্ধ শুঙ্গ রীতির পোড়ামাটির উপকরণের সন্ধান মেলে পূর্ববর্তী মৌর্য পর্যায়ের স্তরে, যা শিল্প ইতিহাসের সময়সীমা নির্ধারনের বিষয়টিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।[৮৪]

দ্বিতীয় উপপর্যায় অর্থাৎ নবম থেকে একাদশ স্তর কে কিছুটা বিরতির পর্ব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও দশম- একাদশ স্তরে নতুন স্থাপত্য কাঠামো পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু সাংস্কৃতিক নিদর্শন সমূহ সমকালীন অন্যান্য গাঙ্গেয় উপত্যকা বা অন্য অঞ্চলের তুলনায় কিছুটা নিম্ন মানের ও অনির্ধারিত । তবে এই বিরতি কথাটি মহাস্থানগড়ের ক্ষেত্রে তার অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সহিত

সম্পর্কের মানের ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়েছে কেননা এটি কিছুটা বিচ্ছিন্ন রূপে বিদ্যমান ছিল এই পর্বে। পুরাদ্রব্য রূপে কুষান মৃৎপাত্র, টেরাকোটা, অর্ধমূল্য পুঁতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৮৫]

পরবর্তী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্তর স্পষ্টভাবে ২০০-৬০০ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ বাংলা তথা ভারত ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় গুপ্ত যুগের নিদর্শন রূপে নির্ধারিত। তবে উৎখননে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্যান্য অঞ্চলের সহিত বিচারে মহাস্থানকে "Shadow City" রূপে উল্লেখ করেছেন উৎখনন কর্তারা। যদিও এই পর্বে দুর্গপ্রাকারের সাথে সংযোগ স্পষ্ট, এছাড়া অসংখ্য পুরাদ্রব্য যথা বিভিন্ন ধরণ ও রীতির সমৃদ্ধ টেরাকোটার ফলক, সিল, বিভিন্ন উপকরণের পুঁতি, তামার উপকরণ প্রভৃতি বিপুল পরিমাণে মেলে। এছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য ত্রিরত্ন, চাকা, মৎস প্রভৃতি মোটিফের ছাপ দিয়ে নকশা করা মৃৎপাত্র এবং এজাতীয় দ্রব্যাদির নিদর্শন মেলে কিছুটা সীমিত এলাকায় যার সন্নিকটে ইট নির্মিত একটি স্থাপত্য কাঠামোর নিদর্শন পাওয়া যায় যা সম্ভবত আধ্যাত্মিক কর্মক্ষেত্রের ইঙ্গিত দেয়। এই বিপুল নিদর্শন ও অন্যান্য কিছু তথ্যের প্রেক্ষিতে তৎকালীন মহাস্থানে বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়। এছাড়া গোবিন্দ ভিটা নামক মন্দির এবং ইট নির্মিত বিভিন্ন কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৮৬]

শেষ চতুর্দশ- অষ্টাদশ নং স্তর উৎখননকারীদের দ্বারা সঠিকভাবে নির্ধারিত নয়। তবে নাজিমুদ্দিন আহমেদ এই পর্বের আবিষ্কৃত একাধিক ঢিবির উল্লেখ করেন যেগুলি মূল মহাস্থানকে কেন্দ্র করে বিদ্যমান ছিল। এই পর্বে একাধিক নির্মান কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ মেলে। এছাড়া বিভিন্ন ঢিবি থেকে অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের নিদর্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৮৭]

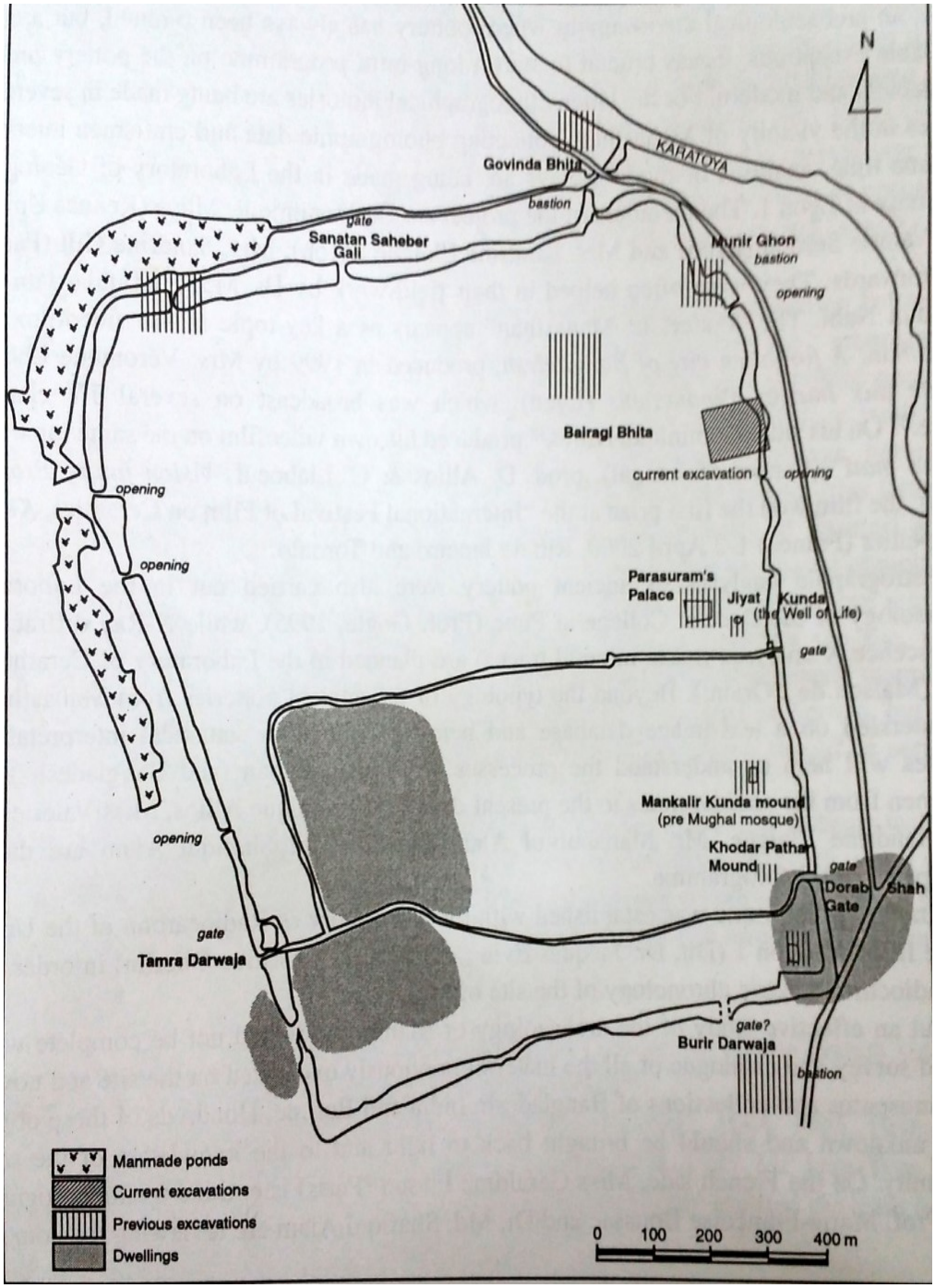

উৎখনন ক্ষেত্র সহ মহাস্থানগড়ের সাধারণ মানচিত্র

সৌজন্যে- মহম্মদ শফিকুল আলম ও Jean-Francois Salles সম্পাদিত "ফ্রান্স বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়", ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট ১৯৯৩-১৯৯৯, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি,বাংলাদেশ, ২০০১ , পৃষ্ঠা- ১৫

মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত বিভিন্ন ঢিবি সমূহঃ

মহাস্থান প্রত্নস্থলের বিশেষত্বই হল একে কেন্দ্র করে অসংখ্য ঢিবির উপস্থিতি । ঢিবি গুলির মধ্যে খোদার পাথর ভিটা, মাকালীর কুন্ড,পরশুরামের প্রাসাদ ,জীয়ত কুণ্ড ,গোবিন্দ ভিটা, বৈরাগীর ভিটা, মঙ্গলকোট, নরপতির ধাপ, গোকুল মেধ, স্কন্দের ধাপ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এছাড়াও শিলাদেবীর ঘাট, বলাই ধাপ, যোগীর ধাপ[৮৮] ইত্যাদি আরও অসংখ্য ঢিবি মহাস্থানগড়ের চারিপাশে বিস্তৃত রয়েছে এবং তার এই বিশেষত্ব এই অঞ্চলকে প্রাচীন বাংলার অন্য যেকোনো প্রত্নস্থলের থেকে এক বিশিষ্ট স্থান প্রদান করে সন্দেহ নেই । এইরূপ নগর বিন্যাস কেবল মহাস্থানের বৃহৎ আয়তন নয়, পাশাপাশি এর সমৃদ্ধি ও প্রশাসনিক – রাজনৈতিক গুরুত্ব কেও তুলে ধরে মনে করা যায় । কয়েকটি ঢিবির খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে উল্লিখিত হল –

ইতিপূর্বেও উল্লিখিত মহাস্থানগড় অঞ্চলে সর্বপ্রথম নিয়মমাফিক উৎখনন কার্য পরিচালিত হয় ১৯২৮-২৯ সালে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে, যার নেতৃত্বে ছিলেন কে.এন.দীক্ষিত । এই উৎখনন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয় কিছু ঢিবির উৎখননের মধ্য দিয়ে যথা- বৈরাগীর ভিটা , গোবিন্দ ভিটা এবং মুনির ঘুন নামে পরিচিত একটি বুরুজসহ পূর্ব প্রাচীরের কিছু অংশ। এই **বৈরাগীর ভিটা** নগর প্রাকারের উত্তর সীমান্তের কাছে অবস্থিত । উৎখননের ফলে গুপ্ত যুগীয় কিছু ইট নির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় । আবার পাল পর্বীয় মন্দির কাঠামোর নিদর্শন ও রয়েছে যার সাথে অত্যন্ত অলংকার সম্পন্ন কালো ব্যাসল্ট শিলার ২টি স্তম্ভের সংযোগ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে সাধারণত ৪টি পর্যায়ের নির্মান রয়েছে বলে মনে করা হয় যা গুপ্ত থেকে গুপ্ত পরবর্তী পাল ও মুসলিম যুগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল । **গোবিন্দ ভিটা** মহাস্থান নগর প্রাচীরের বাইরে করতোয়া নদী সংলগ্ন রূপে অবস্থিত, ‘করতোয়া মাহাত্ম্য’ গ্রন্থে নগরীর উত্তর সীমা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার উৎখনন কার্য হয়েছে এই অঞ্চলে। সামগ্রিক উৎখননের ফলে ১টি দ্বিতল বিশিষ্ট মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে এবং স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে গুপ্ত থেকে সুলতানী যুগ পর্যন্ত ৪টি পর্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায় এই অঞ্চলে। তবে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে ডঃ এস এস মুস্তাফিজ কর্তৃক কিছু রুলেটেড পাত্র এবং এন বি পি সংস্কৃতির কিছু মৃৎপাত্র আবিষ্কার এই এলাকার ইতিহাসকে মৌর্য সংস্কৃতির সাথে সংযোগ ঘটায় । এছাড়া মাটির সীলে তিনটি গমের শিষ দিয়ে ঘেরা ২২টি ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি, নারী মস্তক, মিথুন দম্পতি প্রভৃতি পুরাদ্রব্যের নিদর্শন মেলে। **মুনীর ঘুন** নামক ঢিবিটি উৎখননে নানান প্রাচীন কাঠামোর ধ্বংসাবশেষের

সন্ধান মেলে যদিও তা অত্যন্ত বিধ্বস্ত হওয়ায় তা যথার্থ অনুধাবন সম্ভব হয়নি । এই তিনটি ক্ষেত্র অনুসন্ধানে ২৫০ ফুট একটি লম্বা ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছিল, সামগ্রিক ভাবে তার মধ্যে নানা পুরাদ্রব্য যথা মৃৎপাত্র,পোড়ামাটির অবয়ব, পুঁতি প্রভৃতির সন্ধান মেলে যা সাধারণত পাল পর্বীয় নিদর্শন রূপে গন্য করা হয়। [৮৯]

প্রাথমিক পর্বে এই ৩টি ঢিবি দিয়ে উৎখনন শুরু হয় কিন্তু ইতিপূর্বেও উল্লিখিত এই অঞ্চল প্রায় শতাধিক ঢিবির সমন্বয়ে গঠিত। যার অন্যতম উল্লেখ্য **বিহার** ও **ভাসু বিহারের** নাম । এই দুটি গ্রামই মহাস্থানগড় মূল নগর থেকে উত্তর পশ্চিমে কিছু দূরত্বের মধ্যেই অবস্থিত । ৫টি ঢিবির সমন্বয়ে গঠিত ভাসুবিহার স্থানীয়ভাবে 'নরপতির ধাপ' নামে পরিচিত। কানিংহাম এই ধ্বংসাবশেষটিকে অশোক নির্মিত স্তূপ এবং বিখ্যাত পো-সি-পো বিহার রূপে শনাক্ত করেছেন, যা ৭ম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং পরিদর্শন করেছিলেন । অশোকের স্তূপ ও একটি অবলোকিতেশ্বর এর মন্দির কে ভাসুবিহার এলাকায় এবং হিউয়েন সাং এর বৌদ্ধবিহার টিকে বিহার গ্রামে চিহ্নিত করেন কানিংহাম । ১৯৭৩ থেকে ক্রমাগত উৎখননে গুপ্ত পরবর্তী পর্যায়ের ২টি বিহার ও দশম একাদশ শতকীয় একটি মন্দিরের ভিত্তিভূমি উন্মোচিত হয়। এছাড়াও বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যথা প্রায় ৬০ টি বুদ্ধমূর্তি , ৩৪টি টেরাকোটা ফলক, পোড়ামাটির সীল, কিছু পাথরের ভাস্কর্য প্রভৃতি নানাবিধ নিদর্শন মেলে। [৯০]

এভাবে দেখা যায় মহাস্থানগড়ের সঙ্গে সংযুক্ত এই ঢিবিগুলি ইতিহাসের একেকটি অধ্যায়ের সাক্ষী, মহাস্থানের সামগ্রীক ইতিহাসকে অনুধাবন করতে হলে এগুলির আলোচনা ব্যাতিত তা কখনোই সম্ভব নয়। সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ধর্মবিশ্বাস, শিল্পচেতনা, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানান দিক সম্পর্কে ধারনা দেয় এই অসংখ্য ঢিবিগুলি । এখনো পর্যন্ত বহু ঢিবি উৎখনন হয়েছে ,আর বহু এখনো অপেক্ষারত কিন্তু তা সত্ত্বেও কমবেশি প্রায় সমস্ত অংশেই অজস্র পুরাদ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিপুল পরিমাণ পোড়ামাটির উপকরণ যা শিল্প ইতিহাসের জগতে মহাস্থানকে নিঃসন্দেহেই বিশেষ স্থান প্রদান করে। তবে এই স্বল্প পরিসরে সকল তথ্যাবলী আলোচনা করা সম্ভব নয় তাই সংক্ষেপেই ঢিবিগুলি সম্পর্কে এবং উৎখনন সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য গুলি আলোচনার প্রয়াস করা হল ।

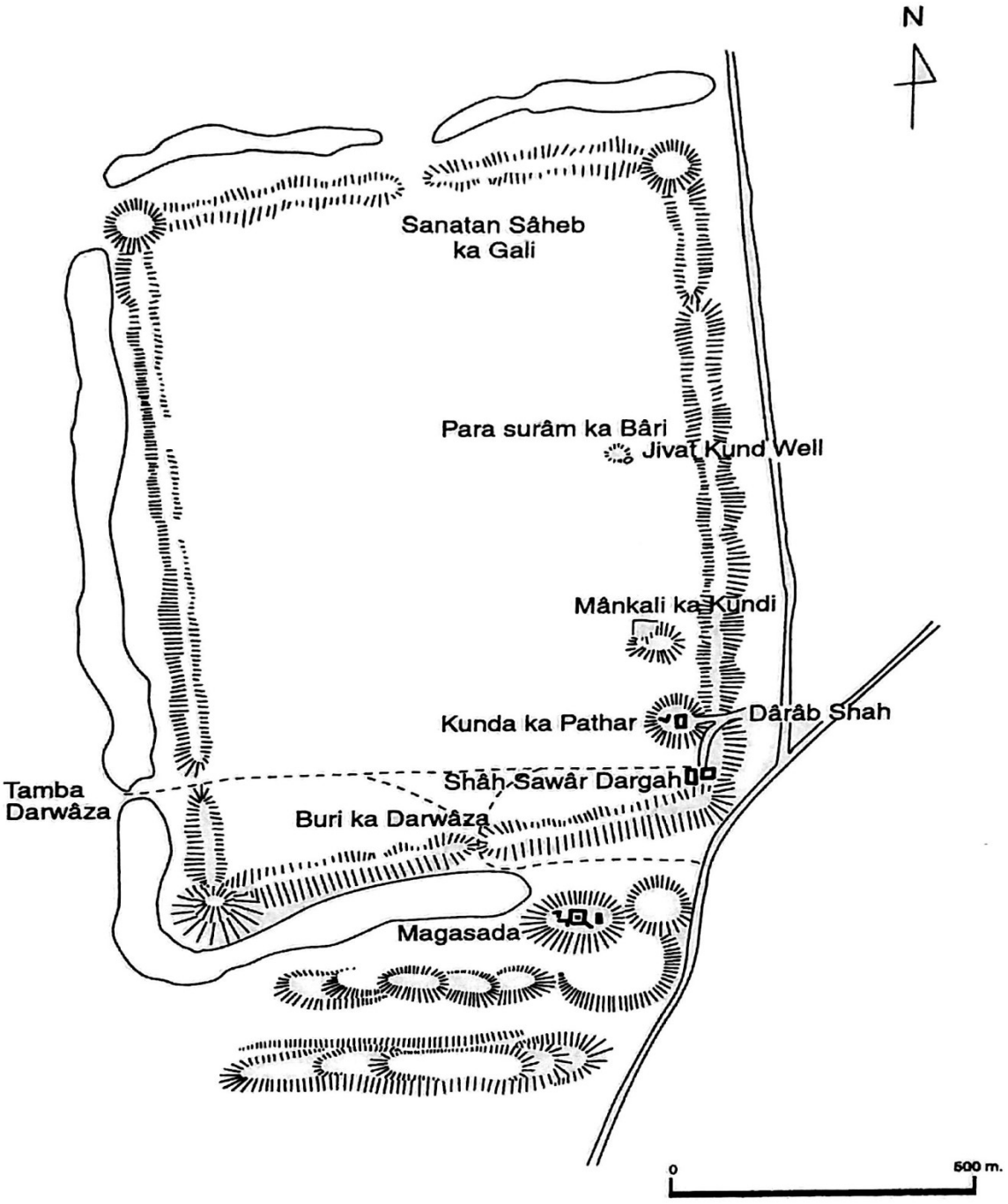

স্যার কানিংহাম অঙ্কিত মহাস্থানগড় প্রত্নকেন্দ্রের স্কেচ প্ল্যান

সৌজন্যে- আলম, মহম্মদ শফিকুল ও Jean-Francois SALLES সম্পাদিত "ফ্রান্স বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়", ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট ১৯৯৩-১৯৯৯, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি,বাংলাদেশ, ২০০১ পৃষ্ঠা- ৩

যেকোনো প্রত্নস্থলের ক্ষেত্রেই তার আবিষ্কৃত পুরাদ্রব্যসমূহ যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করা থাকে তা বলা বাহুল্য এবং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে খুব স্পষ্ট যে চন্দ্রকেতুগড় বা মহাস্থান উভয়ই কিন্তু নিজ নিজ প্রত্নসম্পদের প্রাচুর্যে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসকে এক বিশেষ স্থানে উন্নীত করেছে। ইতিপূর্বে চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কিত আলোচনায় উক্ত কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত পুরাদ্রব্য সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ধারণা ছকের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে, মহাস্থানগড়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু তার প্রত্নদ্রব্যের চরিত্র প্রায় সমজাতীয়। এক্ষেত্রেও পৃথক রূপে মহাস্থান ও তার নিকটবর্তী নানান স্তূপ বা ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত পুরাদ্রব্য সমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পোষণ করা যেতে পারে।

মৃৎপাত্র	উন্নত মানের ভিন্ন রং ও ধাঁচের (থালা, বাটি, বয়াম) উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, ধূসর মৃৎপাত্র, কালো ও লাল বর্ণীয় মৃৎপাত্র, কালো এবং লাল বর্ণীয় পিচ্ছিল পদার্থ যুক্ত পাত্র প্রভৃতি লক্ষণীয়। হস্ত নির্মিত নানা পাত্রের পাশাপাশি চাকা নির্মিত বাতিস্তম্ভ, কলস, সেচ উপকরণ প্রভৃতিও লক্ষণীয়।[৯১]
মুদ্রা	গোলাকার, চৌকো ও লম্বাকৃতি ধাঁচের অসংখ্য পাঞ্চ মার্কড মুদ্রা, এবং রৌপ্য ও তাম্র নির্মিত একাধিক মুদ্রার সন্ধান মেলে। ফ্রান্স- বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগের উৎখনন পর্বে ৯৩টি মুদ্রা সম্বলিত একটি পাঞ্চ মার্কড মুদ্রার মজুত ভান্ডারের সন্ধান মেলে যার অধিকাংশ উভয় পার্শ্বে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী (সূর্যরশ্মি, মৎস, বিভিন্ন চক্র, চৈত্য, পশুপাখি ও অন্যান্য) সম্বলিত।[৯২]
টেরাকোটা সামগ্রী	ভিন্ন আকৃতির শুঙ্গ, কুষান, গুপ্ত এমনকি পাল পর্বীয় সমৃদ্ধ টেরাকোটা উপাদানের বিপুল সম্ভার মেলে এই অঞ্চল থেকে। যার মধ্যে অতি পরিচিত যক্ষী, মিথুন রীতি, পশুপাখি, কাহিনী মূলক উপস্থাপনা প্রভৃতি সমৃদ্ধ ফলকের পাশাপাশি আরও একাধিক পোড়ামাটির নানাবিধ উপকরণের সন্ধান মেলে মহাস্থানের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে।[৯৩]
শিলালিপি	মহাস্থান তথা প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান তথা মৌর্য কালীন ব্রাহ্মী লিপির সন্ধান মেলে এই অঞ্চলে।[৯৪] এছাড়াও একাধিক পোড়ামাটি শিলমোহরের সন্ধান মেলে আলোচ্য কেন্দ্রের পরিসর থেকে।
পুঁতি	বিভিন্ন মাপ ও আকৃতির অ্যাজেট, কার্নেলিয়ান, জ্যাসপার প্রভৃতি মূল্যবান ও অর্ধমূল্যবান রত্ননির্মিত পুঁতির পাশাপাশি হালকা থেকে গাঢ় সবুজ, নীল,

	সাদাকালো, সাদা-নীল, বাদামী প্রভৃতি নানা বর্নের কাঁচের,পোড়ামাটি প্রভৃতি পুঁতি উল্লেখ্য।[৯৫]
অন্যান্য প্রত্ন উপাদান	উপরিউক্ত উপাদান ছাড়াও অবশ্য উল্লেখ্য মহাস্থানে প্রাপ্ত ব্রোঞ্চ দর্পন, যা এই অঞ্চলের সহিত বহির্দেশীয় সংস্কৃতির যোগাযোগকে ইঙ্গিতপূর্ণ করে। এছাড়াও তামার কাজল কাঠি ও অন্যান্য তাম্র উপাদান, ব্রোঞ্চ দণ্ড, বলয় , আদি ঐতিহাসিক ও আদি মধ্য যুগীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্মান, স্থাপত্যাংশ, আদি মধ্য যুগীয় বেলেপাথরের নির্মিত একাধিক মূর্তি, মুখাবয়ব প্রভৃতি আরও একাধিক সম্পদের সমাহার অধুনা বাংলাদেশের এই মহাস্থানগড় প্রত্নকেন্দ্র।[৯৬]

উত্তর ভারতীয় মসৃণ কালো মৃৎপাত্র ও অলংকৃত উপাদান, মহাস্থানগড় সৌজন্যে- মহম্মদ শফিকুল আলম ও Jean-Francois SALLES সম্পাদিত "ফ্রান্স বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়", ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট ১৯৯৩-১৯৯৯, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি,বাংলাদেশ, ২০০১ পৃষ্ঠা- ৯০

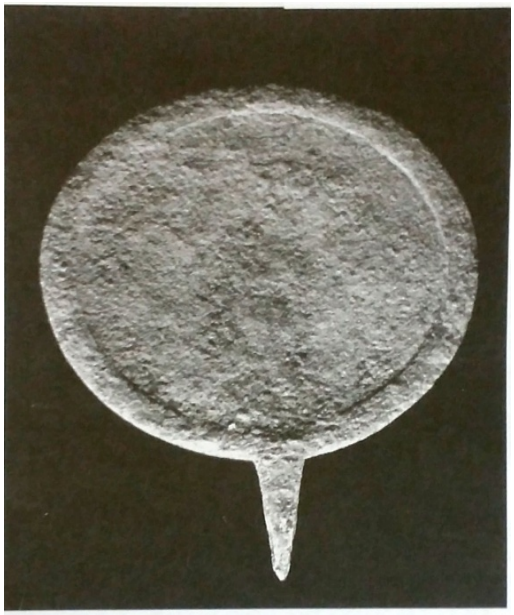

Figure 31. Bronze mirror (MAH 93.2391)

Figure 56. Female figure (MAH 93.344)

প্রাপ্ত ব্রোঞ্চ নির্মিত দর্পন এবং টেরাকোটা নারী অবয়ব, মহাস্থানগড় , সৌজন্যে- মহম্মদ শফিকুল আলম ও Jean-Francois SALLES সম্পাদিত "ফ্রান্স বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়", ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট ১৯৯৩-১৯৯৯, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি,বাংলাদেশ, ২০০১, পৃষ্ঠা যথাক্রমে- ১১৪ ও ১৪৮

শেষে বলা যায়, উপরে মূলত প্রাচীন বাংলার ২টি প্রত্নস্থল তথা সমৃদ্ধ নগর সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করা হল। যদিও বাংলা বা নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরায়ন বা রাষ্ট্র বিন্যাসের ধারা মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা অপেক্ষা ভিন্ন, যেখানে উক্ত অঞ্চলে নগরায়নের সূত্রপাত খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বাংলা সেক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে, বাংলায় নগরায়নের সূত্রপাত হয় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যাদি এরূপ ধারনাই প্রদান করে। সাধারণত আদি ঐতিহাসিক পর্ব সমগ্র ভারতের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়, এই পর্বে সারা ভারত জুড়ে জনবসতির ব্যপক সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে কৃষি, বাণিজ্য, নগরায়নের বিস্তার তথা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হতে থাকে। এই সময়পর্বের ই অন্যতম সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল হল বাংলার 'চন্দ্রকেতুগড়' ও 'মহাস্থানগড়' যার বিবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য বিভিন্ন দিক থেকে এদের সমকালীন অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগর রূপেই উপস্থাপিত করে। প্রাচীন বাংলার রাঢ় অঞ্চলে পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে কৃষিকাজের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনকারী গ্রাম সমাজের ১টি অবিচ্ছিন্ন ধারার উপস্থিতি বজায় ছিল কিন্তু চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কে তা নেই কেননা নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকায় তথা গঙ্গা

ভাগীরথীর পাললিক ভূমিতে পাথর জাতীয় কিছুর বিশেষ সংস্থান নেই। তাই সেখানে পুরা প্রস্তর যুগের সাক্ষ্য আবিষ্কারের কথা হয়ত আসেনা। আবার রাঢ় অঞ্চল যেমন বর্ধমান, বীরভূমে তাম্র প্রস্তর পর্বেই লৌহ সাক্ষ্য মেলে যা চন্দ্রকেতুগড়ে বিশেষ নেই বলে গৌরীশংকর দে উল্লেখ করেন,[৯৮] যার থেকে অনুমান করা যায় রাঢ় অঞ্চল অপেক্ষা বঙ্গের উপত্যকীয় এলাকায় অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড়ের বসতি, সংস্কৃতির নিদর্শন অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের বা নবীন। মহাস্থানেও প্লিস্টোসিন ভূভাগের ওপর সরাসরি মৌর্য সংস্কৃতির নিদর্শন মেলে[৯৯] তাই উভয় ক্ষেত্রেই আদি ঐতিহাসিক পর্যায়, নগর বিকাশ, বাণিজ্য, রাষ্ট্র- রাজনীতি এইসকল বিষয়গুলি ছিল প্রধান। মূলত টেরেকোটা শিল্পের সমৃদ্ধির সূত্র ধরে প্রত্নস্থল ২টির নির্বাচন করা হয়েছিল কিন্তু উক্ত শিল্পের বিকাশ কোন প্রেক্ষাপট বা পটভূমিকায় তা বোঝার জন্য স্থান ২টির সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজনীয় ছিল। উক্ত অঞ্চলের অবস্থান, বাসস্থানের পরিকাঠামো, সমকালীন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সহিত তার সম্পর্ক, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে তাই সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। সহজ ভাবে বলা যায় এই দুটি প্রাচীন বাংলার ২টি সমৃদ্ধ নগর, বাণিজ্য কেন্দ্র ও শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা।

পাশাপাশি দেখা যায় প্রাচীন বাংলার ইতিহাস কিন্তু কেবলমাত্র তার এই ২ প্রত্নস্থলের গৌরবেই সীমিত নয়। বর্তমানে বিশেষ রূপে দক্ষিণ বঙ্গে আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের আরও একাধিক প্রত্নস্থল আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত যাদের গুরু ও অপরিসীম। অধ্যায়ের প্রথম ভাগেই এসকল প্রত্নস্থল গুলির উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে প্রথমেই বলা আবশ্যক তমলুকের(তাম্রলিপ্ত) কথা, খ্রিষ্টপূর্ব সময়ের শেষ ভাগ থেকে প্রায় গুপ্তযুগ পর্যন্ত বন্দর হিসেবে ‘তাম্রলিপ্ত’ অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ ছিল। আবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হরিনারায়নপুর এর নাম অবশ্য উল্লেখ্য, এখানে ২য় খ্রীঃ পূঃ থেকে ২য় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালর নানান প্রত্নসামগ্রী যথা- মুদ্রা, মৃৎপাত্র, বিবিধ পোড়ামাটির উপকরণ পাওয়া গিয়েছে। এখানকার প্রাপ্ত যক্ষী অবয়ব গুলি তমলুক বা চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত যক্ষী মূর্তি গুলির সাথে বহুলাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়াও একইভাবে আটঘরা, দেউলপোতা, ধোসা, তিলপি, নবগ্রাম, নলগোড়া, পাথরপ্রতিমা, গোবর্ধনপুর প্রভৃতি আরও অসংখ্য প্রাচীন প্রত্নস্থলের নিদর্শন পাওয়া যায় যা নিঃসন্দেহে বাংলার ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করে। কোথাও টেরাকোটা, কোথাও ধর্মীয় বড় মূর্তি স্থাপত্য, কোথাও মন্দির বা উক্ত কাঠামো এছাড়া মুদ্রা, মৃৎপাত্র তো বটেই প্রভৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ, যা ইতিহাসের এক নিবিড় অধ্যায়ের সাক্ষী।[৯৭] ফলত প্রাচীন বঙ্গীয় আর্থ- সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চর্চায় এসকল কেন্দ্রের গুরুত্বও যে অপরিসীম বলা বাহুল্য। এরাই স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে নানান বৈচিত্র্যের পারস্পরিক সংযোগ ও

নিত্যনতুন শিল্প ভাবনা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে বাংলার শিল্প ইতিহাসকে। যার বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে তুলে ধরার প্রয়াস করা হবে।

তথ্যসূত্র

১) নীহার রঞ্জন রায় - 'বাঙ্গালীর ইতিহাস',আদিপর্ব , দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৪০২, পৃষ্ঠা- ৬৭-৬৮

২) রমেশচন্দ্র মজুমদার – 'বাংলাদেশের ইতিহাস' প্রাচীন যুগ (১ম খন্ড), জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২

৩) রমেশচন্দ্র মজুমদার – 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' (ভলিউম ১), দ্য ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা পাবলিশার্স, মে,১৯৪৩, পৃষ্ঠা- ৮-৯ ; ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ' বঙ্গ বাঙ্গালা ও ভারত' , প্রগ্রেশিভ পাবলিশার্স কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা- ৪

৪) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তদেব

৫) রমেশচন্দ্র মজুমদার – 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' (ভলিউম ১),প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮

৬) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪

৭) তদেব

৮) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতাঃ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম, ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৬-১৩

৯) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে' -প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড় , 'বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স ,কলকাতা, ২০১৩

১0) গৌরীশঙ্কর দে, শুভ্রদীপ দে -'চন্দ্রকেতুগড়' আ লস্ট সিভিলাইজেশন -সাগ্নিক বুকস ,কলকাতা , ২০০৪

১১) এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস' , :আই–সি-এস-বি-এ ঢাকা ২০০১

১২) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে -'প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়' ,প্রাগুক্ত

১৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭ এনামুল হক, 'চন্দ্রকেতুগড়' - প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, "বেঙ্গল সাইট এন্ড সাইটস্" নিউ দিল্লী : মার্গ ,২০০৩ , পৃষ্ঠা-৪০

১৪) 'বর্তমান' (দৈনিক বাংলা সংবাদ পত্র) , ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৭

১৫) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫

১৬) এনামুল হক, 'দ্য আর্ট হেরিটেজ অব বাংলাদেশ ' , দ্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডি অব বেঙ্গল আর্ট, ঢাকা, বাংলাদেশ- ২০০৭, পৃষ্ঠা – ১৬

১৭) নীহার রঞ্জন রায় - প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা- ৩০৪

১৮) এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস,' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৫

১৯) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১

২০) এনামুল হক, 'চন্দ্রকেতুগড়' - প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, "বেঙ্গল সাইট এন্ড সাইটস্", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪০ ; গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে' -প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়' ,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭

২১) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে- তদেব

২২) এনামুল হক, 'চন্দ্রকেতুগড়' - প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, "বেঙ্গল সাইট এন্ড সাইটস্" , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪০

২৩) তদেব

২৪) তদেব, এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস' ,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫

২৫) দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী – 'আর্কিওলজিক্যাল জিওগ্রাফি অব দ্য গঙ্গা প্লেইন' দ্য লোয়ার এন্ড দ্য মিডিল গঙ্গা, পার্মানেন্ট ব্ল্যাক, দিল্লী-২০০১, পৃষ্ঠা- ১৩৬

২৬) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – এক্সপ্লোরেশান অ্যান্ড এক্সকাভেশানস্ঃ চন্দ্রকেতুগড়, ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬৭-৬৮, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী

২৭) এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস' , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭ ; এনামুল হক, 'চন্দ্রকেতুগড়'- প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, *'বেঙ্গল সাইট এন্ড সাইটস্ "* প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪১

২৮) এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস',প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা- ৪১

২৯) তদেব পৃষ্ঠা- ২৮-৩০ ; ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর), এক্সপ্লোরেশান অ্যান্ড এক্সকাভেশানস্ঃ চন্দ্রকেতুগড়, ওয়েস্ট বেঙ্গল – ১৯৫৭-৫৮ থেকে ১৯৬৬-৬৭ , প্রাগুক্ত

৩০) তদেব পৃষ্ঠা- ২৮-৩০

৩১) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে' -প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়' ,প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা - ২৪-২৭

৩২) সীমা রায় চৌধুরী, 'স্টাইল এন্ড ক্রোনোলজি': প্রবলেমস্ ইন ইভলভিং আ টেম্পোরাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য আর্লি হিস্টোরিকাল টেরেকোটাস ফ্রম বেঙ্গল' ; গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত - 'আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া , নিউ পার্সপেক্টিভস " , সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, কলকাতা – ২০০২ পৃঃ - ১৩ -২৩

৩৩) এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস',প্রাগুক্ত পৃঃ– ৩০-৩১ ; এনামুল হক, 'চন্দ্রকেতুগড়' ; প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, "বেঙ্গল সাইট এন্ড সাইটস্" , প্রাগুক্ত পৃঃ - ৪১

৩৪) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর),এক্সপ্লোরেশান অ্যান্ড এক্সকাভেশানস্ঃ চন্দ্রকেতুগড়, ওয়েস্ট বেঙ্গল – ১৯৫৭-৫৮ , আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী, পৃষ্ঠা- ৫১-৫৩

৩৫) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর), – ১৯৫৬-৫৭, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯-৩০

৩৬) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৫৭-৫৮, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫১-৫৩

৩৭) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬৭-৬৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫০

৩৮) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৫৯-৬০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫০-৫২

৩৯) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬৩-৬৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৩-৬৫

৪০) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬৪-৬৫ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫২-৫৩

৪১) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬৫-৬৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৯-৬০

৪২) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬৫-৬৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৯-৬০

৪৩) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৫৬-৫৭ -> ১৯৬৭-৬৮ প্রাগুক্ত, ; এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস' ,প্রাগুক্ত পৃঃ– ৫৬-৫৭

৪৪) ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৫৬-৫৭ -> ১৯৬৭-৬৮, প্রাগুক্ত; এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস' প্রাগুক্ত পৃঃ– ৬৮-৭২

৪৫) এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস' ,প্রাগুক্ত পৃঃ–৭৭-৯৩

৪৬) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে' -প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়' ,প্রাগুক্ত, পৃঃ-৩৯ ; ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'নিউ এপিগ্রাফিক অ্যান্ড পেলিওগ্রাফিক ডিসকভারিস' , "প্রত্নসমীক্ষা"- ১ম খন্ড, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি , গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা,১৯৯২ পৃষ্ঠা- ১৩৫-১৫৪

৪৭) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে' -প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড় ,'প্রাগুক্ত – পৃষ্ঠা ,৩৩২-৩৩৪ ; এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৭২–>৭৩

৪৮) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে -'প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়', প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৩৮

৪৯) এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস',প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১-৫১

৫০) তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৩

৫১) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে -'প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়', প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৪২

৫২) নীহার রঞ্জন রায়- প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০০

৫৩) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে' -প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়' ,প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৩৩-৩৪

৫৪) তদেব

৫৫) তদেব , পৃষ্ঠা - ৪৩

৫৬) রনবীর চক্রবর্তী, 'ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি', মনোহর পাবলিকেশন, ২০০২, পৃষ্ঠা- ১৩০-১৩১ ; শ্রেয়সী ভট্টাচার্য, 'মেরিটাইম পোর্টস অ্যান্ড পলিটিক্যাল অথরিটি ইন আর্লি হিস্টোরিক কোস্টাল বেঙ্গলঃ এক্সপ্লোরিং সার্টন হিস্টোরিকাল ইস্যুস' ইন ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় এডিটেড "পার্সপেক্টিভস অফ ইন্ডিয়ান হিস্টরি" , প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা, ২০০৬ পৃষ্ঠা- ৬০-৭৭

৫৭) প্রতাপাদিত্য পাল, 'বেঙ্গল সাইট এন্ড সাইটসঃ ইন্ট্রোডাকশান'; প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, " বেঙ্গল সাইট এন্ড সাইটস", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪

৫৮) হিমাংশুপ্রভা রায়, 'দ্য আর্কিওলজি অফ সীফেয়ারিং ইন এনসিয়েন্ট সাউথ এশিয়া, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৩ পৃষ্ঠা- ২৮

৫৯) আফরোজ আকমাম – 'মহাস্থান', বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ঢাকা ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২৬

৬০) নীহার রঞ্জন রায় , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯৯

৬১) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২১

৬২) দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, 'এনসিয়েন্ট বাংলাদেশ', আ স্টাডি অফ দ্য আর্কিওলজিক্যাল সোর্সেস উইথ এন আপডেট অন বাংলাদেশ আর্কিওলজি ১৯৯০-২০০০, দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১, পৃষ্ঠা – ৪৭

৬৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৮

৬৪) নীহার রঞ্জন রায় প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০০

৬৫) এনামুল হক, 'মহাস্থানগড়' ; প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, " বেঙ্গল সাইট অ্যান্ড সাইটস", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯

৬৬) তদেব , পৃষ্ঠা- ৭৮-৭৯, নীহার রঞ্জন রায় প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০০, দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, 'এনসিয়েন্ট বাংলাদেশ', প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা - ৪৫

৬৭) রমারঞ্জন মুখার্জ্জী, এস.কে.মাইতি - 'করপাস অফ বেঙ্গল ইনস্ক্রিপশনস,' বিয়ারিং অন হিস্ট্রি এন্ড সিভিলাইজেশন অফ বেঙ্গল, ফার্মা কে এল এম, ক্যালকাটা ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ৩৯--৪০

৬৮) নীহার রঞ্জন রায়- 'বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব' , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৮-৩১৯

৬৯) রমারঞ্জন মুখার্জ্জী, এস.কে.মাইতি - 'করপাস অফ বেঙ্গল ইনস্ক্রিপশনস', তদেব; নীহার রঞ্জন রায়, তদেব; এনামুল হক, 'মহাস্থানগড়'; প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, " বেঙ্গল সাইট অ্যান্ড সাইটস", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯

৭০) আফরোজ আকমাম – 'মহাস্থান', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৬-২৭

৭১) দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী – 'আর্কিওলজিক্যাল জিওগ্রাফি অব দ্য গঙ্গা প্লেইন' দ্য লোয়ার এন্ড দ্য মিডিল গঙ্গা, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা -১০১-১০২

৭২) এনামুল হক, 'মহাস্থানগড়'; প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, " বেঙ্গল সাইট অ্যান্ড সাইটস", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৮

৭৩) নীহার রঞ্জন রায় প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০০

৭৪) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, 'বাংলাপিডিয়া', বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড- ৮, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

৭৫) এনামুল হক, 'মহাস্থানগড়'; প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, " বেঙ্গল সাইট অ্যান্ড সাইটস", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৯

৭৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৮ , আফরোজ আকমাম – 'মহাস্থান', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৬

৭৭) এনামুল হক, 'মহাস্থানগড়'; প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, " বেঙ্গল সাইট অ্যান্ড সাইটস", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৮ ; দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, 'এনসিয়েন্ট বাংলাদেশ', প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা -৪৫, নীহার রঞ্জন রায় পৃষ্ঠা ,প্রাগুক্ত -- ৩০০

৭৮) দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী, তদেব পৃষ্ঠা –৪৪-৪৫

৭৯) নীহার রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০০

৮০) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, 'বাংলাপিডিয়া', প্রাগুক্ত, ২০০৩ পৃষ্ঠা- ৬৩

৮১) নাজিমুদ্দিন আহমেদ, 'মহাস্থান', ঢাকা, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম ১৯৮১ পৃষ্ঠা – ২৪

৮২) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৬৩

৮৩) Jean Francois Salles, Marie Francoise Boussaac, Jean yves Breuil - 'মহাস্থানগড় (বাংলাদেশ) অ্যান্ড দ্য গাঙ্গেস ভ্যালি ইন্ দ্য মরিয়ান পিরিয়ড' 'আর্কিওলজি অফ ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়া" প্রাগুক্ত পৃঃ – ৫৩৩-৩৭

মহম্মদ শফিকুল আলম ও Jean-Francois SALLES সম্পাদিত "ফ্রান্স বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়", ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট ১৯৯৩-১৯৯৯, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি,বাংলাদেশ, ২০০১ , পৃষ্ঠা- ৮২-৯৮

৮৪) ফ্রেঞ্চ বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়ঃ ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১০১-১২৫

Jean Francois Salles, Marie Francoise Boussaac, Jean yves Breuil - 'মহাস্থানগড় (বাংলাদেশ) অ্যান্ড দ্য গাঙ্গেস ভ্যালি ইন্ দ্য মরিয়ান পিরিয়ড' 'আর্কিওলজি অফ ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়া" প্রাগুক্ত পৃঃ – ৫৩৩-৩৭

৮৫) Jean yves Breuil, Jean Francois Salles – 'এক্সকাভেশনস্ অ্যাট মহাস্থানগড়: এভিডেন্স অফ সাম স্ট্রাটিগ্রাফিকাল ডাটা', *'জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট",* আই–সি-এস-বি-এ, খণ্ড- ৬, ২০০১ পৃষ্ঠা – ৭৩-৯২

ফ্রেঞ্চ বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়ঃ ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১২৬-১৩৫

৮৬) ফ্রেঞ্চ বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়ঃ ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৮-১৪৮ ; Jean yves Breuil, Jean Francois Salles – 'এক্সকাভেশনস্ অ্যাট মহাস্থানগড়: এভিডেন্স অফ সাম স্ট্রাটিগ্রাফিকাল ডাটা', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৩-৯২ ; আফরোজ আকমাম – ' মহাস্থান', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৯

৮৭) আফরোজ আকমাম – তদেব, পৃষ্ঠা-৩০ ; Jean yves Breuil, Jean Francois Salles – 'এক্সকাভেশনস্ অ্যাট মহাস্থানগড়: এভিডেন্স অফ সাম স্ট্রাটিগ্রাফিকাল ডাটা', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৩-৮৭

৮৮) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৩-৬৫

আব্দুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া- ' বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' , বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ১৭১-২০৬

৮৯) বাংলাপিডিয়া, আফরোজ আকমাম – ' মহাস্থান', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৬-৪০ ; এনামুল হক, 'মহাস্থানগড়'; প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, " বেঙ্গল সাইট অ্যান্ড সাইটস", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮১- ৮২

৯০) এনামুল হক, 'মহাস্থানগড়' , তদেব, পৃষ্ঠা- ৮২

৯১) Jean yves Breuil, Jean Francois Salles – 'এক্সকাভেশনস্ অ্যাট মহাস্থানগড়: এভিডেন্স অফ সাম স্ট্রাটিগ্রাফিকাল ডাটা', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৩-৯২ ; মহম্মদ শফিকুল আলম, 'সিরামিকস ফ্রম মহাস্থানঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি' , জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,আই–সি-এস-বি-এ খণ্ড- ৪, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৪৮৫-৪৯৬

৯২) মহম্মদ মোশারফ হোসেন, 'রিসেন্ট ডিসকভারি অফ আ হোর্ড অফ পাঞ্চ মার্কড কয়েনস অ্যাট মহাস্থানগড়', জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, খণ্ড- ৪,১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৪৭৭-৪৮৩

৯৩) এম এফ ব্যুসাক ও স্যান্ড্রিন গিল, 'মোল্ডেড টেরাকোটা প্লাকস্ ফ্রম মহাস্থান', জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, খন্ড-৬, ২০০১, ৬৫-৭২ ; Jean yves Breuil, Jean Francois Salles – 'এক্সকাভেশনস্ অ্যাট মহাস্থানগড়: এভিডেন্স অফ সাম স্ট্রাটিগ্রাফিকাল ডাটা', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৩-৯২

৯৪) রমারঞ্জন মুখার্জ্জী, এস.কে.মাইতি - 'করপাস অফ বেঙ্গল ইনস্ক্রিপশনস,' বিয়ারিং অন হিস্ট্রি এন্ড সিভিলাইজেশন অফ বেঙ্গল, ফার্মা কে এল এম, ক্যালকাটা ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ৩৯--৪০ ; নীহার রঞ্জন রায়- 'বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব' , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩১৮-৩১৯

৯৫) Jean yves Breuil, Jean Francois Salles – 'এক্সকাভেশনস্ অ্যাট মহাস্থানগড়: এভিডেন্স অফ সাম স্ট্রাটিগ্রাফিকাল ডাটা', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭৩-৯২ ; শাহ সুফী মোস্তাফিজুর রহমান, 'রিসেন্ট ডিসকভারি অফ গ্লাস বিডস ফ্রম মহাস্থানগড়ঃ অ্যান আর্কিওলজিক্যাল পার্সপেকটিভ', জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট , আই–সি-এস-বি-এ, খন্ড-৪, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৬৭-৭৬

৯৬) Jean yves Breuil, Jean Francois Salles, তদেব ; আফরোজ আকমাম – 'মহাস্থান', বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ঢাকা ২০১৬, পৃষ্ঠা- ২৬

৯৭) সাগর চট্টোপাধ্যায়- ' দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পুরাকীর্তি' , প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার- তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা ২০০৫

কৃষ্ণকালী মণ্ডল- ' দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল' , দক্ষিণ ২৪ পরগণা প্রত্নইতিহাস সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০২, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা

গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত- 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতাঃ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম, ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৬-১৩

৯৮) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে' -প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড় ,'প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৭৯-৮০

৯৯) সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৪ ; ফ্রেঞ্চ বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়ঃ ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড়ের শিল্পধারাঃ এক প্রতীকী অনুসন্ধান

গবেষণা পত্রটির আলোচ্য বিষয় মূলত আদি ঐতিহাসিক বাংলার টেরাকোটা শিল্পের ক্রমান্বয়িক ইতিহাসের বিস্তীর্ণ উপস্থাপনা। সেই প্রসঙ্গে নির্বাচিত প্রধান ২টি স্থল তথা প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড়ের ভৌগোলিক অবস্থান, পরিবেশ ,উৎখনন জনিত প্রত্নতাত্ত্বিক নানান তথ্যাবলী প্রভৃতি বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। তাই এই অধ্যায়ে সম্পূর্ণ রূপে সরাসরি উক্ত কেন্দ্রদ্বয়ের পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসে আলোকপাত করার প্রয়াস করা হবে। মূলত প্রাপ্ত বিভিন্ন শিল্প উপাদান, তার সহিত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতীকীর উপস্থাপনা, ক্রমবিকাশ, বিশ্লেষণ, প্রবহমানতা, সর্বোপরি বাংলার শিল্প ইতিহাস বা সামগ্রীক ইতিহাসের ধারায় উক্ত অবয়বগুলির গুরুত্ব অনুধাবনের প্রয়াস বর্তমান লেখনী।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে শিল্প উপাদান রূপে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে রয়েছে অসংখ্য পোড়ামাটি শিল্পসামগ্রী সমূহ যার বিপুল সমৃদ্ধি প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্য প্রায় সকল ঐতিহ্যকে কিছুটা ম্লান করে রেখেছে বলা যায়। বিশ্বের যেকোনো শিল্প প্রস্তুতকারী সামগ্রীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য ও সহজ ব্যবহার্য হল মৃত্তিকা, আর নদীমাতৃক অবস্থান এবং সুলভ মৃত্তিকার প্রাচুর্য পাশাপাশি পাথরের অপ্রতুলতা সর্বদাই বাংলার মৃৎশিল্পের ধারাকে ত্বরান্বিত ও ঐতিহ্যমন্ডিত করে। বর্তমান আলোচ্য বিষয় আদি ঐতিহাসিক বাংলা, এবং উক্ত কালপর্বে বাংলার টেরাকোটা শিল্পইতিহাসে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য নিম্নবঙ্গীয় উপত্যকীয় অঞ্চলসমূহ। সময়ের ব্যবধানে এই অঞ্চলে একাধিক টেরাকোটা সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া যায় প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায়ে যাদের বিভিন্ন দিকের আলোচনা রয়েছে। তবে এর মধ্যে সর্বদাই পোড়ামাটি শিল্পচর্চায় গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বা সাম্প্রতিক চর্চার অগ্রভাগে রয়েছে অধুনা পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলটি, যার পোড়ামাটি শিল্পের প্রাচুর্যে বাংলার খ্যাতি আজ বিশ্বব্যাপী। এছাড়া অপর একটি টেরাকোটা সমৃদ্ধ বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন বঙ্গীয় প্রত্নস্থল হল অধুনা বাংলাদেশের উত্তরাংশ মূলত মহাস্থানগড় অঞ্চল। যদিও এই অঞ্চলে প্রাপ্ত আদি ঐতিহাসিক পর্বীয় টেরাকোটা অবয়ব তুলনামূলক ভাবে কিছুটা কম, তুলনায় গুপ্ত বা গুপ্তপরবর্তী ও পাল অধ্যায়ের

টেরাকোটা উপাদানের সন্ধান মেলে এই অঞ্চল থেকে। তবে এর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ন বিষয় হল মহাস্থানে অধিকাংশ টেরাকোটাগুলি উৎখনন সূত্রে নির্দিষ্ট স্তরে আবিষ্কৃত, ফলে তা কালপর্যায় নির্ধারনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ন[১] যা গাঙ্গেয় উপত্যকা অপেক্ষা মহাস্থানের টেরাকোটা সংক্রান্ত সকল দুর্বলতাকে মলিন করে দেয়।

দেখা যায় চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ অন্যান্য টেরাকোটা সম্বলিত অধিকাংশ বঙ্গীয় প্রত্নস্থলগুলিতেই মোটামুটি প্রাক মৌর্য পর্যায় থেকে শুরু করে গুপ্ত পর্যায়ের সাক্ষ্য বিদ্যমান। তবে পোড়ামাটি শিল্পধারায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ শুঙ্গ কুষান অধ্যায়, এই পর্যায়ে বাংলার টেরাকোটা সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করে। যদিও বাংলায় সরাসরি শুঙ্গ বা কুষান পর্বের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কোনোরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ আজও অনুপস্থিত কিন্তু আবিষ্কৃত একাধিক প্রত্নদ্রব্য বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উক্ত রাজবংশাবলীর প্রভাবসম্পন্ন আদর্শগত ধারার উপস্থিতির দিকটিকে তুলে ধরে।

ভারত ইতিহাসে প্রায়-ঐতিহাসিক পর্যায় থেকে গুপ্ত-পরবর্তী অধ্যায় পর্যন্ত সময়কাল টেরাকোটা শিল্পোৎপাদনের সহিত জড়িত একাধিক প্রযুক্তি বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। কখনো শুধু হাতের স্পর্শে প্রয়োজন অনুসারে মৃত্তিকার রূপদান, কখনো তাতে যুক্ত হয়েছে এক বা একাধিক ছাঁচের ব্যবহার ও অন্যান্য একাধিক প্রযুক্তি। যুগের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে এর ব্যবহার এবং শৈলীগত বা বিষয়গত উপকরণও, কখনো মাতৃদেবীর ব্যাপকতা কখনো বা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৃত্য-গীত, মিথুন রীতি বা আরও বিচিত্র বিষয়াবলী যা শিল্পইতিহাসের ক্রমান্বয়িক বিকাশ ও ধারাবাহিকতার দিকটিকে স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত করে আবার পাশাপাশি এই শিল্পের কিছু দিক, কিছু অবয়ব চিরাচরিত ঢঙে একই রূপে অব্যাহত রয়ে গেছে আজও।[২] এই প্রযুক্তিগত বৈচিত্রের ভিত্তিতে বিখ্যাত শিল্প ঐতিহাসিক স্টেলা ক্র্যামরিশ[৩] পোড়ামাটি শিল্পকে ২টি পৃথক পরিচিতি প্রদান করেন, তিনি একে ২ভাগে ভাগ করেন যথা- চিরন্তন এবং সময়াবদ্ধ। প্রথম প্রকারটি দ্বারা বুঝিয়েছেন মূলত সেই সকল শিল্প উপাদান যেগুলি মূলত হাতে তৈরি এবং অপরিবর্তিত রূপে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান আর অপরটি সময়ের সাথে পরিস্থিতির সাথে নতুন ধাঁচে, নতুন নতুন পদ্ধতি ও বিষয়াদিকে কেন্দ্র করে নানান প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারন করেছে।

আবার ঐতিহাসিক সরসী কুমার সরস্বতীও[৪] এজাতীয় কিছু চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করেন তার লেখনীতে, তিনি এক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকের উল্লেখ করেন যে, অনেক সময় বহু প্রত্নস্থলে দেখা গিয়েছে এই উপরিউক্ত দুই ধাঁচের উপাদানই একত্রে সহাবস্থান করছে এবং বর্তমানেও বহু ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ক্র্যামরিশ কর্তৃক উল্লিখিত ‘চিরন্তন’ ধারার টেরাকোটা উপাদানের

প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। ফলে টেরাকোটা শিল্পচর্চায় বিবর্তিত নিত্য নতুন ধারার পাশাপাশি এর গুরুত্বও কোনভাবেই অস্বীকার্য নয়, বরং বলা চলে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার ক্ষেত্রেও এই ধারার ব্যতিক্রম নয়, উভয় রীতির উপাদানই বাংলায় বহু প্রত্নস্থলে একত্রে আবিষ্কৃত হয়। কেননা সর্বদাই নতুন প্রযুক্তি আগমনের সাথে পুরনো শিল্পরীতি যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় এমনটা নয়, পুরনো ধারার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই নতুন চিন্তন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আরোপিত হয়। ফলত উভয় ধারার একত্র প্রাপ্তি একেবারে অনাকাঙ্খিত এমনটা না মনে করাই শ্রেয়।

প্রাচীন বাংলার টেরাকোটা শিল্প পর্যালোচনায় অপর একটি অবশ্য উল্লেখ্য দিক হল এর সময়কাল সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা, যা এক্ষেত্রে মূল সমস্যা। সাধারণত অধিকাংশ পোড়ামাটির ফলকগুলি বিভিন্ন প্রত্নস্থলের অনুসন্ধান পর্বে বিচ্ছিন্নভাবে আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং সময়সীমা সংক্রান্ত কোন নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য একান্তভাবে অনুপস্থিত থাকায় এর নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারন বিশেষ ভাবেই জটিলতাসম্পন্ন ও কষ্টসাধ্য। উল্লেখ্য কেবল অনুসন্ধান পর্বই নয়, ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে দেখা যায় চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে আজও বর্ষাকালে ইতস্তত পুরাসামগ্রীর সন্ধান পাওয়া যায় বিভিন্ন অঞ্চলে এবং স্থানীয় জনবসতির অধিকাংশের ঘরে সংরক্ষিত টেরাকোটা সহ অন্যান্য প্রত্নসামগ্রী তার প্রমাণ যাদের স্তরীয় কাল নির্ধারণ অসম্ভব কাজ। ফলত সামগ্রীকভাবে এই ধরণের শিল্প অবয়বের সময়কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার শৈলীগত বৈশিষ্ট্যাবলীকে বিবেচ্য মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাতে নানান দ্বিধা রয়েছে,বহুক্ষেত্রে এরম উপাদান পাওয়া যায় যেখানে সম্পূর্ণ ২টি ভিন্ন পর্যায়ের ভিন্ন শৈলীর অবয়ব একই অধিবসতির স্তর থেকে আবিষ্কৃত হয় কিংবা কখনো আবার অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের শিল্প উপাদান তার পূর্ববর্তী কোন স্তর থেকে আবিষ্কৃত হয়। সেক্ষেত্রে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সরসী কুমার সরস্বতী[৫] মন্তব্য করেন এর পেছনে নানান কারন থাকতে পারে। অনেক সময় মানুষ তার বিশ্বাসের খাতিরে কিছু জিনিস বংশ পরম্পরায় সংরক্ষণ করে থাকে, যার প্রমাণ আজও হাতে গড়া এজাতীয় মূর্তির প্রচলন এছাড়া তিনি বলেন টেরাকোটা উপকরণের ন্যায় ছোট উপাদান সামগ্রীর প্রাকৃতিক নিয়মেই হোক বা মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রভাবে ভূ-অভ্যন্তরের এক স্তর থেকে অন্যত্র গমন হয়তো একদম অসম্ভব ঘটনা নয়। যাইহোক, সাধারণত এক্ষেত্রে বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত অজস্র টেরাকোটার উপাদানগুলির সময়সীমা নির্ধারণে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল মূলত অহিচ্ছত্র, কৌশাম্বী, চম্পা, মথুরা প্রভৃতি উত্তরভারতীয় প্রত্নস্থলগুলি থেকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটি এবং পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রস্তর শিল্পের সহিত তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এগুলির সময়সীমা নির্ধারণের প্রয়াস করা হয়ে থাকে। তবে এই প্রক্রিয়াটিও অবশ্যই সংশয়াতীত নয়, এখানেও একই ধরণের জটিলতা জড়িত- অধিকাংশ উপকরণের ক্ষেত্রেই

নির্দিষ্ট স্তরীয় পরিচিতি বা কালানুক্রমিক পরিচিতি নেই যার ফলে এই তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তি কোথাও গিয়ে হয়তো আদতেই দুর্বল। যেমন উড়ন্ত ঘাঘরা ও মেডালিয়ন যুক্ত নারীমূর্তিকে সাধারণত মৌর্য পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব বলে মনে করা হয়ে থাকে, যা ব্যাপক মাত্রায় পাওয়া যায় মূলত বিহার অঞ্চলে কিন্তু সেক্ষেত্রেও তার পর্যায়ক্রমিক অবস্থান নিশ্চিত নয়। কুমরাহার অঞ্চলে তা পাওয়া যায় ১৫০ খ্রীঃপূঃ থেকে ১০০ খ্রীঃ নাগাদ সময়ে, কৌশাম্বীতে ৪০০ খ্রীঃপূঃ, হস্তিনাপুরে তার সময়সীমা ৬ষ্ঠ খ্রীঃপূঃ থেকে ৩য় খ্রীঃপূঃ, ফলে বাংলায় প্রাপ্ত ঐজাতীয় অবয়বের নির্ধারিত সময়সীমাও যে কোনোভাবেই চূড়ান্ত হতে পারেনা তা বলা বাহুল্য।[৬]

এছাড়া অপর যে ধারা প্রাচীন প্রস্তর শিল্পের সহিত তুলনামূলক আলোচনা সেক্ষেত্রে মূলত সাঁচি, ভারহুত, মথুরা, বোধগয়া এবং পশ্চিম ভারতীয় নাসিক, জুনাড় এর সাথে তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে পোড়ামাটি শিল্প উপকরণাদির সময়সীমা নির্ধারণের প্রয়াস করা হয়ে থাকে। তবে সেবিষয়টিও কোনমতেই নির্ভেজাল নির্ভুল পদ্ধতি নয়, এজাতীয় আলোচনার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি বা জটিলতার উপস্থিতি খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কেননা একই অঞ্চলের খুব নিকটবর্তী প্রত্নস্থলেও যে একযোগে, একইভাবে কোন শিল্পের বিকাশ ঘটবে তেমনটা নয়। আবার ২টি সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্প মাধ্যম, ভিন্ন প্রযুক্তি-পদ্ধতি, উপকরণ, ভিন্ন শিল্পী, ভিন্ন সমস্যা ও তার ভিন্ন সমাধানের পথ সম্পূর্ণটা আলাদা। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রত্নস্থলের অবস্থান, সেক্ষেত্রে তারা পৃথক ভৌগোলিক , আর্থসামাজিক ,ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বহনকারী তথা নিজ নিজ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।[৭] উক্ত প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ২টি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের শিল্পধারা শৈলীগত বা বিসয়গত দিক থেকে একইভাবে বিকশিত হবে এবং এর উপর ভিত্তি করে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা নির্দিষ্ট ধারার শিল্পের পর্যায়ক্রম নির্ধারণের প্রয়াসের বিষয়টি নিঃসন্দেহেই মনে হাজারও প্রশ্নের উদ্রেক করে। কেননা কেবলমাত্র শৈলী বা বিসয়গত বৈশিষ্ট্য কোন উপাদানের কালানুক্রমিক অবস্থান নির্ধারণে যথেষ্ট নয়, সেটি আলোচনার একটি মাধ্যম হতে পারে কিন্তু একমাত্র প্রধান ভিত্তি হয়তো নয়।

উত্তর ভারত ও বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির উপকরণগুলির গভীর পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হয় শৈলীগত ও বিষয়গত দিক থেকে সমগোত্রীয় হলেও তারা যে আবশ্যকভাবে সর্বত্র একই স্তরীয় ক্ষেত্রে অবস্থান করে তা নয়। অর্থাৎ তাদের সময়কাল যে সর্বত্র এক হবে এমনটা কখনোই নিশ্চিতভাবে বলা যায়না। যেমন চিরপরিচিত পোড়ামাটির সর্প অবয়ব বিহারের শোনপুর ও চম্পা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ থেকে ১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়পর্বে আবার বৈশালীতে তা পাওয়া গিয়েছে ৩০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কালপর্বে। আর এই একই অবয়ব বাংলায় চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলের ইটখোলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে

প্রথম থেকে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী পর্বে এবং খনামিহিরের ঢিবি থেকে চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী কালে। অর্থাৎ একই পোড়ামাটির শিল্প উপাদান বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত থাকলেও তার সময়কাল কিন্তু ছিল ভীষণভাবেই ভিন্ন। আবার অনেক সময় একই প্রত্নস্থলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভিন্ন ক্ষেত্রেও যে সমজাতীয় অবয়ব আবিষ্কৃত হয় যার সময়সীমা ভিন্ন তারও প্রমাণ মেলে উপরিউক্ত উদাহরণ সহ আরও একাধিক ক্ষেত্রে।[৮]

সুতরাং উপরিউক্ত উদাহরণটি কোথাও গিয়ে শৈলী ও বিষয়ভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে উক্ত শিল্পদ্রব্যের সময়কাল নির্ধারনের প্রক্রিয়ার দুর্বলতার দিকগুলিকে যে পরিস্ফুট করে তা বলা বাহুল্য। এইসকল কারনেই প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ টেরাকোটা শিল্পসামগ্রীর নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণের দিকটি আজও অধরাই। ফলস্বরূপ নিশ্চিত ভাবে এই পদ্ধতি গ্রহন সম্পর্কে তথা টেরাকোটা শিল্পের সময়কাল নির্ধারনে প্রযুক্ত শৈলীর ওপর নির্ভরতার ক্ষেত্রটি সম্পর্কে কিছুটা পুনর্বিবেচনার কথা উল্লেখ করেছেন সীমা রায় চৌধুরী[৯], পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত উৎখনন বা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদানের কথা বলেন এবং যেহেতু আরোপিত শিল্পরীতি যেকোনো শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাই যদিও বা শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলোচনা করতে হয় সেক্ষেত্রে সমজাতীয় ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে অবস্থিত অঞ্চলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় অধিক আলোকপাত করা উচিৎ কেননা ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে ভিন্ন আর্থ-সামাজিক,রাজনৈতিক উপাদানের ফলে শিল্প বিকাশের প্রেক্ষিতও সম্পূর্ণ ভিন্ন, ফলে সেক্ষেত্রে এইরূপ আলোচনা সংশয়াত্মক ফলপ্রদান করবে এটাই আশানুরূপ। তা সত্ত্বেও সকল জটিলতা, সীমাবদ্ধতাকে সঙ্গে নিয়েই সাধারণত শিল্প উপাদানগুলির শৈলীগত বিকাশ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজবংশাবলীর প্রভাবান্বিত ধারার দিকটি আলোচনা দ্বারা সেগুলিকে উক্ত সময়কালীন রূপে গন্য করা হয়ে থাকে যা ইতিপূর্বে বর্ণিত।

আদি ঐতিহাসিক বাংলার টেরাকোটা শিল্পকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন ঐতিহাসিকরা যা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে নানান বৈচিত্র্যের সংযোগ ঘটায়। কখনো তার ওপর প্রযুক্ত রীতি বা কলাকৌশলের ভিত্তিতে এই শিল্পের চরিত্র নির্ধারন করা হয় আবার কখনো উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে কিংবা রাজনৈতিক সংযোগের ভিত্তিতে টেরাকোটা শিল্পের শ্রেণী বিভাজন করা হয়ে থাকে। তবে টেরাকোটা শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল স্বয়ং শিল্প অবয়বগুলি, তাতে উপস্থাপিত চেতনা এবং অবশ্যই সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতীকী বা মোটিফ সমূহ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কয়েক হাজার বছর পূর্বের মানুষের চিন্তাধারার অনুসন্ধান, তারা কোন

মুহূর্তে কিরূপ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে অবয়বগুলি গড়ে তুলেছিলেন তার বিশ্লেষণ নেহাতই সহজসাধ্য নয়। ফলত এই সকল অবয়বগুলির সাথে বিষয় ভেদে নির্দিষ্ট যে মোটিফ বা প্রতীকীর উপস্থাপনা চোখে পড়ে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু আদি ঐতিহাসিক বাংলার টেরাকোটা সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনা থাকলেও উক্ত শিল্পের সাথে জড়িত এই রূপ কিছু নির্দিষ্ট 'প্রতীকী'র ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত ইতিহাসের আলোচনা বা সেখানে উপস্থাপিত মোটিফের প্রতীকী তাৎপর্য কতখানি সে জাতীয় চর্চা কিন্তু বহুলাংশে বিরল। বর্তমানে কিছুটা উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে মাথায় রেখে চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড়ের আদি ঐতিহাসিক পর্বীয় টেরাকোটা শিল্পউপাদান সমূহের বিশ্লেষণের ক্ষুদ্র প্রয়াস করব। কেননা তার সংখ্যাগত ও বৈচিত্র্যগত ব্যপকতা এত বিপুল যে পৃথক ভাবে প্রতিটি অবয়বের আলোচনা সম্পূর্ণত অসম্ভব।

প্রথমেই বলা যায় টেরাকোটা নির্মিত প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু অবয়বের কথা যেগুলি মূলত হাতে গড়া। এই প্রাথমিক পর্যায়ের মূলত কিছু পশু ও মানবীয় মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় যার মধ্যে অধিকাংশই নারী অবয়ব। যাদের মূল বৈশিষ্ট্য স্বরূপ সাধারণত উন্মুক্ত বক্ষ, প্রসারিত কটিদেশ ও নিতম্ব সহ অবয়ব, মূলত হাতে নির্মিত ও চিমটি দিয়ে চোখ,নাক প্রভৃতি তৈরি করা হয়ে থাকে এবং ষ্টেলা ক্র্যামরিশ[১০] এর বর্ণনা অনুসারে যা মূলত 'চিরন্তন' ('Timeless') শ্রেণীভুক্ত। এই সকল অবয়বের সম্পর্কে একটি ব্যাপক ও সর্বজনীন শব্দবন্ধ সাধারণ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তা হল **মাতৃকাশক্তি বা 'Mother Goddess'** যা তার দৈহিক ভঙ্গিমা বা উপস্থাপনার নিরিখে বিশেষভাবে ধর্মীয় রীতিনীতি ও প্রজনন সত্ত্বার সহিত সম্পর্কিত বলে চিহ্নিত। এই ধরণের অবয়ব মোটামুটি প্রায় সকল প্রত্নস্থলেই কমবেশি পাওয়া যায় যথা, পান্ডুরাজার ঢিবি, হরিনারায়ণপুর, তিলপি, চন্দ্রকেতুগড় সর্বত্রই বিদ্যমান।[১১] কেবল আদি ঐতিহাসিক বাংলাই নয় এর শিকড় নিহিত রয়েছে সুদূর অতীতে। আনুমানিক প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা প্রবহমান ছিল। ভারতে টেরাকোটা শিল্প বিকাশের মূল ইতিহাসকে সাধারণত ২টি পর্যায়ে পাওয়া যায় প্রথমত হরপ্পা সংস্কৃতির কালে এবং দ্বিতীয়ত এই আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ে। এই সামগ্রীক পর্ব জুড়েই কিন্তু শিল্পধারার অপরিহার্য অংশ হিসেবে এই শ্রেণীর অবয়ব নির্মাণের ধারণা অত্যন্ত গভীর ভাবে নিহিত ছিল। শুধু তাই নয় বিশেষ উল্লেখ্য অনুরূপ এজাতীয় অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় আজও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যা কেবল শিল্পক্ষেত্রে নয় সামগ্রীক মানব ইতিহাসে এইরূপ অবয়বের প্রাসঙ্গিকতাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। এছাড়া এই হাতে গড়া সহজ সরল ভঙ্গির মাতৃঅবয়ব ছাড়াও সামগ্রীক রূপে মাতৃকাশক্তি আরাধনার ইঙ্গিত আমরা পাই আলোচ্য

টেরাকোটা অবয়বগুলির সূত্রে যেখানে দৈহিক ভঙ্গিমায় পরিবর্তন আসলেও তার অন্তর্নিহিত চেতনা কোথাও গিয়ে উপরিউক্ত প্রাথমিক অবয়বগুলির সাথে তাদের যোগসূত্র নির্ধারণ করে যাদের আলোচনা নিম্নে বর্ণিত হবে।

এখন এসকল আদিম ধারার মূর্তিগুলিকে যদি লক্ষ করা যায় দেখা যাবে উক্ত নারীমূর্তি গুলির মধ্যে আবার বেশ কিছু শ্রেণী রয়েছে। যেমন- কিছু একক উপস্থাপনা যেখানে মৃত্তিকার মাধ্যমে নারী শক্তিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে, আবার কোনও অবয়বে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার মাতৃরূপ অর্থাৎ সন্তান সহযোগে নারী শক্তির উপস্থাপনা (চিত্র ১) এবং দৈহিক গড়ন উপরিল্লিখিত বর্ণনার ন্যায় যা তার প্রজনন স্বত্তাকে প্রতফলিত করে। আবার কখনো বা নারী দেহে পক্ষী বা পশুর মুখমণ্ডলের উপস্থাপন (চিত্র ২) কিন্তু তার সামগ্রীক চরিত্র আবারও সেই মাতৃশক্তিরই প্রতিফলন অর্থাৎ বিচিত্র চরিত্র বা প্রেক্ষিত থেকে তা উর্বরতা, প্রজননস্বত্তা জনিত ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত। এখন প্রশ্ন হল এই যে সামগ্রীকভাবে 'মাতৃকা শক্তি' রূপে পরিগণিত নির্দিষ্ট আদিম শৈলীর অবয়ব তার অবিচ্ছেদ্য ক্রমপ্রবহমানতা বা বিকাশকে আমরা কোন পর্যায়ে রাখব? অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলত এগুলি এমন অবয়ব যেখানে তার রূপ পরিবর্তনের তথা তার কারুকার্য বিহীন আদিম রূপের সৌন্দর্যায়নের কোনোরূপ প্রচেষ্টা কোন কালেই বিশেষ লক্ষণীয় নয়। তবে শিল্পক্ষেত্রের সামগ্রীক সমৃদ্ধি ঘটেনি এমনটা যে নয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলা সহ বিভিন্ন ভারতীয় প্রত্নস্থলের আবিষ্কৃত অজস্র উন্নত কারিগরীর টেরাকোটা শিল্প উপাদান। কিন্তু তা স্বত্তেও হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর সময় থেকে শুরু করে ভিন্ন ভিন্ন সময়পর্বে ভারতীয় প্রায় সকল টেরাকোটা সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলে তথা আজও নানান ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগোপযোগী আধুনিক সমৃদ্ধ শৈলীর শিল্প উপাদানের পাশাপাশি এই আদিম শৈলীতে নির্মিত অবয়ব সমূহ পরিলক্ষিত। অর্থাৎ স্থান কাল ভেদে ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের কাছে সর্বদাই এইসকল উপাদান গ্রহণীয় তথা জনপ্রিয় হয়ে থেকেছে সন্দেহ নেই। তৃতীয় অধ্যায়ে ক্ষেত্র বিশেষে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার পাশাপাশি উত্তর ভারতীয় ক্ষেত্রেও প্রাপ্ত এইরূপ অবয়বের উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ প্রশ্ন আসে এই সমগ্র প্রক্রিয়ার পশ্চাতে কিরূপ কারণ বা সম্ভাবনা নিহিত থাকতে পারে। দীর্ঘকাল ব্যাপী অপরিবর্তিত রূপে এদের অবস্থান খুব স্বাভাবিক রূপেই কেবল শিল্প সামগ্রী রূপে এর বিচারকে নস্বাৎ করে, এবং তার বাইরে গিয়ে সমাজে এদের সংযোগ বা অবস্থানকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে বাধ্য করায়।

সাধারণত আদিম সমাজে মানুষ বিবিধ ভয়, বিপদ প্রভৃতির থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ নানান আচার উপাচার জনিত ক্রিয়াকলাপ তথা উক্ত ভয়ের সাথে সম্পর্কিত দেবদেবী বা প্রকৃতির

বিভিন্ন সৃষ্টির উপাসনা করত যা মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম অধ্যায়। সেই সূত্রে সমাজে জননেন্দ্রিয়, উর্বরতা, ধরিত্রী, নারীর মাতৃরূপ, সাপ, গাছ, পাহাড় প্রভৃতির উপাসনা পরিলক্ষিত হয়। বহু প্রচারিত কোনও ধর্ম বা দর্শনের সৃষ্টির আগেই মানুষের এই প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস তার মনের ওপরে গভীর ছাপ ফেলেছিল, এবং ক্রমেই সাধারণ মানুষ তার ধর্ম বিশ্বাসের রূপদান হেতু বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ অবয়ব গড়ে তুলেছে, গ্রহন করেছে শিল্প মাধ্যমকে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেন চন্দ্রকেতুগড় সহ বাংলার বহু ক্ষেত্রে যে তাম্রাশ্মীয় পর্ব বা খ্রিষ্টপূর্ব সময়কালের মাতৃমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি কিন্তু সরাসরি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবের উপস্থিতির ইঙ্গিতবাহী নয়, কেননা প্রাথমিক পর্বে প্রাপ্ত মূর্তি গুলির মধ্যে যেগুলি দেবদেবীর মূর্তি বলে সনাক্ত করা হয় তার সবগুলি সেসময় ব্রাহ্মণ্য পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা বলা যায়না, তাই হয়তো তা মানুষের প্রাক্ ব্রাহ্মণ্য প্রাথমিক ধর্মচিন্তার ফলশ্রুতি।[১২] বলা চলে এজাতীয় অবয়ব নিঃসন্দেহে মানুষের ধর্মীয় রীতিনীতি বা উপাসনার অঙ্গবিশেষ ছিল বা আজও রয়েছে, কেননা মানুষের নির্দিষ্ট বিশ্বাস বা স্পর্শকাতর আবেগ ব্যতিত এইরূপ অবয়বের পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী সমাজে নিজ অবস্থান বজায় রাখা হয়তো সম্ভবপর হতনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শৈল্পিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সাধারণত স্রষ্টার অনুপ্রেরণা হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে ধর্মীয় আদর্শ, যা বিভিন্ন রূপে শিল্পীর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এক কাল্ট সংযোগের অনুমান করা চলে এজাতীয় অবয়বের বিকাশের পশ্চাতে।

এছাড়া এই ধরণের অবয়বগুলি অধিকাংশই সাধারণত নিরলংকার, জাঁকজমক বিহীন ও কিছুটা অপরিণত কর্মের প্রকাশ যেখানে মূলগতভাবে নারীর দৈহিক আঙ্গিককে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে। এইরূপ উপস্থাপনাই অবয়ব গুলির পশ্চাতে নিহিত ধর্মীয় চেতনা বা বিশ্বাসের দিকটিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। বলা চলে কোন নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট উপাস্যের অংশ নয়, সার্বিক ভাবে শুভ বা মঙ্গল চিন্তার প্রতীক রূপে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এই উপাদানগুলি। যেমন – উন্মুক্ত বক্ষ ও সুস্পষ্ট কটিদেশ সহ আকর্ষণীয় নারীমূর্তির দৈহিক উপস্থাপনাকে প্রজনন স্বত্তা বা উর্বরতার প্রতীক রূপে গন্য করা হয় তেমনি আবার সন্তান যোগে নারী মূর্তির উপস্থাপনা থেকে তাকে সন্তানের কল্যানের উদ্দেশ্যে রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে তার উপাসনার উদ্দেশ্যে এজাতীয় অবয়ব গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ধরণের অবয়বগুলি পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য শিশুদের রক্ষক দেবী 'ষষ্ঠী'র প্রাথমিক উপস্থাপনা বলে অনেকে অনুমান করে থাকেন। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[১৩] এই রূপ অবয়বের আলোচনায় এজাতীয় প্রাক ব্রাহ্মণ্য লৌকিক দেবীর আদর্শ আদতে ব্রাহ্মণ্য ষষ্ঠী ও বৌদ্ধ দেবী হারীতী-র ভাবনার সহিত

সংযুক্তকরণের দ্বারা উক্ত দেবীতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেন। তবে মৌর্য পর্যায় থেকে বাংলায় মোটামুটি উত্তর ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটলেও বা ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতির পারস্পরিক গ্রহন বর্জন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিচিত্র রীতিনীতি বা প্রথার সমন্বয় ঘটলেও এই সকল অবয়বগুলির নিজস্বতা কিন্তু স্বমহিমায় বজায় থেকেছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে দীর্ঘকাল ধরে বাংলায় প্রচলিত বিবিধ ব্রত অনুষ্ঠানগুলির কথা; যেখানে বাংলার মহিলারা তাদের বিভিন্ন মনস্কামনা পূরনের উদ্দেশ্যে তথা সমৃদ্ধি, সন্তানের মঙ্গলকামনা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ব্রত পালন করে থাকেন। যা কোন নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসনা কর্মকে নির্দেশ করেনা, এর মধ্যে সাধারণ মানুষের অতি সূক্ষ্ম আবেগ ও বিশ্বাস জড়িত। প্রথাগত মন্দির উপাসনার বাইরে এর অবস্থান।[১৪] উক্ত বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠানগুলিতে নানাপ্রকার টেরাকোটার আদিম ধাঁচের বিভিন্ন বিভিন্ন মানব বা পশু অবয়বের ব্যবহার আজও পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন অঞ্চলে যা সভ্যতার আদিম পর্বের সেই প্রাথমিক ধর্মচিন্তার কথা মনে করিয়ে দেয়।

১

২

চিত্র নং-১ সন্তান সহ মাতৃশক্তির উপস্থাপনা , চন্দ্রকেতুগড়, চিরন্তন শ্রেণীভুক্ত(Ageless) সৌজন্যে-গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’ , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩

চিত্র নং -২ ছাগ মস্তক সম্বলিত মাতৃমূর্তি, চন্দ্রকেতুগড়, চিরন্তন শ্রেণীভুক্ত(Ageless) সৌজন্যে, এলোকোয়েন্ট আর্থ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৯

আলোচনা যদি মাতৃকামূর্তি বা নারীশক্তির উপাসনা কেন্দ্রিক হয় তবে এই আলোচনার ক্ষেত্রটি কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনা। ইতিপূর্বেও উল্লিখিত যে আরও একাধিক নারী অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় যেখানে সময়ভেদে বাহ্যিক রূপের বৈচিত্র্য বা পরিবর্তন আসে ঠিকই কিন্তু ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যাবে তাদের সহিত সম্পৃক্ত চেতনা বা আদর্শ কিন্তু আদতে অনুরূপ। উক্ত অবয়বগুলিকে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে অভিহিত করে থাকেন, যথা - 'শ্রীলক্ষ্মী', 'ধান্যদেবী', 'বসুধরা' প্রমুখ। এখন প্রশ্ন করাই যায় আদি ঐতিহাসিক সময়পর্বে বাংলার টেরাকোটা শিল্পে প্রকৃতই তার উপস্থাপনা কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বা কিসের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অবয়ব সমূহকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে?

প্রথমেই যদি **'শ্রীলক্ষ্মী'** স্বত্তার কথা বলতে হয় দেখা যাবে, দেবী লক্ষ্মী হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অন্যতম জনপ্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ দেবতা। সুখ সমৃদ্ধি বা প্রতিপত্তির উদ্দেশ্যে যার উপাসনা আজও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সহ বাংলার ঘরে ঘরে পরিলক্ষিত হয়। 'শ্রী-সূক্ত' থেকে লক্ষ্মীর প্রতিমালক্ষণ জনিত বিস্তীর্ণ উল্লেখ মেলে, যেখানে পদ্মের সহিত সম্পর্কের কারনে অবস্থান অনুসারে তাকে পদ্মিনী, পদ্মানন, পদ্মপ্রিয়া, পদ্মজ, পদ্মহস্ত, পদ্মভাসিনী প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।[১৫] অর্থাৎ পদ্ম তার পরিচিতি নির্ধারণের বিশেষ অঙ্গ। তার সাথে সম্পৃক্ত পদ্ম মূলত জীবন, প্রজনন ও ভাগ্যের প্রতীক। 'পদ্মপুরান' অনুসারে পদ্ম সৌন্দর্য্য, মঙ্গলময়তা, সমৃদ্ধি প্রভৃতিকে সূচিত করে সেজন্যই তা শ্রীলক্ষ্মীর সাথে সংযুক্ত। আসলে 'শ্রী' ও 'লক্ষ্মী' দুই পৃথক স্বত্বা, 'লক্ষ্মী' সাধারণত সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির দেবী। কিন্তু সৌভাগ্যের সংজ্ঞা আদতে পার্থিব সম্পদ সমৃদ্ধি, ভালো থাকার সঙ্গে জড়িত ফলে সৌভাগ্যের দেবী ক্রমশ সম্পদের দেবীতে রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে 'শ্রী' সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও দীপ্তির প্রতীক এবং সেখান থেকেই সমৃদ্ধির ধারণাটি আসে।[১৬] তবে সাধারণত শ্রী-লক্ষ্মীর রূপতাত্ত্বিক বিকাশ বা উক্ত স্বত্তার আবির্ভাব জনিত আলোচনার পরিসর অত্যন্ত সুবিস্তৃত, কেবল একক ব্যাখ্যা এর অনুধাবনে পর্যাপ্ত নয়। বিভিন্ন প্রাচীন রচনাবলী যথা বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংহিতা, সূত্র সাহিত্য, ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থ, রামায়ন, মহাভারত প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রীলক্ষ্মীর একক ও পৃথক স্বত্তার একাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ উল্লেখ ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান।[১৭] কিন্তু বর্তমান পরিসরে তার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নয় বা বিশেষ প্রাসঙ্গিকও নয় বলেই মনে হয়।

এখন মূল আলোচনা আদি ঐতিহাসিক বাংলায় প্রাপ্ত পোড়ামাটি অবয়বের মধ্যে শ্রীলক্ষ্মীর উপস্থিতি কতখানি যুক্তিপূর্ণ। প্রথমেই উল্লেখ্য এই সমস্ত উপরিল্লিখিত শাস্ত্রবর্ণিত ভঙ্গীতে বাংলার সাধারণ পোড়ামাটি কারিগর শ্রেণী যে বিশেষ পরিচিত ছিলেননা বলা বাহুল্য। এর সাথে প্রযুক্ত প্রাথমিক পর্বের সাধারণ মানুষের চিন্তন, আদর্শ পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত ধর্মচিন্তা অপেক্ষা কার্যত বিচ্ছিন্ন। ফলত তাদের নির্মিত মাতৃ অবয়বে 'শ্রীলক্ষ্মী' স্বত্তার সংযোগের বিষয়টি সম্ভবত অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে ধারণা। ফলত নির্দিষ্ট কোন প্রচলিত ধর্মমতের বিশেষ দেবী রূপে নয় বরং সৌভাগ্য, সম্পদ তথা সমৃদ্ধির আরাধ্যা রূপে, উর্বরতার প্রতীক রূপে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারা গৃহীত হয়েছে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর অবয়বগুলি।

বাংলার বেশ কিছু ক্ষেত্রে এক মাতৃকামূর্তির উপস্থাপনা পাওয়া যায়; সাধারণত কখনো পদ্মে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান রূপে, কখনো হাতে পদ্মনাল সহ তার একাধিক অবতারণা উল্লেখ্য। এইরূপ অবয়বকে **'শ্রীলক্ষ্মী'** রূপে শনাক্ত করে থাকেন বিভিন্ন শিল্প ঐতিহাসিকগণ। নিম্নে চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত একটি নারী অবয়বের উপস্থাপন করা হল যা লক্ষ্মীর সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য কিছু প্রতীককে পরিস্ফুট করে, যেখানে মাছের আকারের ফলকের ওপর প্রস্ফুটিত নারী মূর্তি যিনি ফোঁটা পদ্মের ওপর সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়ান, যার থেকে কুঁড়ি সহ ছটি পদ্মনাল ও প্রস্ফুটিত পদ্মের উত্থান ঘটেছে। দেবীর দুই হাতে দুটি বড় নাল ধরে রয়েছেন, সুগঠিত স্তন ও গুরু নিতম্ব,মুখ কিছুটা ফোলা, বড় বড় চোখ ও মুখে রহস্যময় হাসি। আবার উন্মুক্ত নাভিদেশ ও অলংকৃত কটিবন্ধ যার কিছু অংশ পায়ের মাঝখান দিয়ে ঝোলানো, মাথায় খোঁপা যার থেকে একাধিক বিনুনি ঝুলছে, সঙ্গে নূপুর, বালা, হাতে বাজুবন্ধ দ্বারা সুসজ্জিতা। ফলকটির সীমারেখা ছোট ছোট পুঁতির মত মাটির ডেলা দিয়ে সজ্জিত। (চিত্র নং- ৩) এইরূপ আরও বিবিধ অবতারণা পরিলক্ষিত হয়, কখনো পুষ্প কখনো পক্ষী দ্বারা শোভিত কোথাও আবার দেবী মুদ্রার ওপর দণ্ডায়মান। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য দেবী লক্ষ্মীর সাথে সম্পর্কিত প্রধান প্রতীকী 'পদ্মে'র সংযোগ লক্ষণীয় আদি ঐতিহাসিক বাংলায় উপস্থাপিত বেশ কিছু নারীমূর্তির সাথে যাদের অন্যান্য বাহ্যিক আঙ্গিকের ভিত্তিতে তাকে উপাস্য নারী অবয়ব হিসেবেই অনুমান করা হয়।

কিন্তু আবার পদ্ম সহযোগে দেবীর উপস্থাপনা মানেই যে তা ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি বা উক্ত আদর্শপুষ্ট দেবীর উপস্থাপনা এমনটা হয়তো নিশ্চিত রূপে বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা এইরূপ উপস্থাপনা কিন্তু আলোচ্য সময় পর্বেই প্রথম প্রাপ্তি নয়, ইতিপূর্বেই এই শ্রেণীর পদ্ম সহ নারীমূর্তির উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় হরপ্পা সভ্যতাতেও।[১৮] এখানে ভগবন্ত সহায় (Bhagwant Sahai)[১৯] এর বক্তব্য উল্লেখ্য, তিনি শ্রী লক্ষ্মীর প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে হরপ্পা,

মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত মাতৃকা মূর্তির সাথে তাকে সম্পর্কিত করেছেন। যেখানে প্রাপ্ত সমৃদ্ধ অলংকার, উষ্ণীষ পরিহিতা সুসজ্জিতা মাতৃমূর্তিকে সম্পদ ও সমৃদ্ধির সহিত সম্পর্কিত বলেই অনুমান করেন অর্থাৎ 'সম্পদ', 'সমৃদ্ধি' প্রভৃতি ধারণা মূলগতভাবে সন্নিহিত উক্ত অবয়বের সাথে। নিঃসন্দেহেই এইরূপ অবয়বের বিকাশের পশ্চাতেও সম্ভবত সাধারণ মানুষের প্রাথমিক লোকায়ত ধর্মচিন্তা বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করেছিল আর এই প্রাথমিক চিন্তনের পরিচয় আমরা পাই এজাতীয় শিল্পধারার ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে। ফলত বাংলার ক্ষেত্রেও আদি ইতিহাসিক পর্বীয় এই প্রকার অবয়ব যে বহুলাংশে অনুরূপ ভাবাদর্শগত ছিল অনুমান করাই যায় যেখানে মানুষের দৈনন্দিন সুখ সমৃদ্ধি লাভের আশায় এই জাতীয় অবয়বের উপাসনা করেছে। তবে বলা যাতে পারে লক্ষ্মীর ন্যায় এখানেও পদ্মের উপস্থাপনার কথা, কিন্তু পূর্বেও উল্লিখিত পদ্ম আদতে সার্বিক সমৃদ্ধির প্রতীক। কুমারস্বামীর (A.K.Coomaraswamy) কথায় পদ্মের প্রতীকের সাথে জল সম্পর্কিত, এবং সেকারণেই তা উর্বরতা বা প্রজনন স্বত্তার সহিত জড়িত।[২০] ফলস্বরুপ খুব স্বাভাবিক নিয়মেই তৎকালীন প্রেক্ষাপটেও তা সম্পদ বা সমৃদ্ধির দেবীর সহিত সম্পৃক্ত হয়েছে বলাই যায়। যা হয়তো পরবর্তীতে ক্রমে সময়ের ব্যবধানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সূত্রে ব্রাহ্মণ্য দেবীস্বত্তা বা রূপ অর্জন করেছে। এছাড়া কেবল চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থান বা বাংলাই নয় সমগ্র ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রতীক স্বরূপ মাতৃকা শক্তির আরাধনার জীবন্ত প্রমাণ উক্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে আবিষ্কৃত এজাতীয় অবয়ব সমূহ।

চিত্র -৩ পদ্মসহ দেবী(শ্রী লক্ষ্মী?), চন্দ্রকেতুগড়, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১ম – খ্রিষ্টীয় ১ম শতক, সৌজন্যে, এলোকোয়েন্ট আর্থ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৩

আবার এক শ্রেণীর মাতৃ অবয়ব পরিলক্ষিত হয় যার সাথে শস্য বিশেষত ধানের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত, চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ১ম-২য় শতকের একটি ভগ্নপ্রায় টেরাকোটা ফলকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার ডানপাশে একটি উলঙ্গ নারী অর্ধেক বসা অবস্থায় সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এবং বামপাশে দড়ি দিয়ে বাধা এক গোছা ধানের মঞ্জরীর ওপরে দাড়ানো নারীমূর্তির কেবল পদযুগল পরিলক্ষিত। সম্ভবত উপাসনা সামগ্রীর থালা নিয়ে একটি ছেলে বা বামন দাঁড়িয়ে। যাকে **'ধান্যদেবী'** রূপে কল্পনা করা হয়।[২১] (চিত্র- ৪) এছাড়া আনুমানিক ৩য় খ্রিষ্টাব্দের একটি পোড়ামাটির সীলেও এই একই উপস্থাপনা বিদ্যমান। যেখানে তিনি হেলেনীয় রীতির পোশাক, সমৃদ্ধ অলংকার সহ পাদবেদীতে উৎকীর্ণ, বাম হাত কোমরে এবং ডান হাতে একগুচ্ছ শস্যদানা বা ধান্যমঞ্জরী ধরে রয়েছেন। তার ডান পাশে একজন উপাসকের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত। পাশে ব্রাহ্মী লেখতে দেবীকে 'ধানজয়ী' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[২২] এছাড়াও একাধিক নারী অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় যার সাথে শস্যদানা সম্পৃক্ত রয়েছে। মূলত বৈচিত্র্যপূর্ণ অলংকার ও বস্ত্রাদি পরিহিত দণ্ডায়মান সুসজ্জিত অবয়ব যার মস্তকের কেশবিন্যাশের অঙ্গ স্বরূপ দুপাশে শস্যদানা উপস্থাপিত এবং স্বচ্ছ পোশাকে তার প্রজনন অঙ্গ সুস্পষ্ট। যা সম্ভবত তাকে একাধারে শস্যাদির সংরক্ষণ, উর্বরতা প্রভৃতি চেতনার সাথে সম্পর্কিত করে বলা বাহুল্য। (চিত্র-৫) অর্থাৎ সম্ভবত সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতির বিকাশ বা উৎপাদিত শস্যাদির সংরক্ষণ জনিত চেতনা থেকে মানুষ এজাতীয় অবয়বকে আশ্রয় করছে, মাতৃ শক্তির সাথে উক্ত শস্যকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ কৃষি প্রধান অঞ্চল বা গোষ্ঠীর মধ্যে এই জাতীয় শক্তির উপাসনা বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বলা যায়।

চিত্র নং-৪ ধান্যদেবী, চন্দ্রকেতুগড়, আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ১ম-২য় শতক, সৌজন্যে- ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৯, , চিত্রপত্রাবলী – ৪৪

চিত্র নং-৫ শস্যদেবী/ধান্যদেবী, চন্দ্রকেতুগড়, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক, সৌজন্যে- "এলোকোয়েন্ট আর্থ", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৪

আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালাতে চন্দ্রকেতুগড় সংক্রান্ত সংরক্ষণে একটি নারীমূর্তি রয়েছে যার ডান হাতে ২টি মাছ, পরনে রয়েছে ঘাগরা জাতীয় পোশাক, মাথায় খোপা, বাম হাতটি কোমরে। রাজ্য প্রত্নতত্ত্বশালাতেও এই রূপ ডান হাতে মৎস্য উৎকীর্ণ নারী মূর্তির ভগ্নাংশ পরিলক্ষিত হয়। (চিত্র -৬) মঙ্গলকোটেও এই জাতীয় অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের সাধারণত **'মৎস্য দেবীর'** প্রতিরূপ বলে চিহ্নিত করেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।[২৩] অর্থাৎ এই একাধিক প্রাপ্তি উক্ত প্রতীকী সম্বলিত অবয়বের জনপ্রিয়তাকেই প্রকাশিত করে। সীমা রায় চৌধুরী আবার এইরূপ অবয়বের উল্লেখ করে ভি এস আগরওয়াল এর অনুসরণে তাকে 'বসুধরা' বা বসুধা'' রূপে উল্লেখ করেছেন, যা আসলে ভূ-দেবীর অপর নাম। সাধারণত সমৃদ্ধি,উর্বরতা ও মঙ্গলের চেতনার সাথেই বসুধরার চেতনাও সম্পৃক্ত। মথুরায় আদি ঐতিহাসিক পর্বের বেশ কিছু প্রস্তর ও টেরাকোটা শিল্পে বসুধরার উল্লেখ করেন আগরওয়াল, যদিও শাস্ত্রীয় প্রতীকী ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ না থাকায় অনেকে বর্তমানে তার এই অভিমতের বিরোধীতা করেন।[২৪] আদি ঐতিহাসিক বাংলার ক্ষেত্রেও এই শ্রেণীর অবয়বকে উক্ত নির্দিষ্ট নামে আখ্যায়িত করা যায় কিনা তা সংশয়ের উদ্রেক করে কেননা প্রকৃতই আলোচ্য পর্বে বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পে বসুধরা বা এজাতীয় অভিধার বিষয়টি হয়তো জটিলতাসম্পন্ন। বরং তার পরিবর্তে ব্রতীন্দ্রনাথ বাবু কর্তৃক উল্লিখিত

'মৎস্য দেবী' বা কোন নদী বা জলের সহিত সম্পর্কিত দেবী[২৫] রূপে আখ্যায়িত করার দিকটিই অধিক যুক্তিসম্পন্ন বলে মনে হয়। তবে বাংলায় প্রাপ্ত উক্ত টেরাকোটা অবয়বকে যে নামেই অভিহিত করা হোক সম্পৃক্ত মৎস্য উপস্থাপনাও আদতে মঙ্গলসূচক ধারনার সহিত সম্পৃক্ত থাকায় তা প্রজনন স্বত্ত্বা ও উর্বরতার প্রতীক রূপে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

চিত্র নং-৬ মৎস্য উৎকীর্ণ নারী অবয়ব, চন্দ্রকেতুগড়, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২য়-১ম শতক, সৌজন্যে- এলোকোয়েন্ট আর্থ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩১

সুতরাং সামগ্রীকভাবে বাংলা তথা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কাছে সৌভাগ্য,সমৃদ্ধি বা উর্বরতার প্রতীক স্বরূপ বিভিন্ন মাতৃকাশক্তির আরাধনার দিকটি ক্রমে বিকশিত হয়েছে সন্দেহ নেই। যারা ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পৃথক পৃথক স্বত্তায় পরিগণিত হয়েছে। ফলত উপরিবর্নিত 'ধান্যদেবী', 'মৎস্যদেবী' বা অন্যান্য সকল দেবীস্বত্তা তাদের কিন্তু 'শ্রীলক্ষ্মীর' সহিত জড়িত চেতনার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রূপে পরিগণিত করা চলেনা। লক্ষ করে দেখা যাবে সম্ভবত মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন উপাদান যার ওপর উর্বরতা বা সমৃদ্ধির ধারণা আরোপিত তার সংরক্ষণ, মঙ্গল জনিত চেতনা থেকে এই সম্পদের দেবী, ধান্যদেবী, বা মৎস্য দেবীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ধারণার সম্প্রসারণ ঘটেছে। যারা কেউই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠিত আরাধ্যা শক্তি নয়,[২৬] ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের পূর্বে লৌকিক বিশ্বাস থেকে আদতে মঙ্গলময়তা বা সমৃদ্ধির প্রতীক স্বরূপ সাধারণ মানুষের উপাসনার অঙ্গ হিসেবে এজাতীয় স্বত্ত্বা বা অবয়বের বিকাশ ঘটেছে। পাশাপাশি বলা চলে স্থান কাল ক্ষেত্র ভেদে মানুষের আরাধ্য দেবদেবী বা পূজিত শক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে, স্থানীয়

ভিন্ন ভিন্ন নামে উপাসিত হয়ে থাকেন। সুতরাং বহুক্ষেত্রে একই স্বত্তার বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় ভারতীয় ইতিহাসে। ফলস্বরূপ স্বাভাবিক নিয়মেই শিল্প, স্থাপত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে বিচিত্র। যাইহোক, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে হয়তো অনুমান করা চলে ক্রমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আবির্ভাব সূত্রে উক্ত সংস্কৃতির সহিত বঙ্গীয় আদর্শের পারস্পরিক সমন্বয়সাধনের ফলে ক্রমে এসকল লৌকিক দেবী বৃহত্তর ব্রাহ্মণ্যচিন্তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে উক্ত সমৃদ্ধির দেবী 'লক্ষ্মীর' স্বত্তার সাথে একীভূত হয়েছে এবং সমপ্রক্রিয়ায় তাদের কিছু কিছু প্রতীকও যেমন- শস্য (ধান), পদ্ম প্রভৃতি লক্ষ্মীর ধারণার সহিত সম্মিলিত হয়েছে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলেও এই অভিযোজন প্রক্রিয়া কবে সম্পন্ন হয় নিশ্চিত রূপে বলা মুশকিল, কেননা উপরে 'ধান্যদেবীর' উল্লেখ প্রসঙ্গে আলোচ্য সীলমোহরের সময়কাল আনুমানিক ৩য় খ্রিষ্টাব্দ অথচ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে মানুষের আগমন বা বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে বহিরাগত প্রভাবের নিদর্শন মেলে তার অনেক আগে থেকেই ফলস্বরুপ তা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য কালেও বহুকাল ব্যাপী বাংলার নিজস্ব ধর্মভাবনার অস্তিত্বের দিকটিকে চিহ্নিত করে বলা চলে।

আদি ঐতিহাসিক বাংলার পোড়ামাটি শিল্পে উপস্থাপিত অন্যতম প্রধান উপস্থাপনা **'যক্ষ-যক্ষী'** মূর্তি। চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ বাংলার প্রায় প্রতিটি প্রত্নস্থলে বিশেষভাবে এজাতীয় মূর্তির অবতারণা পরিলক্ষিত হয় যা খুব স্বাভাবিক রূপেই সমকালীন সমাজে এই ধারার জনপ্রিয়তা বা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানটিকে নির্দেশিত করে। বিশেষ ভাবে শুঙ্গপর্ব থেকে এই শৈলীর বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, শুধু বাংলা নয় উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন প্রত্নস্থলগুলি কিন্তু এই শৈলীর সাক্ষ্য বহন করে যা সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার পারস্পরিক সংমিশ্রণের ইঙ্গিতবাহী সন্দেহ নেই। তাদের মধ্যে এক অলৌকিক শক্তি থাকে, কখনো তা শুভফলদায়ী কখনো আবার তারা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এই যক্ষ শব্দের একাধিক উল্লেখ রয়েছে; অথর্ব বেদে বলা হয় 'ইতরজনা', শাংখ্যায়ন, পরাসকর প্রভৃতি গৃহ্যসূত্রে এদের প্রধান দেব দেবীর সেবক রূপে গন্য করা হয়ে থাকে, শতপথ ব্রাহ্মণ অনুসারে যক্ষরাজ কুবের দুর্বৃত্তদের প্রধান।[২৭] এছাড়াও আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যক্ষ সম্প্রদায়ের (cult) উল্লেখ রয়েছে, কখনো বিস্ময়কর বিষয়, কখনো অতিপ্রাকৃত জীব, আত্মার মূর্ত প্রকাশ, অর্ধ ঐশ্বরিক দেবতা প্রভৃতি রূপে গন্য করা হয়ে থাকে।[২৮]

এই যক্ষ-যক্ষী ধারা সাধারণত সম্পদ এবং প্রজনন সত্ত্বার সহিত সম্পর্কিত। বাংলার প্রায় সকল প্রত্নস্থল তো বটেই কিন্তু বিশেষত চন্দ্রকেতুগড়ে টেরাকোটা শিল্পের বিপুল সমৃদ্ধির সিংহভাগ বহন করে যক্ষিণী অবতারণা। সাধারণত একটি যক্ষী সমপদদস্থানক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান থাকে, এক

হাত দেহ সংলগ্ন ভাবে ঝোলানো অপরটি কোমরে, স্পষ্ট উন্মুক্ত নাভীদেশ, জাঁকজমক পূর্ণ পরিধান, অলঙ্কারের আধিক্য যথা পুষ্পশোভিত কানের দুল, জাঁকজমকপূর্ণ কোমর বন্ধ, বাজুবন্ধ, মালা প্রভৃতি উল্লেখ্য। এছাড়া বিশেষত উল্লেখ্য অধিকাংশ অবয়বের এর সাথে থাকে কেশ সজ্জার অঙ্গরূপে পাঁচটি শলাকা যার অগ্রভাগে রয়েছে অঙ্কুশ, ত্রিশূল, কুঠার, বজ্র ও ধ্বজা যেকারণে সে 'পঞ্চচূড়া যক্ষী' নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। যা প্রাপ্ত এজাতীয় অবয়বের ক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী রূপে পরিগণিত বলা যায়, আদি ঐতিহাসিক পর্ব জুড়ে সমগ্র ভারতের পোড়ামাটি ও প্রস্তর শিল্পধারায় বিভিন্ন ধাঁচের বিভিন্ন ভঙ্গীতে যক্ষিণী মূর্তির অবতারণা পরিলক্ষিত হয়। মহাস্থানগড়, তমলুক, চম্পা, কৌশাম্বী, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত একাধিক যক্ষিণী মূর্তিতে ৫টি শলাকা মাথার একপাশে এবং অপর পাশে শস্যদানা সম্বলিত অবয়ব পরিলক্ষিত। তবে কখনো আবার ৬টি আয়ুধও পরিলক্ষিত, যার অগ্রভাগে থাকে বান। চন্দ্রকেতুগড়ে আবার ১০টি চূড়া সম্বলিত কিংবা উভয় পার্শ্বে উপরিল্লিখিত ৬টি করে মোট ১২টি চূড়া সহ যক্ষিণী মূর্তিরও সন্ধান মেলে যা তার নিজস্ব ধারার প্রতীক, পরবর্তী অধ্যায়ের 'স্থানীয় তারতম্য' শীর্ষক ছত্রে এই প্রতীকী সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত। কেশ সজ্জায় এইরূপ আয়ুধের উপস্থিতি প্রমাণ করে এই দেবী কেবল সম্পদ বা সমৃদ্ধির দেবী নন পাশাপাশি তিনি সম্ভবত তার আরাধকের রক্ষাকর্ত্রী ও শক্তি প্রদানকারীও বটে। পরবর্তীতে এই আয়ুধগুলি ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যেই সংযোজিত হতে দেখা যায় যেমন - ইন্দ্রদেবের সহিত বজ্র, গনেশের কুঠার, শিবের সাথে ত্রিশূল, কামদেবের সহিত বাণ বা তীরের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতে এই আয়ুধগুলি সপ্তমাতৃকারও আয়ুধ রূপে পরিগণিত হয়।[২৯] অর্থাৎ লৌকিক উপাদানের ক্রমে ব্রাহ্মণ্য অবয়বের সহিত অভিযোজনের যে নিদর্শন প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসে মেলে, যক্ষিণী অবয়বের আয়ুধের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে সংযোজন উক্ত প্রক্রিয়ারই অংশবিশেষ কিনা উক্ত অনুমান হয়তো করা চলে। এছাড়াও বিভিন্ন সংগ্রহালয়ের রক্ষিত অবয়ব ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থের ক্যাটালগগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে আরও বিভিন্ন ভঙ্গিমায় যক্ষিণী মূর্তির উপস্থাপনা বাংলার টেরাকোটা শিল্পকে সমৃদ্ধি প্রদান করে এসেছে সর্বদা। কখনো যক্ষীর একক উপস্থাপনা কখনো তার সহকারীদিগের উপস্থিতি লক্ষনীয় তবে মূল কেন্দ্রীয় যক্ষী অবয়ব অন্যান্য উপস্থাপিত অবয়বের তুলনায় সাধারণত বৃহৎ আকৃতি সম্পন্ন থাকে। এছাড়া সঙ্গে পাখা,দর্পন, ছাতা বা উপাসক মণ্ডলী দৃশ্যমান, দেবী কখনো প্রস্ফুটিত পদ্মে কখনো মুদ্রায় কখনো বা জলের উপর দণ্ডায়মান থাকেন ; আবার মাথার পেছনে থাকে প্রভামন্ডল – এসকল উপস্থাপনা তাকে দৈবিক শক্তির অধিকারিণী রূপেই তুলে ধরে বলা বাহুল্য।

চন্দ্রকেতুগড়ে একটি ফলকে যক্ষিণীর সাথে ময়ূর ও ভারবাহক উপস্থিত আবার অন্যত্র সহকারী সহ দশচূড়া যক্ষী মূর্তি পাদবেদীতে দণ্ডায়মান যার ডান দিকে ওপরে চৌরিবাহক, নীচে কোন ব্যাক্তি তার থেকে কোন উপঢৌকন গ্রহণ করছে, বাম পার্শ্বে আবার কেউ তার উপাসনায় রত এইরূপ দৃশ্য পরিলক্ষিত।[৩০](চিত্র নং-৭) মহাস্থানগড়েও এরূপ অবয়বের সন্ধান মেলে, পঞ্চচূড়া সহ সমৃদ্ধ বস্ত্র ও অলংকারে সুসজ্জিতা যক্ষিণী মূর্তি যার বাম হাত কোমরে এবং ডান হাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম সহ দন্ডায়মান। (চিত্র নং-৮)এছাড়া মঙ্গলকোট ,তিলপি, তমলুক প্রভৃতি প্রায় সর্বত্রই এইরূপ যক্ষিণী মূর্তি দৃশ্যমান। আবার চন্দ্রকেতুগড়ের একাধিক যক্ষী মূর্তিতে পায়ে সুস্পষ্ট রূপে পাদুকার উপস্থিতি লক্ষণীয় যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেননা এই রীতি হয়তো হেলেনীয় প্রভাবের ইঙ্গিতবাহী, ভারতীয় দর্শনে ঐশ্বরিক মূর্তিতে পাদুকার উপস্থাপনা বিরল। (চিত্র নং-৯) সুতরাং প্রাচীন সমাজে উপাসনার অঙ্গ স্বরূপ নারীশক্তি বা মাতৃকাশক্তির আরাধনার দিকটি কিন্তু প্রকাশিত হয় উপরিউক্ত বিবিধ অবয়ব সমূহের মধ্য দিয়ে। সমাজে আদতে সমৃদ্ধি ও উর্বরতার প্রতীক স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে নারীদেহে ভিন্ন ভিন্ন স্বত্তা বা প্রতীকীর কল্পনা করা হয়েছে যা শিল্পীর কর্মদক্ষতা ও চিন্তনশক্তির সমন্বয়ে বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

৭

৮

চিত্র নং-৭ যক্ষিণী মূর্তি, চন্দ্রকেতুগড়, আনুমানিক ১ম খ্রিষ্টপূর্বাব্দ – ২য় খ্রিষ্টাব্দ সৌজন্যে- এলোকোয়েন্ট আর্থ , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৪

চিত্র নং-৮ যক্ষিণী মূর্তি, মহাস্থানগড়, সময়কাল মোটামুটি ৩য় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ/ ২য় খ্রিষ্টপূর্বাব্দের প্রাথমিক পর্যায়, সৌজন্যে- ফ্রেঞ্চ বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশনস্ অ্যাট মহাস্থানগড়ঃ ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট, ১৯৯৩-১৯৯৯,পৃষ্ঠা-১০৪

৯

চিত্র নং-৯ চটি পরিহিতা যক্ষী , সৌজন্যে, চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় সংগ্রহালয় , ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত

তবে বর্তমানে কোন কোন গবেষক বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত এইসকল বিপুল ধাঁচের মাতৃকা অবয়বকে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যখ্যা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শিবানী আগরওয়াল হরপ্পায় প্রাপ্ত নারীমূর্তির অনুসরণে বাকি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ঐজাতীয় অবয়বকে ‘মাতৃকা শক্তির’ অভিধায় ভূষিত করার ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন উক্ত অবয়বগুলিকে সাধারণত মাতৃদেবী রূপে অভিহিত করা হয় কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যথা- অতি সাধারণ নিরালঙ্কার মূর্তি, হস্ত নির্মিত উৎপাদন পদ্ধতি, কিছুটা অপরিনত বা স্থূল চেহারা, অনাবৃত বা নগ্ন উপস্থাপনা এবং যেহেতু ব্রাহ্মণ্য দেবীদের আবির্ভাবের পূর্বে এদের বিকাশ ঘটে সেকারণে এসকল বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তাকে পৌরাণিক দেবীদের পূর্বসূরি বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এসকল যুক্তির বিরদ্ধে বেশ কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেন যথা- প্রথমত সমস্ত মাতৃকা মূর্তি উপরিউক্ত দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী নন, সব কখনোই কেবল হাতে গড়া নয় এক বা একাধিক ছাঁচের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় আবার সেগুলি সবই অপরিণত বা সাধারণ জাঁকজমকহীন মূর্তি নয় বরং বহুক্ষেত্রে সেগুলি নানাবিধ বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটায়। বিশেষত পঞ্চচূড়া বা দশচূড়া উষ্ণীষ, জাঁকজমকপূর্ণ অলংকার সহ যক্ষী মূর্তিগুলি মাতৃকাদেবীর মধ্যে অন্যতম যার সাথে

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য প্রায় মেলেনা বললেই চলে। এছাড়াও যে নিরাবরণ দৈহিক অবয়বের কথা বলা হয়ে থাকে দৈব শক্তির আধার রূপে, সেক্ষেত্রেও শ্রীমতী আগরওয়াল মন্তব্য করেন মূর্তিগুলি যে প্রকৃতই অনাবৃত ছিল এমন নাও হতে পারে হয়তো বা উপস্থাপিত বেল্ট ও কটিবন্ধ নিম্নাঙ্গের কোন বস্ত্রের ইঙ্গিত দেয়, প্রস্তর শিল্পে যেমন অতি স্বচ্ছ বস্ত্রের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় যার মধ্য দিয়ে দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্পষ্ট রূপেই পরিলক্ষিত হয় উক্ত কোন ধারনার উপস্থিতির অনুমান করেন তিনি। আবার বহু ক্ষেত্রে টেরাকোটায় উপস্থাপিত লৌকিক দেবদেবীগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবতাদের সাথে পরিলক্ষিত হয় ফলে সেগুলি কিভাবে তাদের পূর্বসূরি হওয়া সম্ভব সেদিকটিও উল্লেখ করেছেন তিনি। এই সমস্ত বিভিন্ন যুক্তির উপস্থাপনা করে শ্রীমতী আগরওয়াল দীর্ঘকাল ব্যাপী একপেশে ভাবে চলে আসা প্রচলিত মতাদর্শের বাইরে ভিন্নরূপে ভাবনার ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেছেন অবশ্যই এগুলির ধর্মীয় উদ্দেশ্য থাকতে পারে কিন্তু তাবলে সমস্ত কালের সকল এই জাতীয় টেরাকোটা নারীমূর্তি গুলিই যে একই উদ্দেশ্য পূরণ করে এমনটা কখনোই নয়, এর সহিত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির যোগসূত্র থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়।[৩১]

যথার্থই তার এই বক্তব্যগুলি পুনরায় টেরাকোটা শিল্প ইতিহাসকে কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে বা ভাবনার অবকাশ তৈরি করে দেয়। তবে পাশাপাশি এজাতীয় চর্চার সাথে তৎকালীন সময়কাল, টেরাকোটার প্রাপ্তিস্থান ও তার সহিত সম্পৃক্ত সমাজ, শিল্পঅবয়ব সমূহের ব্যপ্তি, প্রবহমানতা, তার পশ্চাতে নিহিত সাধারণ জনগণের মানসিকতা প্রভৃতি দিকগুলিও অতি সচেতনভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। কেননা বিপুল শ্রম ও অর্থব্যায়ে দীর্ঘকাল ব্যাপী যে অবয়ব গড়ে উঠেছে তার পশ্চাতে নিহিত কারণ কেবলই নান্দনিকতা বা শিল্পচর্চার অংশ ছিল এমনটা মনে করা ততখানি সহজ হতে পারেনা। জাঁকজমকপূর্ণ যে যক্ষিণী বা অন্যান্য নারী অবয়বের বিকাশ ঘটেছে তার পশ্চাতে বিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে মানুষের চাহিদা, আদর্শ, রুচিতেও পরিবর্তন এসেছে সেকথা ভুললে চলবেনা। প্রাথমিক পর্বে যেখানে প্রজনন স্বত্তার বিকাশ স্বরূপ নগ্ন নারীমূর্তির উপাসনা প্রধান, পরবর্তীতে হয়তো উক্ত চেতনাকে অক্ষত রেখে তার মধ্যে বিশেষীকরণ অর্থাৎ সম্পদের সংরক্ষণ, শস্যের সংরক্ষণ, শিশুর সংরক্ষণ ইত্যাদি পৃথক পৃথক চেতনার বিকাশ ঘটেছে এবং সেইমত ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের অবয়বেরও বিকাশ ঘটেছে কারিগরদের হাত ধরে। তাছাড়া প্রাথমিক পর্বের নগ্ন অবয়বের স্থলে ক্রমে যে অলংকৃত, বস্ত্র পরিহিত অবয়বের বিকাশ ঘটেছে তা হয়তো উক্ত প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তার চরিত্রায়ন বা তার ওপর দেবত্ব আরোপের ক্ষেত্রে প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে প্রজননের পাশাপাশি বস্তু উপাদান অর্থাৎ সম্পদ, সমৃদ্ধি, অর্থও তাৎপর্যপূর্ণ চাহিদা হয়েছে মানুষের

কাছে ফলত উক্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণে আরাধ্যা দেবীও অলংকৃত, সুসজ্জিত রূপেই বিকাশ লাভ করেছে। তবে এই অবয়বগুলি নিশ্চিত রূপেই ঠিক কি উদ্দেশ্যে তৈরি অর্থাৎ তা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার হত কিনা বা কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের উপাসনার অঙ্গ ছিল কিনা তা নিয়ে দ্বিধা প্রকাশ করা গেলেও সামগ্রীকভাবে তৎকালীন গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে এই নির্ধারিত অবয়ব সমূহের বিপুল জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই।

তবে শুধু যক্ষিণী নয়, যক্ষ উপস্থাপনাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যিনি মূলত সম্পদের সহিত সম্পর্কিত। জাঁকজমকপূর্ণ, ঐশ্বর্যপূর্ণ আবার কিছুটা অদ্ভুত, কিম্ভূতকিমাকার খর্বকায় অবয়ব প্রাচীন ভারতীয় বাংলার টেরাকোটা শিল্পে উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা। এই ধরণের মূর্তির মধ্যে অন্যতম যক্ষরাজ **কুবের**; মেদবহুল স্থূলকায় উদর, উঁচু পাগড়ি, বড় কানের দুল, বালা, মালা, উন্মুক্ত কাঁধ, হাতে গোলাকার বাতাপিলেবু জাতীয় উপাদান আবার কখনো পদ্ম কখনো বা পক্ষী, সঙ্গে টাকার থলি ও পানপাত্র এবং কখনো ঊর্ধ্বলিঙ্গ(Ithiphalic) উপস্থানায় ভূষিত তিনি। তাদের মেদবহুল পেট শক্তি ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। (চিত্র নং-১০) আবার কোনও মূর্তিতে তিনি স্থূল উদর, অর্থের ঝুলি ও পানপাত্র সহ হাতে সাপ বা বেজীর লেজ ধরে আছেন। বৌদ্ধ সম্পদের দেবী জাম্বালা এইরূপ স্থূল উদর, লেবু জাতীয় উপাদান ও বেজী সম্বলিত প্রতীকী বহন করেন, চন্দ্রকেতুগড়ে একটি এজাতীয় অবয়বের সহিত ত্রিরত্ন লকেটের সন্ধান মেলে যা থেকে তাকে বৌদ্ধ দেবী জাম্বালার উপস্থাপন বলে অনুমান করা হয়ে থাকে।[৩২] চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থান সহ বাংলার বহু ক্ষেত্রেই বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সম্পর্কিত একাধিক প্রত্নদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, ফলত আলোচ্য অবয়বটিও যে বৌদ্ধ দেবীর প্রতিরূপ হওয়া সম্ভব অস্বীকার করা চলেনা। বহুক্ষেত্রে আবার ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর সাথে কুবেরের সংযোগ উপস্থাপিত হয়। মোটামুটি কুষান পর্ব থেকে কিছু কিছু স্থাপত্যে লক্ষ্মীর সাথে তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, পরবর্তীতে গুপ্ত পর্বীয় সীলমোহর এও কুবের ও লক্ষ্মীর একত্র উপস্থাপনা বিশেষ লক্ষণীয়।[৩৩] ইতিপূর্বেই যার উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতের কিছু কিছু অংশে যেখানে দেবী লক্ষ্মী তার সঙ্গিনী হিসেবে বর্ণিত। ধনসম্পদের দেবতা কুবেরের সহিত সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীর এই সম্মিলন হয়তো সহজেই অনুধাবনযোগ্য।[৩৪]

চিত্র নং- ১০ যুগ্ম বা ডবল ছাঁচ নির্মিত কুবের, চন্দ্রকেতুগড়, আনুমানিক ১ম-৩য় খ্রিষ্টাব্দ, সৌজন্যে- 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ১০৮

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় এখানে বিস্তৃত অংশ জুড়ে বিদ্যমান রয়েছে দেবীমূর্তি বা যক্ষী মূর্তিগুলি যা সমাজে নারী সম্পর্কিত উপাসনার দিকটিকে প্রকাশিত করে । নারীর সর্বাধিক পরিচিত ভূমিকা সে প্রজনন স্বত্তার প্রতীক রূপে পরিগণিত, এক্ষেত্রে চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত একপ্রকার উপস্থাপনা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে যেখানে সন্তান প্রসব ভঙ্গিতে উপস্থাপিত একটি নারী অবয়ব পরিলক্ষিত হয় যাকে সাধারণভাবে **'লজ্জাগৌরী' বা 'অদিতি উত্থনপদ'** বলে অভিহিত করা হয়। (চিত্র নং- ১১) কমবেশি সূক্ষ্ম পার্থক্যে এজাতীয় অবয়ব ভারতের প্রায় অধিকাংশ প্রত্নস্থলেই পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণত অন্যত্র এই অবয়বের মুখমণ্ডল পদ্ম বা অন্য পুষ্প মোটিফ সম্বলিত থাকে একমাত্র চন্দ্রকেতুগড়ে তা মানব মুখাবয়বের অধিকারী যা ঐতিহাসিকদের নিকট এর আকর্ষণ বহু গুনে বৃদ্ধি করে। তবে আবার চন্দ্রকেতুগড়েই প্রাপ্ত সমগোত্রীয় অপর এক অবয়বে মুখমণ্ডলের অংশে উদ্ভিজ্জের ন্যায় উপস্থাপনা রয়েছে, এছাড়া বাকি দৈহিক উপস্থাপনা পূর্বের ন্যায় সন্তান প্রসব ভঙ্গী। ফলত এর সাথে নিঃসন্দেহে মঙ্গলচিন্তা বা উর্বরতা চেতনা জড়িত ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে, যেখানে সম্ভবত প্রজনন শক্তির প্রতীক স্বরূপ বা সন্তান জন্মের সহিত সম্পর্কিত নানান আচার বিধির অঙ্গ হিসেবে এইরূপ অবয়বকে গ্রহণ করা

হয়েছিল।[৩৫] কিংবা নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান কামনায় গৃহে শুভ প্রতীক হিসেবে এই ধরণের অবয়বের সংরক্ষণও খুব স্বাভাবিক ভাবেই কাম্য।

চিত্র নং-১১ লজ্জাগৌরী,ছাঁচ নির্মিত অবয়ব, চন্দ্রকেতুগড়, ১ম খ্রিষ্টপূর্বাব্দ – ৩য় খ্রিষ্টাব্দ, সৌজন্যে-এলোকোয়েন্ট আর্থ,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৪৭

এই বিপুল নারী অবয়বের পাশাপাশি চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত একটি অবয়বের উল্লেখ করা চলে যার সময়কাল আনুমানিক ১ম-২য় শতক। এখানে সম্ভবত বাঘের পিঠে সুসজ্জিত ও অলংকৃত এক নারী এবং পুরুষ একত্রে উপবিষ্ট, উভয়ের হাতেই অস্ত্র জাতীয় উপাদান বিদ্যমান এবং এই অবয়বটি উপস্থাপিত এক মন্দির ন্যায় কাঠামোর মধ্যে। (চিত্র-১২) এই মন্দির ন্যায় কাঠামো বা মূর্তি গুলির দৈহিক উপস্থাপনা কিংবা বাঘের ন্যায় পশুর পিঠে তাদের প্রতিকৃতি সবকিছু নিঃসন্দেহে তাদের সহিত সম্পৃক্ত কাল্ট সংযোগের দিকটিকে পরিস্ফুট করে তোলে।[৩৬] হতে পারে কোনও দৈবিক দম্পতি রূপে তৎকালীন মানুষ এই ধরণের অবয়বের উপাসনা করতেন, যার পশ্চাতে সম্ভবত কিছু প্রতিরক্ষা জনিত চেতনা সম্পৃক্ত থাকতে পারে। কেননা অবয়বে দম্পতির বাহ্যিক আঙ্গিক অর্থাৎ অস্ত্র সহ উপস্থাপনা ঐরূপ ইঙ্গিতই প্রদান করে বলে মনে হয়। এছাড়া মন্দিরের ন্যায় কাঠামোর অন্তর্ভুক্তিও বিশেষ উল্লেখ্য, যা হয়তো উক্ত প্রকৃতির অবয়বের কোন

মন্দির উপাসনার সহিত সংযোগের দিকটিকেও প্রস্ফুটিত করে। ফলত লোকায়ত ধর্মচিন্তার প্রকাশ এখানে তাৎপর্যপূর্ণ, প্রতীকী ঐতিহ্যের বিচারে যা অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে।

চিত্র নং-১২ ব্যাঘ্র পিঠে উপবিষ্ট দম্পতি, চন্দ্রকেতুগড়, ১ম-২য় খ্রিষ্টাব্দ, সৌজন্যে- 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬০

উপরিউক্ত বিস্তীর্ণ অবয়ব ছাড়াও কিছু পুরুষ অবয়বের নিদর্শন মেলে বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে যাদের সাথে উপস্থাপিত প্রতীক বা আঙ্গিকের ভিত্তিতে তাদের ধর্মীয় কর্মকান্ডের অংশ রূপেই অনুমান করা হয়ে থাকে। যেমন প্রথমেই বলা চলে চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ বেশ কিছু প্রত্নস্থলে স্বপক্ষ পুরুষ মূর্তির সন্ধান মেলে ।(চিত্র -১৩) তারা কখনো পুষ্পের ওপর দণ্ডায়মান বা পুষ্পশোভিত রূপে, উষ্ণীষ সহ একাধিক সমৃদ্ধ অলংকারে ভূষিত। এই উপস্থাপন রীতি নিশ্চিত রূপেই তাদের কোন ঐশ্বরিক শক্তি রূপে উপস্থাপিত করে যার পরিচয় ইতিপূর্বে নির্ধারিত নয়।

তাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিচয়ে যথা- গান্ধর্ব্য, দেবপুত্র, বা সূর্য রূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে।[৩৭]

সেই প্রসঙ্গে বলা চলে বাংলার পোড়ামাটি শিল্পে বর্ণিত দেবমূর্তির মধ্যে অন্যতম **'সূর্য'** উপস্থাপনা। বিভিন্ন রূপে সৌর উপাসনার ইঙ্গিত প্রতিকায়িত হয় নানান প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পোড়ামাটি শিল্পসাক্ষ্যের মাধ্যমে। বাংলা এবং উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত স্বপক্ষ পুরুষ মূর্তিগুলি সাধারণত সঙ্গে পদ্ম বা দুই হাতে পদ্মের নাল এবং ২টি পাখা যাকে আপাত দৃষ্টিতে আকাশে চলমান ও প্রাণের উৎস সূর্য রূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঋগ্বেদের উল্লেখ করে বলেছেন , ঋগ্বেদে সূর্যকে "স্বর্গীয় এবং সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু তার দ্বারা এজাতীয় মূর্তি প্রভাবিত ছিল কিনা তা নিশ্চিত রূপে বলা মুশকিল। আবার উত্তর ভারতীয় ধারায় ঘোড়ায় টানা রথে উপবিষ্ট সূর্য মূর্তিও আদি ঐতিহাসিক বাংলার পোড়ামাটি শিল্পে পরিলক্ষিত হয়।[৩৮] বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্বশালার সংগ্রহালয়ে বাংলায় প্রাপ্ত এই জাতীয় অবয়বের উপস্থিতি রয়েছে যেখানে সূর্য দেবতা তার দৈব রথে দণ্ডায়মান, তার দুই পাশে ২জন নারী মূর্তি সম্ভবত উষা এবং প্রত্যুষা; যেখানে অন্ধকারের প্রতীক স্বরূপ এক দৈত্যের উপস্থিতি লক্ষণীয় যে আলোর দীপ্তির অধীশ্বর সূর্য দেবের ঐশ্বরিক রথের তলায় পদদলিত।(চিত্র-১৪) যা প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের পাশাপাশি একাধারে শিল্পীদের গভীর মনন বা দর্শনের ইঙ্গিত দেয় সন্দেহ নেই। তবে কুষান পর্বে এই পুরুষের দৈহিক উপস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন আসে ; পাখা বিলুপ্ত হয়, দেহে কুষান বস্ত্রাদি, পায়ে বুট জুতো, হাতে পদ্মের নাল সহ উপস্থাপিত হয়। আবার পাল সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ধারায় তাকে খালি গায়ে উপস্থাপন করা হয়।[৩৯] মহাস্থানে এরূপ ৭ম-৮ম শতাব্দী কালীন কিছু সূর্য মূর্তির সন্ধান মেলে।[৪০] অর্থাৎ ক্রমশ সময়ের সাথে সূর্য অবয়বের সহিত জড়িত প্রতীকী বা তার রূপগত বিবর্তন ঘটেছে, প্রাপ্ত বিভিন্ন ধাঁচের এই পোড়ামাটি অবয়বগুলি উক্ত ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রটিকে নির্দেশিত করে। এক্ষেত্রেও সম্ভবত ক্রমে পারস্পরিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের দিকগুলি কার্যকর ছিল বলে অনুমান করা চলে। সবমিলিয়ে বাংলায় অতি প্রাচীন পর্ব থেকেই সৌর সম্প্রদায় বা সূর্য উপাসনার প্রচলন এবং তার ধারাবাহিক প্রবাহমানতার দিকটিও কিন্তু স্পষ্ট রূপেই পরিস্ফুট হয়।

১৩

১৪

চিত্র নং-১৩ ডানা যুক্ত অবয়ব, মহাস্থান, আনুমানিক প্রথম খ্রিষ্টপূর্বাব্দ (উৎখনন স্তর-7B), সৌজন্যে- মহম্মদ শফিকুল আলম ও Jean-Francois SALLES সম্পাদিত "ফ্রান্স বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়", ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট ১৯৯৩-১৯৯৯, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি,বাংলাদেশ, ২০০১ পৃষ্ঠা- ১১৮

চিত্র নং-১৪ ঘোড়া বাহিত রথে উপবিষ্ট সূর্যদেব, চন্দ্রকেতুগড়, ১ম-৩য় খ্রিষ্টাব্দ, সৌজন্যে- 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-১৭৫

এরপর আসা যাক হস্তীমুখ সম্পন্ন কিছু অবয়বের উপস্থাপনার কথায়, যার সাথে ব্রাহ্মণ্য দেবকূলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেবতা গনেশ বা গণপতির কিছু সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আদি ঐতিহাসিক বাংলায় উক্ত অবয়বের উপস্থিতির দিকটি বহুলাংশে অনিশ্চিত, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে এসময় প্রাপ্ত হস্তীমুখ সম্পন্ন অবয়বগুলি গনেশের আদর্শের সাথে জড়িত ছিল কিনা তা বলা মুশকিল। কুবেরের ন্যায় স্থূলকায় উদর এবং সঙ্গে হস্তীর ন্যায় মুখাবয়ব ব্রাহ্মণ্য গনেশের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এইরূপ দৈবিক উপস্থাপনা মোটামুটি গুপ্ত যুগের পূর্বে পরিলক্ষিত হয়না।[৪১] যদিও হস্তী মুখ সম্পন্ন একাধিক অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় আদি ঐতিহাসিক পর্বের চন্দ্রকেতুগড়ে, বিভিন্ন সংগ্রহালয়গুলিতে যার নিদর্শন বিদ্যমান।(চিত্র নং-১৫) যেখানে অতি দক্ষতার সহিত সেগুলিকে সাধারণ হস্তী উপস্থাপনার থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমী রূপে তুলে ধরা হয়েছে। আবার ব্রতীন্দ্রনাথ বাবু উল্লেখ করেন মানুষের হাত পা সমেত হস্তী মুখাবয়ব সম্পন্ন একটি মূর্তি মেলে যেখানে তার শুঁড়ের সম্মুখভাগ মানবীয় জননেন্দ্রিয়র মত, তাহলে সেটি কি বাংলার কোন

হস্তীমুখ দেবতার রূপ যা পরে ব্রাহ্মণ্য গণেশের রূপের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় ?[৪২] যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে কি অনুমান করা চলে গনেশের সহিত সম্পৃক্ত তার প্রধান প্রতীকী স্বরূপ 'হস্তীমুখাবয়ব' এর উপস্থাপনা আদতে লৌকিক সংস্কৃতির উপাদান যা ব্রাহ্মণ্য সিদ্ধিদাতা দেবতা গনেশের সাথে সংযুক্ত হয়ে তার প্রচলিত রূপ লাভ করেছে ? কেননা আমরা জানি মোটামুটিভাবে গুপ্তযুগের পূর্বে গণেশের উপস্থিতির বিষয়টি সংশয়াত্মক। কিন্তু সেক্ষেত্রে বাংলায় উপরিউক্ত হস্তীমুখ সম্পন্ন অবয়ব সমূহের বিশেষ উপস্থিতি কি তাহলে ঐশ্বরিক শক্তি রূপে ক্রমে গনেশ দেবতার সহিত সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণার বিকাশ ঘটায়? সেই প্রশ্নগুলি হয়তো রয়েই যায়। এছাড়া যদিও বর্তমানে মূল আলোচ্য কেন্দ্র চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থান কিন্তু কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত তমলুক থেকে প্রাপ্ত একটি অবয়ব এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যেখানে হস্তীদেবতা তার মানবীয় নারী সঙ্গিনীর সাথে উপস্থাপিত, যিনি তাকে লাড্ডু পরিবেশন করছেন এই সমগ্র বিষয়টিকে এক ধর্মীয় উপস্থাপনার ইঙ্গিতবাহী রূপে গন্য করে থাকেন নানান গবেষক।[৪৩] (চিত্র নং-১৬)

(১৫)

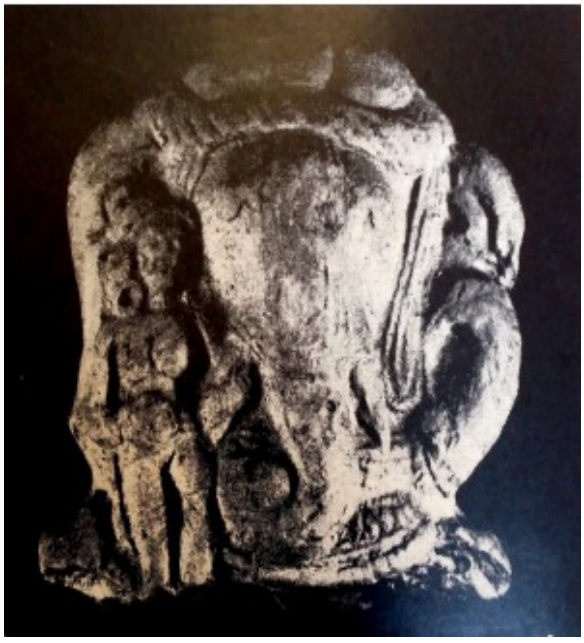

(১৬)

চিত্র নং-১৫ হস্তীমুখ সম্পন্ন অবয়ব, সৌজন্যে, চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় সংগ্রহালয়, ব্যাক্তিগত চিত্র সংগ্রহ

চিত্র নং-১৬ মানবীয় সঙ্গিনীর সহিত হস্তী অবয়ব, তমলুক, খ্রিষ্টীয় ১ম শতক, সৌজন্যে- এস এস বিশ্বাস , 'টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল' , আগম কলা প্রকাশনী, দিল্লী ১৯৮১, (Plate xb)

চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত একটি তাৎপর্যপূর্ণ মূর্তি এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখ্য, যার ওপরের দিকটি ছুঁচালো সাপের মাথার মত,তার ছোট বিন্দুর মত চোখ ২টি একত্রে সাপ ও মানুষের চোখ রূপে কল্পনা করা যায়। এর নীচে কিছু সমান্তরাল রেখা ও ক্রমশ আয়তাকার অংশের আরম্ভ যার ওপর ২টি গোলাকার মাটির বৃত্ত মানবীয় স্তনযুগলের পরিচায়ক, এর নীচে আরও কিছু রেখা এবং তারপর মানবীয় নিতম্বের ন্যায় চওড়া অংশবিশেষ ও একই সাথে সমগ্র দেহে গোলাকৃতি কিছু চিহ্ন সাপের দেহের ন্যায়। এরপর চওড়া অংশের শেষে নীচের দিক ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া দুটি থামের মতন পা, অর্থাৎ সবমিলিয়ে মানবী ও সর্পিণীর এক অভিনব সমন্বয়ধর্মী মূর্তি পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এর মধ্য দিয়ে।[৪৪] (চিত্র নং-১৭) এই সার্বিক উপস্থাপনা হয়তো একে প্রাচীন সমাজের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ অনুমান করা চলে। সম্ভবত বাংলার স্বর্পসংকুল অঞ্চলে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সর্পিণীর প্রতিরূপকে মাতৃশক্তি রূপে উপস্থাপনা অর্থাৎ নাগ উপাসনার চল ছিল যা আজও বিদ্যমান রয়েছে বহুলাংশে, একই উদ্দেশ্যে বাংলায় দেবী মনসার উপাসনা লক্ষণীয়। সাধারণত সর্প দ্বারা বেষ্টিত নারীমূর্তিকে দেবী মনসা রূপে কিংবা ঘট অথবা মনসা গাছের দ্বারা প্রতীকী হিসেবে তার উপাসনা করা হয়ে থাকে। নিম্নে উপস্থাপিত অবয়বটির সন্ধান পাওয়া যায় বাংলা সহ উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন কেন্দ্রে।

ষ্টেলা ক্র্যামরিশ[৪৫] এই উপস্থাপনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এই সমন্বয়ধর্মী অবয়বে দেহের উপরিভাগটি সর্প মুখমণ্ডল এবং সর্প থেকে মানবীতে রূপান্তরের যে প্রক্রিয়া তার উপস্থাপনা দেহের নিম্নভাগে। এর দৈহিক ভঙ্গিমায় বিশেষ মনস্তত্ব বা চিন্তাধারার সংযোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তার দেহের মূল কাঠামো ঘট বা কলসের ন্যায়, যার মধ্যে জীবনের সব কিছু অর্পিত হয় আবার তার মধ্য থেকেই নতুন প্রাণের আবির্ভাবও ঘটে। অর্থাৎ আলোচ্য অবয়বকে এক গভীর জীবন দর্শন থেকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেন চন্দ্রকেতুগড়ে উৎখননের সময় এই ধরণের মূর্তির সাথে একটি পাঞ্চ মার্কড মুদ্রা পাওয়া যায় যার ফলে এটি সম্ভবত মৌর্য বা মৌর্যত্তর কালীন বলে মনে করা হয়ে থাকে। এছাড়া উক্ত সময়কালে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি যে ক্রমে বাংলায় প্রবেশ করতে শুরু করেছিল সন্দেহ নেই, এবং উত্তর ভারতীয় বহু কেন্দ্রেই অনুরূপ অবয়বের সন্ধান মেলে। ফলত বাংলায় এধরনের অবয়বের বিকাশের সাথে উত্তর ভারতীয় আদর্শ সম্পর্কিত থাকার সম্ভাবনা দিকটিও ব্রতীন্দ্রনাথ বাবু উল্লেখ করেন।[৪৬] তবে উদ্ভবের কেন্দ্র যাইহোক, এর পশ্চাতে যে সাধারণ মানুষের লোকায়ত বিশ্বাস ও রক্ষণচেতনা নিহিত ছিল বলাবাহুল্য, যার ভিত্তিতে এই ধরণের অবয়ব এক নির্দিষ্ট প্রতীকী রূপে বিস্তার লাভ করেছিল সমগ্র ভারতীয় প্রেক্ষাপটে। মহাস্থানের মঙ্গলকোটে মানবীয় মূর্তির মাথায় সাপের ফনা

সম্বলিত বেশ কিছু অবয়বের সন্ধান মেলে যদিও সম্ভবত সেগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময় যথা গুপ্ত পর্যায়ের কিন্তু সামগ্রীকভাবে এগুলি যে বাংলায় নাগ উপাসনার ইঙ্গিতবাহী সন্দেহ নেই।

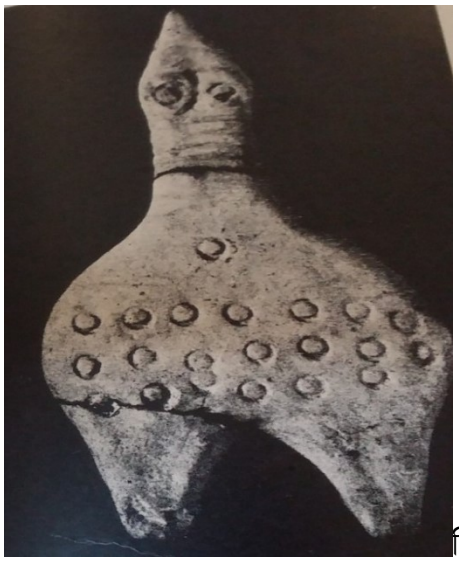চিত্র নং-১৭ হাতে গড়া অর্ধ মানবী- অর্ধ নাগিনী অবয়ব, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে এস এস বিশ্বাস, প্রাগুক্ত (Plate- vii)

আবার আবিষ্কৃত বেশ কিছু উপাদানের ভিত্তিতে বাংলায় শৈব অবয়বের উপস্থিতিরও উল্লেখ করেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। চন্দ্রকেতুগড়ে একটি ক্যালকোলিথিক পর্বের পোড়ামাটির শিবলিঙ্গ মেলে যা খুব স্বাভাবিক কোনোমতেই ব্রাহ্মণ্য আদর্শপুষ্ট নয়।[৪৭] তবে ক্রমে সময়ের সাথে উক্ত প্রাক ব্রাহ্মণ্য লিঙ্গ পূজার সহিত সম্পর্কিত ধ্যানধারণাও ব্রাহ্মণ্য শিবের লিঙ্গরূপ এবং মনুষ্য দেহরূপের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল বলে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মত প্রকাশ করেছেন। তার বর্ণনা অনুসারে চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত একটি গোলাকার ফলকে যোনিপট্ট সহ শিবলিঙ্গ ও স্বয়ং শিবের প্রতিরূপের উপস্থিতি এবং তৃতীয় শতকের খরোষ্ঠী লিপিতে 'ইশর' (ঈশ্বর অর্থাৎ শিব) শব্দের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। আবার প্রাপ্ত অপর এক অবয়বে শিবলিঙ্গের ওপরে উৎকীর্ণ শিবের বাহন ও তাঁর পশুরূপ বৃষের মুখ এবং শিব লিঙ্গকে আলিঙ্গনরত এক নারীর (উমা) পশ্চাদভাগ উপস্থাপিত যা এই মূর্তিটিকে শৈব ধর্মাশ্রিত রূপে গন্য করে এবং তৎকালীন বাংলার প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসে তার উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়।[৪৮] মহাস্থানে পরবর্তীতে গুপ্ত বা তৎপরবর্তীকালীন জটাধারী,তথা মনুষ্য রূপধারী একাধিক শিব বা ভৈরবের টেরাকোটা মূর্তি পাওয়া যায় যা এই অবয়ব সম্পর্কে তৎকালীন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটায়।[৪৯]

এছাড়াও চন্দ্রকেতুগড়ে বেশ কিছু ঐশ্বরিক অবতারনার সন্ধান পাওয়া যায় বলে চিহ্নিত, যেমন ভেড়াবাহিত গাড়িতে উপবিষ্ট দুই নারী সঙ্গিনী সহ অলংকারে সুসজ্জিত অবয়বকে অগ্নি দেবতা রূপে গন্য করা হয়। আবার একই ভাবে ডানাযুক্ত হাতির পিঠে উপবিষ্ট অলংকৃত অবয়বের উপস্থিতিকে ইন্দ্র দেবের উপস্থাপনার সহিত কল্পনা করা হয়।[৫০] ইন্দ্র বা অগ্নি উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য দেবতা। যদিও এখানে উপস্থাপিত অবয়বগুলি প্রকৃতই কোন আধ্যাত্মিক প্রতীকি বহন করছে কিনা সেবিষয়টি নিয়ে সংশয় বিদ্যমান, বর্তমানে অনেক গবেষক এই জাতীয় উপস্থাপনাকে ধর্মীয় সংযোগের বাইরে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার কথা বলছেন। তবে অবয়ব ভেদে এই বিষয়ের বিশ্লেষন করা উচিৎ, কেননা সর্বত্রই যে এই শ্রেণীর সকল অবয়ব সমদৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে এমনটা নাও হতে পারে যার আলোচনা রয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে।

এছাড়া কিছু বৌদ্ধ ও জৈন উপাদানের ও অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় বাংলার প্রত্নস্থল গুলিতে যা সমকালীন ইতিহাসে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার পোড়ামাটি শিল্পে প্রাপ্ত বৌদ্ধ অবয়বের মধ্যে তিলদা ও তমলুক থেকে ২টি অসাধারন গান্ধার শৈলীর বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়।[৫১] তবে এদের সময়কাল কিন্তু আলোচ্য পর্ব অপেক্ষা পরবর্তীকালের, এদের যথার্থ রূপে আদি ঐতিহাসিক বাংলার প্রাথমিক পর্যায়ের সহজ সরল শিল্পধারার অন্তর্ভুক্ত করা চলেনা। এছাড়া মহাস্থানে গুপ্ত পর্বীয় একটি বোধিসত্ত্বের মুখাবয়ব মেলে যিনি তার আনত চক্ষুদ্বয় ও সংবেদনশীল ওষ্ঠ সহ চিরাচরিত ভঙ্গিতে বিদ্যমান (চিত্র নং-১৮) শুধু তাই নয় গুপ্ত পরবর্তী বা পাল পর্বের একাধিক অসামান্য বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায় মহাস্থানের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যা সামগ্রিকভাবে মহাস্থানের টেরাকোটা শিল্পকে এক অন্য মাত্রা প্রদান করে।[৫২]

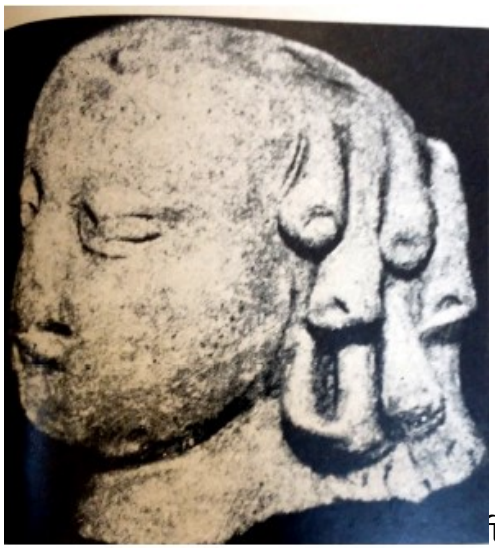

চিত্র নং-১৮ বোধিসত্ত্ব মূর্তি, মহাস্থান, আনুমানিক গুপ্ত পর্ব, সৌজন্যে- এস এস বিশ্বাস, প্রাগুক্ত (Plate- LXIb)

মোটামুটিভাবে চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সংযোগের ইঙ্গিতবাহী প্রতীক সম্পন্ন অবয়বগুলিকে তুলে ধরা হল, যাদের উক্ত প্রতীকীর ভিত্তিতে পৃথক পরিচিতি প্রদত্ত হয়েছে এবং সময়ভেদে সম্পৃক্ত প্রতীকের বিবর্তনও পরিলক্ষিত হয় আলোচ্য বিবিধ ক্ষেত্রে। ফলত বাংলার শিল্পের সহিত সমকালীন ধর্মচিন্তার অচ্ছেদ্য বন্ধনের দিকটি কিন্তু স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে উপরিউক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে এবং পাশাপাশি প্রচলিত ধর্মচিন্তার দিকটিও প্রকাশিত হয় এই আলোচনার মধ্য দিয়ে যা সমাজ ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। উল্লেখ্য অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্তও ভারতীয় শিল্প ক্ষেত্রে ধর্মীয় উপাদান ছিল অন্যতম প্রধান ভিত্তি। উপরিউক্ত আলোচনা ছাড়াও সার্বিক ভাবে আরও কিছু পোড়ামাটি উপাদানের নিদর্শন পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ অন্যান্য বঙ্গীয় প্রত্নস্থলগুলিতে যাদের নিশ্চিত পরিচিতির প্রমাণ মেলেনা, বা তাদের সময়কাল অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের কিন্তু তাদের উপস্থাপনার ভিত্তিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সার্বিক রূপে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি বা কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে।

অপরদিকে আলোচ্য পর্বের পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বিভিন্ন পশু অবয়বগুলি। আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় টেরাকোটা অবয়বে সম্পৃক্ত প্রতীকী চেতনার অন্বেষণ যাদের উল্লেখ ছাড়া অসম্পূর্ণ। তবে পশুর উপস্থাপনাতেও কিন্তু কিছু শ্রেণী বিভাজন রয়েছে, সেখানে কিছু ফলকে সামাজিক প্রবণতা সম্পন্ন অলংকৃত পশুপক্ষী যেমন রয়েছে তেমনই সম্পূর্ণ অলংকরণ বর্জিত প্রাথমিক পর্বের অসংখ্য হাতে গড়া একক পশু মূর্তিরও সন্ধান পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ বিভিন্ন বঙ্গীয় কেন্দ্রে যাদের গুরুত্ব ইতিহাসে অপরিসীম(চিত্র- ১৯,২০,২১)। এই বিপুল পরিমাণ পশু পাখির উপস্থাপনা সমকালীন প্রাকৃতিক জগতের প্রতিফলন তো বটেই, কিন্তু এর সাথে নিশ্চিত রূপেই অপর একটি প্রেক্ষিত জড়িত থাকতে পারে। প্রথমত বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন বা প্রতীক স্বরূপ আমরা বিভিন্ন পশু পাখির উপস্থাপনা পাচ্ছি যা নিশ্চিত রূপে তার ধর্মীয় সংযোগের দিকটিকে উপস্থাপিত করে। এছাড়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রাথমিক পর্বের আদিম শৈলীতে তৈরি বিভিন্ন পশুর একক উপস্থাপনা, আদিম মাতৃকা মূর্তির ন্যায় এই অবয়বগুলিও একইভাবে বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করে আজও বিদ্যমান রয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে, যেখানে বিভিন্ন লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানে এগুলির গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন যুগে সমৃদ্ধ শিল্প উপাদানের পাশাপাশি এজাতীয় অবয়বগুলির উপস্থাপনা বারংবার পরিলক্ষিত হয়। উক্ত প্রাথমিক মাতৃকামূর্তির ন্যায় এসমস্ত অবয়বগুলিও একই ধর্মচিন্তা প্রসূত বলে অনুমান করা যেতে পারে যেখানে নির্দিষ্ট কোন দেবী বা ধর্ম উপাসনা নয়, সামগ্রীক

রূপে শুভ চেতনা বা মঙ্গলের প্রতীক স্বরূপ পালিত বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের অঙ্গ রূপে তাদের অবস্থানকে আমরা অনুমান করতে পারি। অর্থাৎ সার্বিক রূপে এক মঙ্গল চিন্তার প্রতীক স্বরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অবয়বগুলির বিকাশ ঘটেছে এবং দীর্ঘকাল নিজ স্বত্তা অব্যাহত রেখেছে স্বমহিমায়।

১৯

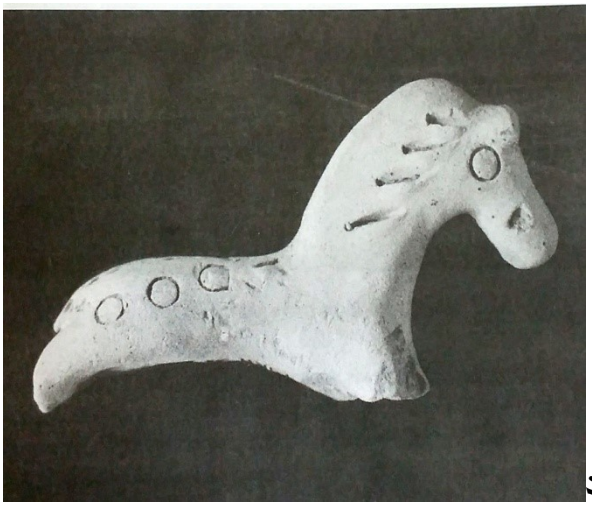

২০

চিত্র নং-১৯ হাতে গড়া হস্তী অবয়ব,চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় সংগ্রহালয়, ব্যাক্তিগত চিত্র সংগ্রহ

চিত্র নং- ২০ ঘোড়া অবয়ব, মহাস্থানগড়, আনুমানিক ১ম খ্রিষ্টপূর্বাব্দ (উৎখনন স্তর- ৮) সৌজন্যে- ফ্রেঞ্চ বাংলাদেশ ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট, ১৯৯৩-১৯৯৯ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১২১

২১

চিত্র নং-২১ একক বৃষ উপস্থাপনা, মহাস্থানগড়, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক (উৎখনন স্তর- ৬) সৌজন্যে- ফ্রেঞ্চ বাংলাদেশ ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট, ১৯৯৩-১৯৯৯ পৃষ্ঠা-১০৯

আলোচ্য পর্বে চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় উভয় ক্ষেত্রের পোড়ামাটি শিল্প ধারায় অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল বিপুল পরিমাণ **মিথুন রীতির** উপস্থাপনা, এই উভয় অঞ্চল সহ বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাপ্ত এজাতীয় অবয়ব বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসকে বিশেষ পরিচিতি প্রদান করে। সামগ্রীকভাবে এই ধরণের ফলকের চরিত্র সম্পর্কে দু ধরণের অভিমত মেলে- কেউ বলেন এগুলি সমাজ চিত্রের উপস্থাপনা, অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশবিশেষ আবার কারও মতে এগুলি প্রজনন স্বত্তা ও উর্বরতার প্রতীক তাই এর সঙ্গে অবশ্যই কিছু প্রতীকী তাৎপর্য জড়িত।[৫৩] প্রকৃতই সময়কালের বিচারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তৎকালীন সমাজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত ছিল প্রজনন স্বত্তা বা উর্বরতা, এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় নানান অবয়ব বা উপাদানকে তৎসম্পর্কিত চিন্তনের প্রতীক হিসেবে তার উপাসনা করেছে মানুষ। ফলত খুব স্বাভাবিক ভাবেই মিথুন রীতি প্রদর্শিত ফলকের ঐ জাতীয় কোন মঙ্গলআচার বা শুভ কর্মকান্ডের অংশ হওয়াটা যথেষ্টই প্রত্যাশিত। তবে এই প্রকার অবয়বের মধ্যেও কিছু বৈচিত্র্য রয়েছে, সকল অবয়বকে কিন্তু একই শ্রেণীভুক্ত করা চলেনা। সাধারণত দুই পৃথক ধরণ লক্ষ করা যায়, এক শ্রেণীর অবয়বে প্রভূত পরিমানে নারী পুরুষের প্রেমময় মুহূর্ত বা আলিঙ্গনরত দৃশ্য শিল্পীর কর্মক্ষেত্রে উঠে এসেছে। চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় উভয় ক্ষেত্রেই এরূপ অবয়ব মেলে। অপর শ্রেণীতে আবার অতি সূক্ষ্ম ভাবে রতিক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ বা ভঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে, বিশেষ রূপে যার উপস্থাপনা পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে।

চন্দ্রকেতুগড়ে রতিক্রিয়ার বিস্তারিত উপস্থাপনা বা বাহ্যিক ভঙ্গিমায় বহুক্ষেত্রে এগুলিকে শুভ লক্ষণ বা মঙ্গল চেতনার বাইরে সাধারণ নারী পুরুষের উপস্থাপনা বা বিনোদনের অঙ্গরূপে অনেকে অনুমান করতে পারেন। কেননা সেখানে বেশ কিছু ফলকে বিস্তীর্ণ ভঙ্গির মধ্যে মৈথুনকালে দেহের পশ্চাৎভাগে গুরুত্ব আরোপের দৃষ্টান্ত বা স্বমেহনের ন্যায় দৃশ্য সম্বলিত কিছু ফলকও পরিলক্ষিত হয় যা হয়তো মিথুন শৈলীর পার্থিব দিকটিকে ইঙ্গিতবাহী করে। যদিও এক্ষেত্রে এরিখ নিউম্যানের (Erich Neumann) একটি বক্তব্য উল্লেখ করা চলে- তিনি সার্বিক রূপে মাতৃকাশক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছেন এইরূপ রতিভঙ্গিমা অবশ্যই উর্বরতা জনিত আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের অঙ্গ। সুদূর পুরা প্রস্তর যুগে আদিম সমাজে বর্তমানের ন্যায় এই পশ্চাৎমুখী ভঙ্গী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল পশু প্রজনন ক্ষেত্রে। বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাপ্ত এই বিপুল সংখ্যক মিথুন রীতির উপস্থাপনা কেবল মানুষের ব্যক্তিগত যৌনক্রিয়ার অংশ না মনে করে এর প্রতীকী তাৎপর্য অনুধাবনের কথা বলেছেন তিনি।[৫৪] সুতরাং চন্দ্রকেতুগড়ে যে অধিকাংশ অবয়বেই মূলত পশ্চাৎ ভাগে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এইরূপ উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও কোন বিশেষ প্রতীকি তাৎপর্য থাকতে পারে কিনা ভেবে

দেখা দরকার। হতেই পারে যেহেতু মিথুন প্রক্রিয়া আদতে উর্বরতার প্রতীক ফলত উক্ত অবয়ব সঙ্গে রাখলে দাম্পত্য সুখী হবে বা সন্তান উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এরূপ চেতনাই কাজ করেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে যা এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কেবল তাকে ভিন্ন ভঙ্গীতে উপস্থাপন করা হয়েছিল, নিজেদের জীবনযাত্রার সাথে সংযোগ সাধনের জন্য কিংবা নতুনত্ব আনয়নের জন্য। (চিত্র নং-২২,২৩)

২২

২৩

চিত্র-২২ প্রেমময় নারী পুরুষ, মহাস্থানগড়, সৌজন্যে- শাহ সুফী মোস্তাফিজুর রহমান, 'আর্কিওলজিকাল ইনভেস্টিগেশন ইন বোগড়া ডিসট্রিক্ট', ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডি অফ বেঙ্গল আর্ট পাবলিকেশন,২০০০ পৃষ্ঠা-১৮৪

চিত্র-২৩ মিথুন দৃশ্য, সৌজন্যে, চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় সংগ্রহালয়, ব্যাক্তিগত চিত্র সংগ্রহ

অধ্যায়ের শেষে গিয়ে বলা যায়, উপরের আলোচনা থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট যে চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড় আদি-ঐতিহাসিক বাংলার ইতিহাসের দুই অনবদ্য প্রত্নস্থল যার যথার্থতাকে পূর্ণতা দেয় তার অসামান্য পোড়ামাটি শিল্প ঐতিহ্য। এখানে প্রাগৈতিহাসিক পর্বের মানুষের নান্দনিক কর্মের চিহ্ন যেমন মেলে তেমনই শুঙ্গ কুষান পর্বীয় সমৃদ্ধ শিল্পকর্মেরও পরিচয় পাই অর্থাৎ দীর্ঘ যুগবিবর্তনের সাক্ষীরূপে স্থিত বাংলার এই শিল্পধারা। বিচিত্র শৈলী, কারিগরী, অঙ্গসৌষ্ঠব, বিচিত্র বিষয়াদির উপস্থাপনা ও যুগের ব্যবধানে তার ক্রমবিকাশ এই শিল্পকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। আর তারই সাথে অবশ্য উল্লেখ্য প্রাপ্ত শিল্প অবয়বের সহিত নিহিত নানান প্রতীক বা মোটিফ।

কেননা উক্ত প্রতীক সমূহের সূক্ষ্ম তারতম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি বা আদর্শ আরোপিত হয়ে থাকে। আলোচ্য অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলা হয়েছিল আদি ঐতিহাসিক বাংলায় প্রাপ্ত নানান পোড়ামাটির অবয়বের সহিত সম্পর্কিত বিভিন্ন লক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপের প্রয়াস করা হবে এবং সেই অনুযায়ী উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কথা মাথায় রেখে অধ্যায়ের মূল অংশের বর্ণনার প্রয়াস করা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে আলোচ্য পরিসরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ সহ মূর্তির বিকাশ ঘটেছে, সমগ্র আদি ঐতিহাসিক পর্ব জুড়ে যাদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। উল্লেখ্য চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানের পাশাপাশি বহু বঙ্গীয় কেন্দ্রেও যাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, এই সকল অবয়বের বিকাশের পশ্চাতে কিরূপ আদর্শ বা অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল? এই আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পকে কি 'Iconic' চেতনার স্ফুরণ রূপে অভিহিত করা চলে, তার অনুসন্ধান। শিল্প ইতিহাসের আলোচনায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপাদান হল 'Icon' বা 'Iconography' শব্দদ্বয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জে.এন.ব্যানার্জী-র বক্তব্য অনুযায়ী সাধারণত যেসকল অবয়ব কোন নির্দিষ্ট প্রতিমা তথা দেব/দেবী কে নির্দেশ করে বা কোন চিত্র, স্থাপত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপস্থাপিত বিষয় একান্তই ধর্মীয় সংযোগকে প্রতিফলিত করে তাকে সাধারণত 'Icon' (মূর্তি) বলা হয়ে থাকে। আর এই 'Icon' বা মূর্তি সমূহ নিয়ে চর্চার যে বিশেষ শাখা তাকে সাধারণত বলা হয়ে থাকে 'Iconography' (মূর্তিশাস্ত্র/প্রতিমাবিদ্যাচর্চা)। অর্থাৎ উভয় শব্দ একান্তই ধর্মীয় শিল্প উপাদানের সহিত জড়িত। তাঁর মতে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মচর্চা বা আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে উক্ত 'Iconography'।[৫৫] যদিও বর্তমানে এসকল শব্দবন্ধের পরিবর্তে বাংলায় যে 'প্রতীকী' বা 'লক্ষণ' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আপাতভাবে বিচার করলে তার অর্থ অবয়বের সেই অপরিহার্য অংশ যা তার পরিচিতিকে প্রকাশিত করে; বা বলা যায় কোন নির্দিষ্ট অবয়বের সহিত সম্পর্কিত আবশ্যক কোন প্রতীক। কিন্তু আদতে উক্ত ধর্মীয় সংযোগের অন্বেষণের কথাও মাথায় রেখেই পুরো বিষয়টির উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে বাংলায় বিস্তীর্ণ অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি মানুষের সহজ সরল প্রাথমিক বিশ্বাস বা চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ। যেমন আদিম হাতে গড়া মাতৃমূর্তিগুলির উপস্থিতি পাচ্ছি হরপ্পা সভ্যতা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্তও বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, আবার প্রাথমিক কিছু পশুমূর্তির ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য আজও যারা কিছু ধর্মীয় প্রথা বা রীতিনীতি পালনে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ উল্লেখ্য কেবল ভারত নয়, এজাতীয় অবয়বের সহিত বিশ্বচেতনা জড়িয়ে। এর বিস্তার পরিলক্ষিত হয় সিরিয়া, ক্রিট, মেসোপটেমিয়া সহ

বিভিন্ন অঞ্চলে।[৫৬] সাধারণত দৈহিক উপস্থাপনা, অস্তিত্বের ব্যপকতা প্রভৃতির বিচারে এজাতীয় অবয়ব প্রাচীন সমাজেও একান্তই উর্বরতার প্রতীক স্বরূপ উপাসনার অঙ্গ হিসেবেই বিবেচিত হত বলে অনুমান করা যায়।

একইভাবে দেখা গেছে সম্পদের দেবী, ধান্যদেবীর ন্যায় অবয়বের বিকাশ ঘটেছে যা সবই মূলত উর্বরতা বা প্রজনন স্বত্তা তথা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা যার মূলে রয়েছে আদতে সমৃদ্ধি বা মঙ্গলময়তার আকাঙ্ক্ষা উক্ত প্রেক্ষিত থেকে উপাসিত হয়েছে। আমাদের সমাজে নারী যেহেতু উর্বরতার প্রতীক, সমাজে তার প্রধান ভূমিকা বিবেচিত হয় প্রজনন স্বত্তার অধিকারী রূপে। ফলস্বরূপ প্রাথমিক পর্বেও মানুষ সম্ভবত উক্ত চিন্তাধারা থেকেই বিভিন্ন সময় তাদের সার্বিক সমৃদ্ধি বা উর্বরতার কামনায় ভিন্ন ভিন্ন উপাদানকে মূল প্রতীকী (পদ্ম, ধান, জল,মৎস প্রভৃতি) হিসেবে নারীশক্তির সহিত সম্পৃক্ত করেছে এবং কালের নিয়মে ক্রমে তা সমাজে নির্দিষ্ট প্রতীকী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দৃঢ়ভাবে। অর্থাৎ এসকল অবয়বের সাথে একটা বিশ্বাস জড়িত, যার প্রতিফলন ঘটছে ভিন্ন পরিসরে ভিন্ন কালপর্বেও।

এক্ষেত্রে প্রাক্‌ব্রাহ্মণ্য দেবীস্বত্তার সহিত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সংমিশ্রনের সম্ভাবনার দিকগুলি ইতিপূর্বে উল্লিখিত। যেখানে দেখা যায় হয়তো বিভিন্ন লৌকিক অবয়বের সহিত ব্রাহ্মণ্য অবয়বের প্রতীকীর সমন্বয় বা সংযুক্তিকরণের ফলে এক নতুন প্রতীকীর বিকাশ ঘটেছে। আবার হয়তো কখনও বা লৌকিক কোন প্রতীকীও প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মধ্যে গৃহীত হয়ে উক্ত কোন দেব/দেবী মূর্তির সহিত সম্পৃক্ত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 'ধান্যদেবী' প্রমুখের ব্রাহ্মণ্য দেবী 'লক্ষ্মী'র সহিত একাত্মতা, কিংবা বঙ্গীয় লৌকিক আদর্শপুষ্ট 'হস্তীমুখ দেবতার' ব্রাহ্মণ্য 'গনেশের' সহিত সম্পৃক্তকরণের সম্ভাবনার দিকগুলি ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। আবার যদি বলা যায় বাংলার অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ যক্ষ-যক্ষী অবয়বগুলির কথা সেক্ষেত্রেও তারা তাদের দৈহিক উপস্থাপনার ভিত্তিতে অলৌকিক শক্তির অধিকারী রূপেই পরিগণিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য 'পঞ্চচূড়া' যক্ষিণী অবয়ব, যাদের প্রধান প্রতীকী কেশসজ্জায় সম্পৃক্ত আয়ুধরূপী শলাকাসমূহও পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের সহিত সম্পৃক্ত হচ্ছে। এছাড়াও আরও কিছু অবয়ব মেলে যাদেরও ধর্মীয় অবয়ব বলেই মনে করা হয়ে থাকে বা সম্পৃক্ত প্রতীকের অনুধাবন করা যায় যার বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে রয়েছে।

তবে এই 'Iconic' বা মূর্তিতত্ত্ব জনিত বিষয় কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ধারণা, আর এজাতীয় শিল্পধারা মূলগতভাবে সাধারন মানুষের প্রাথমিক চিন্তাধারার ফলশ্রুতি। যেখানে শিল্পশাস্ত্রের সকল সংজ্ঞা, ব্যাকরণ এর বাইরে, সহজ সরল জীবন দর্শন থেকে শিল্পী তার

শিল্পকর্মকে ফুটিয়ে তোলেন। যেসকল অবয়ব আমরা নিশ্চিত রূপে ধর্মীয় সংযোগ, প্রথা বা রীতিনীতির উদ্দেশ্যে নির্মিত বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি তারা কিন্তু অধিকাংশ নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মসম্প্রদায়ের বাইরে, সার্বিক সমৃদ্ধি বা মঙ্গলের প্রতীক রূপে বিকাশ লাভ করেছে যার উপাসনার নিদর্শন মেলে পরবর্তীকালের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে। অর্থাৎ ধর্ম, বর্ণের গন্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে এসকল অবয়ব গ্রহন করেছে, আর এই প্রক্রিয়ার মাঝে বহুক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব প্রচলিত রূপকল্পেরও যে বিবর্তন ঘটেছে তার একাধিক আভাষ রয়েছে বর্তমান অধ্যায়ে। অর্থাৎ কোন পৃথক অবয়বের নির্দিষ্ট রূপ, আঙ্গিক যে সর্বত্র একইভাবে পরিলক্ষিত এমনটা নয়, মূল আদর্শ বা প্রতীক আরোপিত থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে তার উপস্থাপনা লক্ষণীয়। যেমন- 'শ্রী' বা 'ধান্যদেবী'-র ন্যায় অবয়বের কথা যদি ধরি দেখা যাবে মূল প্রতীক স্বরূপ 'পদ্ম' বা 'শস্যদানা' র উপস্থিতি অব্যাহত রেখে বিভিন্ন পৃথক বাহ্যিক ভঙ্গীতে তাদের একাধিক উপস্থাপনার বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু শিল্পশাস্ত্রের প্রতিমাবিদ্যাচর্চা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রতিমার নির্দিষ্ট আসন, আয়ূধ, আভরণ, মুদ্রা প্রভৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব কিছুর ভিত্তিতে পৃথক অবয়বের পৃথক পরিচিতি নির্ধারিত রয়েছে, যার বাস্তবিক উপস্থাপনা সাধারণত পরিলক্ষিত হয়ে থাকে আদি মধ্য যুগীয় বাংলার বিভিন্ন প্রস্তর ভাস্কর্য গুলির মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই আদি ঐতিহাসিক টেরাকোটা শিল্প কিন্তু উক্ত প্রবণতার অনুসরণকারী নয়। ফলস্বরূপ আলোচ্য বাংলার টেরাকোটা শিল্পে বিকশিত এজাতীয় অবয়বকে নির্দিষ্ট রূপে 'Iconic' অভিধায় ভূষিত করা যায় কিনা তা কিছুটা সংশয়াত্মক। বরং এই ধরণের শব্দবন্ধ ব্যবহারের পরিবর্তে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে হয়তো এরূপ বলাই যথার্থ যে আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পধারায় নির্দিষ্ট কিছু শৈলী বা প্রতীকীর বিকাশ ঘটেছিল যা বাংলার টেরাকোটা শিল্পকে এক নিজস্ব পরিচিতি প্রদান করে, এবং ক্রমে বঙ্গীয় লৌকিক চিন্তাধারা ও উত্তরভারতীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রনের ফলে শিল্পক্ষেত্রে সামগ্রীকভাবে যে নতুন নতুন অবয়ব, শৈলী, নতুন লক্ষণ বা প্রতীক গড়ে উঠছে তা সার্বিকভাবে ভারতীয় শিল্পধারার প্রতীকী বিকাশে বঙ্গীয় আদর্শের ভূমিকার দিকটি গন্য করা যায় কিনা সেই প্রশ্নেরও উদ্রেক করে বলা বাহুল্য।

সবশেষে সীমা রায় চৌধুরী[৫৭] কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি বিষয় উল্লেখ করব, তিনি উল্লেখ করেছেন বহুক্ষেত্রে টেরাকোটা অবয়বে উপস্থাপিত প্রতীকী অন্বেষণে শাস্ত্রীয় উপাদানের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়ে থাকে কিন্তু শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় এজাতীয় শিল্পের প্রকৃত চরিত্র উদ্ঘাটন সহজসাধ্য নয় কেননা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রধারার বাইরে প্রচলিত যে একাধিক আঞ্চলিক ধর্ম ও প্রথা বিদ্যমান ছিল তাদের উল্লেখ সর্বদা শাস্ত্রীয় গ্রন্থে থাকেনা। আবার কখনো কোন স্থানীয়

লোকদেবতা প্রচলিত মূল স্রোতের ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে সংযোজিত হলে হয়তো তার কথা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় কিন্তু তার সময়কাল নিশ্চিত ভাবে কখনোই উক্ত দেবতার জনপ্রিয়তার সময়কালকে নির্দেশ করেনা অর্থাৎ একই সময়ে ২টো প্রক্রিয়া ঘটে এমনটা নয়। আর উক্ত আঞ্চলিক উপাদানগুলিকে সংরক্ষনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে টেরাকোটা শিল্পউপাদান তাই লিখিত উল্লেখ না থাকলেও তাদের গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা চলেনা। এছাড়া এর পরিবর্তে টেরাকোটার প্রাপ্তিস্থানগুলির সামগ্রীক আঞ্চলিক, সাংস্কৃতিক বা কালানুক্রমিক প্রেক্ষিতের নিরিখে টেরাকোটা অবয়বের বিশ্লেষণে অধিক গুরুত্ব প্রদান এজাতীয় শিল্পের যথার্থ চরিত্রায়ন ও ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্বার্থক করে তুলবে বলে অনুমান করা চলে। তার এই বক্তব্য বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিক সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র

১) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা -৪১

২) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ' , আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল , কলকাতাঃ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম, ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১৫

৩) স্টেলা ক্র্যামরিশ -'ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস' ; বারবারা স্টোলার মিলার সম্পাদিত, "এক্সপ্লোরিং ইন্ডিয়াস সেক্রেড আর্ট"- সিলেক্টেড রাইটিংস অফ স্টেলা ক্র্যামরিশ, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস অ্যান্ড মোতিলাল বানারসী দাস প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী ১৯৯৪ পৃষ্ঠা- ৬৯-৭১

৪) সরসী কুমার সরস্বতী , আর্লি স্কাল্পচার অফ বেঙ্গল, সম্বোহী পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৬২ পৃষ্ঠা- ৯৩-৯৫

৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ৯১-৯২

৬) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ১৩-১৪

৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪

৮) তদেব

৯) সীমা রায় চৌধুরী, 'স্টাইল এন্ড ক্রোনোলজি' : প্রবলেমস্ ইন ইভলভিং আ টেম্পোরাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য আর্লি হিস্টোরিকাল টেরেকোটাস ফ্রম বেঙ্গল' ; গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত - 'আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া , নিউ পার্সপেক্টিভস " , সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, কলকাতা - ২০০২ পৃঃ- ১৩-২৩

১০) স্টেলা ক্র্যামরিশ -'ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস' ; বারবারা স্টোলার মিলার সম্পাদিত, "এক্সপ্লোরিং ইন্ডিয়াস সেক্রেড আর্ট"- সিলেক্টেড রাইটিংস অফ স্টেলা ক্র্যামরিশ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৯

১১) অশোক কুমার ভট্টাচার্য, 'টেরাকোটাস্ অফ বেঙ্গল' , শুঙ্গ কুষান পিরিয়ড - প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত , "ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড" , মার্গ , ২০০২ পৃষ্ঠা – ৬০-৬১

১২) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৮-৪৩

১৩) তদেব, পৃষ্ঠা-৪০

১৪) সুধাংশু কুমার রায়, 'দ্য রিচুয়াল আর্ট অফ দ্য ব্রতস অফ বেঙ্গল', ফার্মা কে এল এম প্রকাশনা, কলকাতা, জানুয়ারি-১৯৬১ , পৃষ্ঠা- ১৮

১৫) শক্তি কালী বসু, 'ডেভেলপমেন্ট অফ আইকনোগ্রাফি ইন প্রি-গুপ্ত বঙ্গ', পুঁথি পুস্তক প্রকাশনী, কলকাতা,২০০৪ পৃষ্ঠা- ১০৭

১৬) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ' প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৫০-৫১

১৭) অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষন, 'লক্ষ্মী ও গনেশ', পুরোগামী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬০, পৃষ্ঠা- ৩৫-৪৭

১৮) 'ডেভেলপমেন্ট অফ আইকনোগ্রাফি ইন প্রি-গুপ্ত বঙ্গ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫

১৯) ভগবন্ত সহায়, "আইকনোগ্রাফি অফ সাম ইম্পর্টেন্ট মাইনর হিন্দু অ্যান্ড বুদ্ধিষ্ট ডিটিস", অভিনব পাবলিকেশন, নিউ দিল্লী, ১৯৭৫ পৃষ্ঠা- ১৫৭

২০) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬১

২১) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৪১

২২) গৌরীশঙ্কর দে, শুভ্রদীপ দে – 'চন্দ্রকেতুগড় আ লস্ট সিভিলাইজেশজন'- আর্ট এন্ড আর্ট মোটিফ (১ম খণ্ড)২০০৪ ,কলকাতা ,সাগ্নিক বুকস , পৃষ্ঠা-৭৬-৭৭

২৩) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৪১

২৪) সীমা রায় চৌধুরী, 'আর্লি হিস্টোরিকাল টেরাকোটাস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ স্টাডি ইন থিমস্ অ্যান্ড মোটিফস', "প্রত্নসমীক্ষা", খণ্ড- ৪ ও ৫, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম গভঃ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৯৫-৯৬,পৃষ্ঠা- ৬৭

২৫) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ' প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ১৩১

২৬) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৪১

২৭) এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস' পৃষ্ঠা- ৮৪

২৮) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প , প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৩৮

২৯) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৬১-৬৪

৩০) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ' প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৬০-৮৪

৩১) শিবানী আগরওয়াল, ‘টেরাকোটাস ফ্রম মথুরা অ্যান্ড অহিচ্ছত্রঃ অ্যান আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি (৪০০ বিসি টু সেভেন্থ/এইটথ্ সেঞ্চুরি এডি)’ ,, উপিন্দর সিং অ্যান্ড নয়নজ্যোৎ লাহিড়ী এডিটেড “এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া নিউ রিসার্চ”, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী , ২০০৯ পৃষ্ঠা-২৪২-২৪৫

৩২) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’ প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৮৫-৮৬

৩৩) ভগবন্ত সহায়, “আইকনোগ্রাফি অফ সাম ইম্পর্টেন্ট মাইনর হিন্দু অ্যান্ড বুদ্ধিষ্ট ডিটিস”, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬৮,১৭২

৩৪) জে এন ব্যানার্জী, ‘দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফি’ , মুন্সীরাম মনোহরলাল প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী, ১৯৭৪ পৃষ্ঠা- ১-২

৩৫) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’ প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৪৭-৪৮

৩৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬০

৩৭) তদেব,পৃষ্ঠা- ৮৫-৮৬

৩৮) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম “উচ্চ” মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৪০

৩৯) তদেব

৪০) আফরোজ আকমাম – ‘মহাস্থান’, বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ঢাকা ২০১৬, পৃষ্ঠা-১৯৮

৪১) এস এস বিশ্বাস- ‘টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল’, আগম কলা প্রকাশনী, দিল্লি,১৯৮১ ,পৃষ্ঠা – ৮২

৪২) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা– ৪২

৪৩) এস এস বিশ্বাস – ‘টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল, প্রাগুক্ত

৪৪) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২০-৩৩

৪৫) স্টেলা ক্র্যামরিশ -'ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস' ; বারবারা স্টোলার মিলার সম্পাদিত, ''এক্সপ্লোরিং ইন্ডিয়াস সেক্রেড আর্ট''- সিলেক্টেড রাইটিংস অফ স্টেলা ক্র্যামরিশ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৭২-৭৩

৪৬) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২০-৩৩

৪৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৯

৪৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২

৪৯) আফরোজ আকমাম – 'মহাস্থান প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ২০৬-২০৮

৫০) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ' প্রাগুক্ত,পৃঃ পৃঃ - ১৬৪, ১৬৮

৫১) এস এস বিশ্বাস – 'টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৬- ৮৭

৫২) আফরোজ আকমাম – 'মহাস্থান প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ১৭২-১৭৬

৫৩) এস এস বিশ্বাস – 'টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৭

৫৪) এরিখ নিউম্যান, 'দ্য গ্রেট মাদার'- অ্যান অ্যানালিসিস অফ দ্য আর্কিটাইপ,(র‍্যালফ ম্যান্সিম অনুবাদিত), প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪ পৃষ্ঠা- ৯৭

৫৫) জে এন ব্যানার্জী, 'দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফি', প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ১-২

৫৬) এরিখ নিউম্যান, 'দ্য গ্রেট মাদার'- অ্যান অ্যানালিসিস অফ দ্য আর্কিটাইপ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১০১

৫৭) সীমা রায় চৌধুরী, 'আর্লি হিস্টোরিক টেরাকোটাস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ স্টাডি ইন থিমস্ অ্যান্ড মোটিফস', ''প্রত্নসমীক্ষা'', খণ্ড- ৪ ও ৫, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম গভঃ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৯৫-৯৬, পৃষ্ঠা- ৮০

তৃতীয় অধ্যায়
আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় টেরাকোটা ও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা

ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল বৈশিষ্ট্যই হল সংস্কৃতির আদান প্রদান ও সমন্বয়সাধন। ভারত ইতিহাসের নানান পর্যায়ে তাই ভিন্ন আদর্শের শিল্প-সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয় এবং বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও নানান ক্ষেত্রে বিবিধ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের নজির লক্ষণীয়। পূর্ববর্তী আলোচনার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত স্পষ্ট যে আলোচ্য বিষয় মূলত প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটি শিল্প কেন্দ্রিক এবং এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ নাম চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড় প্রত্নস্থলদ্বয়। বিশেষ উল্লেখ্য চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটি অবয়বগুলি কিন্তু এক বা অদ্বিতীয় নয়, এক্ষেত্রে প্রাপ্ত টেরাকোটা উপাদানগুলির সহিত অন্যান্য একাধিক অঞ্চলে প্রাপ্ত পোড়ামাটি অবয়বের বিষয়গত বা শৈলীগত বিপুল সাদৃশ্য বিদ্যমান। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটি অবয়ব ও তার প্রতিরূপ গুলিকে পাশাপাশি স্থাপন করে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কালানুক্রমিক ধারায় সেগুলি মোটামুটি সময়ের ব্যবধানে বহুলাংশে সমগোত্রীয় শিল্পস্বত্তার পরিচয়বাহী। শুধু উপস্থাপিত বিষয়াদি বা প্রতীকী নয় প্রযুক্তিগত আদান প্রদানও এই পর্যায়ের শিল্প ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে অনুমান করা চলে। এক্ষেত্রে এরূপ কিভাবে সংঘটিত হল বা এই সমন্বয়ের পশ্চাতে কিরূপ প্রেক্ষিত বা ভূমিকা বিদ্যমান তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং উক্ত প্রেক্ষিতেরই আলোচনার প্রয়াস বর্তমান অধ্যায়। সেক্ষেত্রে দুটি দিক থেকে সমগ্র সমন্বয়ের বিষয়টিকে তুলে ধরার প্রয়াস করা যেতে পারে আলোচ্য অধ্যায়ে।

প্রথমত, বলা যায় আমরা সর্বদা মূল বৃহৎ অঞ্চলগুলি নিয়ে আলোচনা বা গুরুত্ব প্রদান করে থাকি, সেখানে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তথা ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে বা প্রত্নগুরুত্বের বিচারে স্বল্প পিছিয়ে থাকা প্রত্নস্থলগুলি প্রায় ব্রাত্য থেকে যায়। আদি ঐতিহাসিক বাংলার ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় বিশেষভাবে দক্ষিণ বঙ্গ সহ সমগ্র বাংলা জুড়ে একাধিক প্রত্নস্থলের অবস্থান রয়েছে যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে আভাষ দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রকেতুগড় বা মহাস্থানগড়ের ন্যায় সামগ্রীক রূপে তুলনীয় না হলেও এসকল অঞ্চলে কিন্তু কমবেশি বেশ কিছু পোড়ামাটি শিল্প সাক্ষ্যের পরিচয় মেলে, যার উপস্থাপনা বহুলাংশে উক্ত প্রধান নির্বাচিত অঞ্চল ২টির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ তা সামগ্রীকভাবে আদি ঐতিহাসিক বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত

করে। অথচ সেসকল অঞ্চল শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে অনেকখানি উপেক্ষিত তাই বর্তমানে তার ওপর কিছুটা আলোকপাত করা হবে।

দ্বিতীয়ত, তথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শুধু বাংলার অভ্যন্তরীণ নিকটবর্তী অঞ্চলই নয় এইরূপ সমন্বয়ের ধারা কিন্তু বহির্বঙ্গীয় শিল্পশৈলী-র সহিতও লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানের উক্ত টেরাকোটা শৈলীর সহিত উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন টেরাকোটা সমৃদ্ধ অঞ্চল যথা কৌশাম্বী, বৈশালী, চম্পা, অহিচ্ছত্র, মথুরা প্রভৃতিতে আবিষ্কৃত টেরাকোটা অবয়বের বিবিধ সামঞ্জস্য বিদ্যমান তাই বাংলার টেরাকোটা শিল্পে উত্তর ভারতীয় প্রভাব জনিত দিকটি গবেষকদের নিকট সর্বদাই বিশেষ আকর্ষণের। একারণে নানা জটিলতা সত্ত্বেও বাংলার টেরাকোটা শিল্প আলোচনায় তার সময়কাল নির্ধারণ বা চরিত্র নির্ধারণেও কিন্তু উত্তর ভারতীয় টেরাকোটা শিল্পের ওপর নির্ভর করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তনে নানাবিধ সাংস্কৃতিক প্রভাব যুক্ত হয়েছে সমগ্র ভারতীয় টেরাকোটা শিল্পে বাংলাও যার বাইরে নয়, সেই দিকটিও উল্লেখযোগ্য। তবে আবার বহু ক্ষেত্রে এই সকল সমন্বয়ের বাইরে বাংলার নিজস্ব স্থানীয় ধারাও কিন্তু বিকাশমান ছিল যা বাংলার শিল্প ঐতিহ্যকে এক বিশেষ স্থান প্রদান করে। এই অধ্যায়ে মূলত ২দিক থেকেই অর্থাৎ এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে চন্দ্রকেতুগড় – মহাস্থানগড় এর সহিত বিভিন্ন অঞ্চলের পারস্পরিক সম্পর্ককে টেরাকোটা শিল্পের আলোকে বিচারের প্রয়াস করা হবে, একটি তার নিকটবর্তী বিভিন্ন অঞ্চল সমূহের সহিত অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এবং দ্বিতীয়ত উত্তর ভারতীয় অঞ্চলের সহিত এই ২টি অঞ্চল তথা সমগ্র বাংলার পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান, এবং তা কিভাবে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার সংস্কৃতিকে প্রকাশিত করে তার উপস্থাপন।

বিভিন্ন প্রত্নস্থলগুলির মধ্যে এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিষয় বা প্রতীকের প্রাসঙ্গিকতা ও গ্রহণযোগ্যতার দিকটিকে উপস্থাপিত করে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে কিরূপ আদর্শ বা চেতনা গ্রহন করছে তথা পূর্ব প্রচলিত বা কেন্দ্রীয় অঞ্চল সমূহের শিল্পধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিল নাকি নিজস্ব স্বকীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল সেই বিষয়গুলির অনুধাবনে এজাতীয় আলোচনা বিশেষ ফলপ্রসূ বলে অনুমান করা যেতে পারে। চন্দ্রকেতুগড় সহ উক্ত অঞ্চলের নিকটবর্তী বা সামঞ্জস্যপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গে আদি ঐতিহাসিক পর্বীয় যে সকল প্রত্নস্থলগুলির অনুসন্ধান পাওয়া যায় সেখানে আদি বাংলার টেরাকোটা শিল্পের সমৃদ্ধ নিদর্শন লক্ষণীয়। চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থান ছাড়াও অধুনা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রত্নস্থলগুলি মানচিত্র ও ছকের[১] মাধ্যমে তুলে ধরা হল-

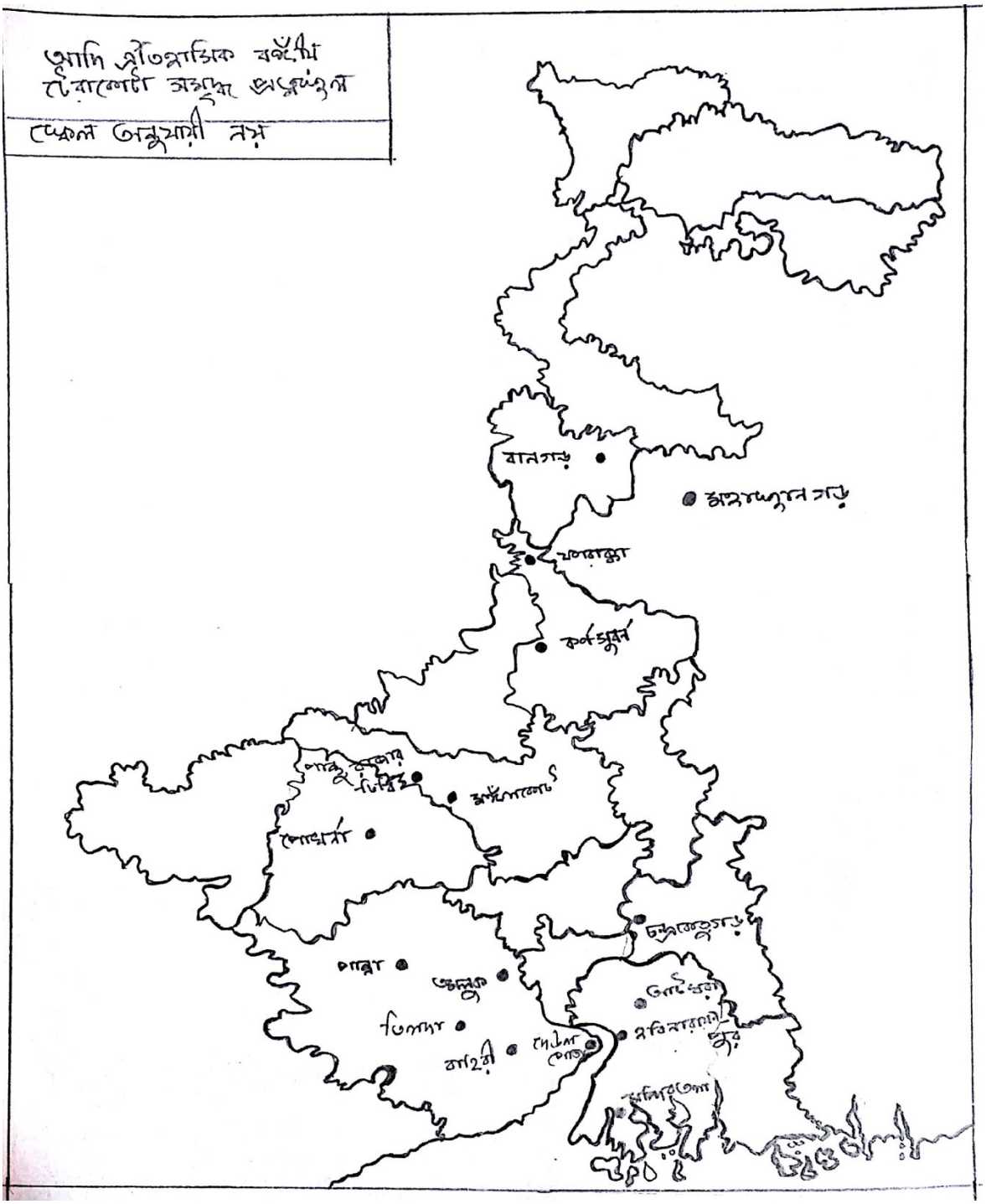

আদি ঐতিহাসিক বাংলার পোড়ামাটি শিল্পকেন্দ্র সমূহ

সৌজন্যে- সীমা রায় চৌধুরী, 'আর্লি হিস্টোরিক টেরাকোটাস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ স্টাডি ইন থিমস্ অ্যান্ড মোটিফস' ("প্রত্নসমীক্ষা", খণ্ড- ৪ ও ৫, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম গভঃ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৯৫-৯৬, পৃষ্ঠা- ৮৮) প্রবন্ধে উপস্থাপিত মানচিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত।

জেলার নাম	প্রত্নস্থল
দিনাজপুর	বাণগড়
বর্ধমান	মঙ্গলকোট, পাণ্ডু রাজার ঢিবি, বানেশ্বরডাঙা, ভরতপুর
বীরভূম	কোটাসূর,নানুর, বাহিরি
মুর্শিদাবাদ	ফারাক্কা, রাজবাড়িডাঙা
মেদিনীপুর	তমলুক, বাহিরি, পান্না,তিলদা, নাটশাল
বাঁকুড়া	দিহার, পোখন্না
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	হরিনারায়নপুর, তিলপি, ধোসা, দেউলপোতা, গোসাবা

অপর দিকে উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রত্নস্থল বা টেরাকোটার প্রাপ্তিস্থলগুলিও এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেক্ষেত্রে মূলত অধুনা বিহার ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য জেলায় প্রাচীন প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া যায়, যার শিল্পখ্যাতি অনবদ্য। তবে এখানে স্বল্প পরিসরে কেবল রাজ্যের ভিত্তিতে প্রত্নস্থল গুলিকে উল্লেখ করা হল[২] –

রাজ্যের নাম	প্রত্নস্থল
বিহার	চিরান্দ,মানঝি,বেলওয়া,বলিরাজগড়,বাসার,বৈশালী,হাজিপুর,লৌড়িয়-নন্দনগড়, কুমরাহার,বুলন্দীবাগ,পাটলিপুত্র,রাজগীর,নালন্দা,শোনপুর,তারাদিহ,চৌসা,বক্সার, অ্যান্টিচক,চম্পা প্রভৃতি ।
উত্তরপ্রদেশ	অহিচ্ছত্র,অত্রাঞ্জিখেরা,আলিগড়,আলমগিরপুর,ভিটা,ভিতরগাঁও,ঘোষি,হস্তিনাপুর,ইন্দোর, কনৌজ,কৌশাম্বী,মথুরা,রাজঘাট,সহেত-মাহেত,সারনাথ প্রভৃতি ।

বাংলা সহ গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাপ্ত সমগোত্রীয় অবয়ব সমূহঃ

সামগ্রীক রূপে টেরাকোটা শিল্প বিকাশের ধারাবাহিক পর্যায়ক্রম অনুসারেই এইরূপ আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো যেতে পারে। ইতিপূর্বে চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটি অবয়বগুলির চরিত্র, বৈশিষ্ট্য বা সম্পৃক্ত প্রতীকী সমূহের আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিশেষ উল্লেখ্য নিঃসন্দেহেই কেবল এই ২টি কেন্দ্রের নিরিখে সামগ্রীক সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া

সম্ভব নয়। তাই এই অধ্যায়ে মূলত বাংলার অন্যান্য প্রত্নস্থল এবং উত্তর ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্প সমৃদ্ধ প্রত্নস্থলে উপরিউক্ত ধারার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অবয়ব প্রাপ্তির বিষয়টিকে নথীবদ্ধ করা হবে। প্রথমেই বলা যায় প্রাথমিক পর্যায়ের হাতে গড়া পোড়ামাটি অবয়বের কথা ইতিহাসের পাতায় যার গুরুত্ব অসামান্য। আমরা দেখেছি এই শিল্প সৃষ্টির প্রাথমিক রূপ হিসেবেই পাওয়া যায় আদিম শৈলীর টেরাকোটা নারীমূর্তিগুলি যাকে 'মাতৃকাশক্তির' রূপ বলে কল্পনা করা হয়ে থাকে । চন্দ্রকেতুগড় বা মহাস্থানগড়ের পাশাপাশি বাংলার উপরিউক্ত অসংখ্য প্রত্নস্থলে এইরূপ মূর্তির সন্ধান মেলে। যেমন প্রথমেই বলা যায় বর্ধমানের মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত একশ্রেণীর অবয়বের কথা মূলত খানিক স্তম্ভাকৃতি দেহ, ২ পাশে বাইরের দিকে হাত ছড়ানো, নিরলংকার দৈহিক আঙ্গিক যা প্রাথমিক পর্বের মাতৃকাশক্তির প্রতীক রূপে গৃহীত। (চিত্র নং-১ক) এই একই ধাঁচের মূর্তি যেমন বাংলার অন্যত্রও পাওয়া যায় তেমনই উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন অঞ্চলেও এই ধাঁচের অসংখ্য মূর্তি মেলে যার মধ্যে এলাহাবাদের ভিটায় প্রাপ্ত একটি হুবহু এইরূপ মূর্তির উল্লেখ করা চলে যাকে পরমেশ্বরী লাল গুপ্তা 'নক্ষত্রাকৃতি' বা 'Star shaped' অবয়ব বলে উল্লেখ করেছেন। (চিত্র নং-১খ) কেবল এই অবয়বই নয়, সূক্ষ্ম দৈহিক পার্থক্যে অজস্র এইরূপ মাতৃ অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সহ উত্তর ভারতীয় বিপুল কেন্দ্রে। যা সামগ্রীক রূপে এই অবয়বের প্রাসঙ্গিকতা ও এর সহিত সম্পর্কিত ধর্মীয় চেতনার দিকটিকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে।

১ক

১খ

চিত্র-১ক হস্ত নির্মিত প্রাথমিক পর্যায়ের পোড়ামাটি অবয়ব , মঙ্গলকোট, সৌজন্যে – অমিতা রায়, 'টেরাকোটাস ফ্রম এক্সক্যাভেশনস অ্যাট মঙ্গলকোট (বর্ধমান)' ; জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, খণ্ড ১, ১৯৯৬ পৃষ্ঠা- ২০

চিত্র-১খ হস্ত নির্মিত প্রাথমিক পর্যায়ের পোড়ামাটি অবয়ব, ভিটা, সৌজন্যে- পি এল গুপ্তা, 'গাঙ্গেটিক ভ্যালী টেরাকোটা আর্ট' , পৃথিবী প্রকাশনী, বারাণসী-৫(ইন্ডিয়া), ১৯৭২ (Fig.1)

আবার পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অর্ধ মানবী-অর্ধ নাগিনী (চিত্র নং-২ক) অবয়বের কথা উল্লেখ করা চলে যার অনুরূপ মূর্তি আবিষ্কৃত হয় গাঙ্গেয় উপত্যকার একাধিক অংশে যথা- পাটনা, বৈশালী, পাটলিপুত্র, চম্পা, সোনপুর, চিরান্দ, মথুরা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রত্নস্থলে।[৩] একাধারে বাংলা ও উত্তর ভারতীয় একাধিক প্রত্নস্থলে এজাতীয় অবয়বের উপস্থাপনা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সমঐতিহ্যের পরিচয় দেয় অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রেই নাগ উপাসনা সংক্রান্ত রীতির উপস্থিতির দিকটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং পাশাপাশি অনুরূপ নির্দিষ্ট আঙ্গিকের অবয়বের প্রচলনের দিকটিকেও প্রকাশিত করে। এই অবয়বের সহিত সম্পর্কিত দর্শনের দিকটি পূর্ববর্তী অধ্যায়েই তুলে ধরা হয়েছে। নীচে মথুরা থেকে আবিষ্কৃত অনুরূপ একটি সর্পিণী অবয়ব তুলে ধরা হল যা সম্পূর্ণতই পূর্ববর্তীটির ন্যায় অনুরূপ উপস্থাপনা।(চিত্র নং-২খ) এর প্রাসঙ্গিকতা দীর্ঘদিন বজায় ছিল সন্দেহ নেই যার প্রমাণ মেলে কুষান বা তৎপরবর্তী সময়কালেও এইরূপ অবয়বের নিদর্শন থেকে।[৪]

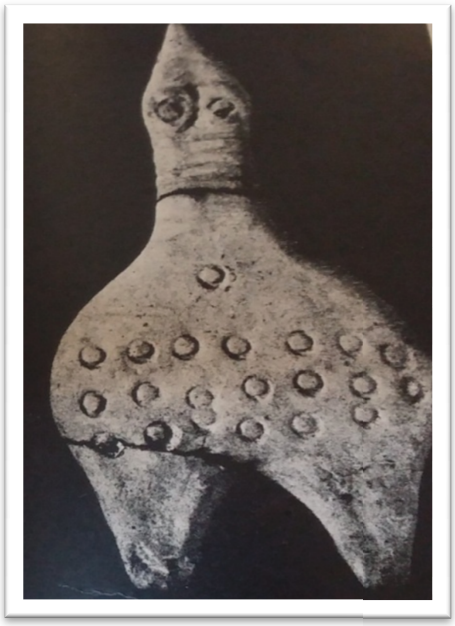

২ক

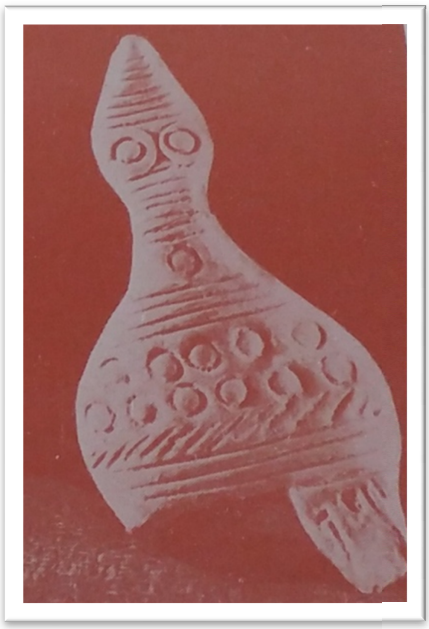

২খ

চিত্র-২ক হাতে গড়া অর্ধ মানবী- অর্ধ নাগিনী অবয়ব, চন্দ্রকেতুগড়,সৌজন্যে এস এস বিশ্বাস, আগম কলা প্রকাশন,দিল্লী, ১৯৮১(Plate- vii)

চিত্র-২খ হাতে গড়া অর্ধ মানবী- অর্ধ নাগিনী অবয়ব, মথুরা সৌজন্যে এস সি কলা, 'টেরাকোটাস অফ নর্থ ইন্ডিয়া' আগম কলা প্রকাশন,দিল্লী, ১৯৯৩ পৃষ্ঠা- ২৩

এর পরবর্তীতে মৌর্য শৈলীর পোড়ামাটি অবয়বের কথায় আসা যাক, সাধারণত বাংলায় টেরাকোটা শিল্প বিকাশের মূল সূচনাপর্ব হিসেবে মৌর্য পর্বকেই ধরা হয়ে থাকে। বাংলায় নগরায়নের প্রথম পর্ব মৌর্য সাম্রাজ্যাধীন অবস্থায়। উক্ত সময় থেকেই সামগ্রীক ভাবে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত বাংলার সংযোগের সূত্রপাত বলে মনে করা হয় এবং পাশাপাশি মহাস্থানে মৌর্যলিপির আবিষ্কার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এন বি পি শৈলীর মৃৎপাত্র বা পাঞ্চ মার্কড মুদ্রার প্রাপ্তি মৌর্য শাসনের সহিত বাংলার সংযোগের ইঙ্গিত দেয়, যার প্রভাব পোড়ামাটি শিল্প ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত । ফলস্বরূপ উক্ত সময় থেকে এই শিল্পে প্রযুক্ত রীতি-পদ্ধতি কিংবা শিল্প উপস্থাপনের পশ্চাতের চিন্তাশক্তি সর্বত্র উত্তর ভারতীয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটে বলে ঐতিহাসিক, গবেষকবৃন্দ মনে করে থাকেন। মৌর্যকালীন অবয়বের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধ পাটনা, বুলন্দীবাগ প্রভৃতি প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত উড়ন্ত স্কার্ট, মেডালিয়ন বা বিচিত্র ধাঁচের উষ্ণীষ ও অলংকার জাতীয় উপাদান সহ কিছুটা নৃত্যরত ভঙ্গিতে স্থিত নারীমূর্তি, সাধারণত বাম হাত কোমরে ও ডান হাতে কখনো বস্ত্রের শীর্ষভাগ ধরে আছেন কখনো বা কোন ডুগডুগি জাতীয় উপাদান। বর্তমানে পাটনা মিউজিয়াম-এ এই জাতীয় একাধিক অবয়ব সুসংরক্ষিত রূপে পাওয়া যায়। (চিত্র নং-৩ক) এর অনুরূপ অবয়ব পাওয়া যায় উত্তর ভারতীয় অন্যান্য প্রত্নস্থলের পাশাপাশি বাংলাতেও। বিশেষত তমলুক চন্দ্রকেতুগড়ের নাম এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যেখানে এই ধাঁচের অবয়বের সন্ধান মেলে।(চিত্র নং-৩খ,৩গ) যা আবারও বাংলার সহিত উক্ত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের সাক্ষ্য দেয়। সাধারণত এধরনের অবয়বগুলি ২টি ছাঁচের ব্যবহারে নির্মিত বলে মনে করা হয়ে থাকে। নীচে বাংলা ও বিহার অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত এইরূপ সমজাতীয় অবয়বের চিত্র উপস্থাপনা করা হল যেখানে ৩টি পৃথক স্থান থেকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলিকে পাশাপাশি উপস্থাপিত করলে তার সহিত সম্পৃক্ত শিল্পআদর্শের অসামান্য সংযোগ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে খুব সহজেই -

চিত্র নং- ৩ক, ৩খ, ৩গ (যথাক্রমে বাম থেকে ডানে)

চিত্র নং- ৩ক মৌর্য শৈলীর স্কার্ট পরিহিতা নারীমূর্তি, পাটনা, পাটনা মিউজিয়াম, সৌজন্যে- দেবাঙ্গনা দেশাই, ‘এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস ইন দেয়ার সোশ্যাল কনটেক্সট’ (৬০০ বি সি ই – সি ই ৬০০) ইন “আর্ট অ্যান্ড আইকনঃ এসেস অন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট”, আরিয়ান বুকস ইন্টারন্যাশনাল , ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৫৫

চিত্র নং- ৩খ মৌর্য শৈলীর উত্তর ভারতীয় ধাঁচের স্কার্ট পরিহিতা নারীমূর্তি (যক্ষী), তমলুক, সৌজন্যে- এস এস বিশ্বাস, আগম কলা প্রকাশন,দিল্লী, ১৯৮১ Plate-v(a)

চিত্র নং- ৩গ মৌর্য শৈলীর উত্তর ভারতীয় ধাঁচের স্কার্ট পরিহিতা নারীমূর্তি, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- এস এস বিশ্বাস, আগম কলা প্রকাশন,দিল্লী, ১৯৮১ Plate-vi

আদি ঐতিহাসিক পর্বীয় ভারত ইতিহাসে টেরাকোটা শিল্প ধারায় সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল শুঙ্গ-কুষান অধ্যায়। শুঙ্গ পর্যায় থেকেই একাধারে সংখ্যাগত উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুনত্ব প্রযুক্তির উদ্ভব বা শিল্পের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভাবনীয় নতুনত্ব আসে। বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সূত্রে একাধারে বণিক ও কারিগরদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। গিল্ডের উত্থানের সূত্রে কারিগরদের ওপর রাজকীয় কর্তৃত্ব শিথিল হয় ফলে তারা বহুলাংশে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে পারিশ্রমিক অর্জনের ব্যবস্থা আরও স্বাচ্ছন্দ্যে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাদের সহায়ক হয়। এই সার্বিক পটভূমি পোড়ামাটি শিল্পকে ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান প্রদান করে সন্দেহ নেই। যদিও শুঙ্গ শাসনকাল

মৌর্যদের ন্যায় রাজনৈতিক ভাবে সুবৃহৎ বা সুদীর্ঘ কোনটাই ছিলনা কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে তারা তাঁদের রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে সক্ষম হয় বহুদূর। তেমনই কুষানপর্ব ভারত ইতিহাসের অন্যতম সমৃদ্ধ অধ্যায়। এই সময়েই রোম ও হেলেনীয় জগতের সাথে বাণিজ্যিক সংযোগের সূত্রে বিদেশী সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ ঘটে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে, ফলে তার প্রভাব পড়ে শিল্পেও। সেসময় একদিকে যেমন পুরনো ধারা আরও সমৃদ্ধি অর্জন করে স্ব-মহিমায় বজায় ছিল তেমনই এক নতুন ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রে। নতুন ধারায় মূলত যুগ্ম ছাঁচের ব্যবহার শুরু হয় যা প্রাপ্ত বিভিন্ন গোলাকৃতি অবয়ব নির্মাণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, পাশাপাশি পূর্বের সম্পূর্ণ হস্ত নির্মিত প্রক্রিয়াও পুনরায় এসময় প্রাধান্য লাভ করে। এরই সাথে খুব স্বাভাবিক নিয়মে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু বা তার আঙ্গিকেও সমন্বয়ী আদর্শ পরিলক্ষিত হয় যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্পের বিকাশে স্মরণীয় অধ্যায়। তবে আবার এরূপ সমৃদ্ধির যুগেও বহুক্ষেত্রে টেরাকোটা অবয়বের গুনগত মান হ্রাস পেয়েছিল বলে দেবাঙ্গনা দেশাই উল্লেখ করেছেন, কেননা সম্ভবত বাজারের বিপুল চাহিদা পূরণে শিল্পীরা গুনগত সমৃদ্ধি অপেক্ষা সংখ্যাগত সমৃদ্ধিতে অধিক নজর দিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। পরবর্তী গুপ্ত অধ্যায় তো সার্বিক ভাবেই সমৃদ্ধির যুগ বলে পরিচিত, ফলে টেরাকোটা শিল্পও তা থেকে বাদ থাকেনি। এই পর্বে উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিবর্তন আসে, এই সময় থেকেই মন্দির গাত্রে টেরাকোটার প্রয়োগ শুরু হয়।[৫]

মূলগত ভাবে উত্তর ভারতকে কেন্দ্র করে এই সামগ্রীক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও এবং বাংলায় অদ্যাবধি সরাসরি শুঙ্গ- কুষান শাসনের কোন উল্লেখ না পাওয়া গেলেও বাংলা কিন্তু এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেনি, এই বৈপ্লবিক শিল্পধারা বাংলাতেও ব্যাপক রূপে প্রভাব বিস্তার করে। ফলস্বরূপ বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে এই ধারার অসংখ্য পোড়ামাটি শিল্প উপাদান আজ আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। সেই প্রেক্ষিত থেকে বাংলা কতটা এই শিল্পধারার সহিত সম্পৃক্ত ছিল আর কতটাই বা নিজ স্বকীয় শিল্পধারার বিকাশ ঘটিয়েছিল তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেই উদ্দেশ্যেই বিষয়বস্তু বা শৈলীগত উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে এক তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস গৃহীত।

শুঙ্গ পর্ব থেকে উপস্থাপিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে নতুনত্ব এলেও বা সৃষ্ট অবয়বের সৌন্দর্যায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হলেও শিল্পের সহিত ধর্মচেতনার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কিন্তু এই পর্বেও যথাযথই বিদ্যমান ছিল। প্রথমেই বলা যায় যক্ষী উপাসনার কথা যা মূলত লোকায়ত ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক। বাংলা সহ সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার বৃহৎ অংশ জুড়ে প্রাপ্ত

টেরাকোটা অবয়বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও চর্চিত অবয়ব হল যক্ষী অবয়ব। যার বিস্তীর্ণ আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে যেখানে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ভিন্ন রীতির যক্ষিণী অবয়বের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বাহ্যিক উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য থাকলেও সামগ্রীক রূপে যক্ষী উপস্থাপনার প্রাধান্য নিয়ে সংশয়ের কোন ক্ষেত্র নেই। এই শ্রেণীর উপস্থাপনায় চন্দ্রকেতুগড়ের নাম বিশেষ উল্লেখ্য, এছাড়া বাংলার অন্যান্য প্রায় অধিকাংশ প্রত্নস্থলেই এর উপস্থিতি রয়েছে। যদিও দৈহিক উপস্থাপনের সূক্ষ্মতা, প্রযুক্ত কলাকৌশল সব ক্ষেত্রেই উত্তর ভারতীয় ঐতিহ্যের ভূমিকা থাকলেও আপেক্ষিক দৃষ্টিতে উক্ত প্রত্নস্থলগুলি অপেক্ষা বাংলায় এই পোড়ামাটি যক্ষিণী প্রাপ্তির পরিমাণ অধিক বলেই মনে হয়। বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত কিছু যক্ষী অবয়ব উপস্থাপিত হল (চিত্র নং – ৪ক, ৪খ, ৪গ, ৪ঘ, ৪ঙ)

চিত্র নং– ৪ক,৪খ,৪গ(যথাক্রমে বাম থেকে ডানে)

চিত্র নং– ৪ক পঞ্চচূড়া যক্ষী, হরিনারায়নপুর, ছাঁচ নির্মিত অবয়ব, সৌজন্যে - ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৯

চিত্র নং– ৪খ পঞ্চচূড়া যক্ষী, মঙ্গলকোট, ছাঁচ নির্মিত অবয়ব, সৌজন্যে - ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’ প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা- ৬৫

চিত্র নং– ৪গ পঞ্চচূড়া যক্ষী, চন্দ্রকেতুগড়, ছাঁচ নির্মিত অবয়ব, সৌজন্যে- চন্দ্রকেতুগড় স্মৃতি শহীদুল্লাহ মহাবিদ্যালয় সংগ্রহালয়, ব্যাক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত।

(৪ঘ) (৪ঙ)

চিত্র নং– ৪ঘ পঞ্চচূড়া যক্ষী (MAH 95.1573), মহাস্থানগড়, ছাঁচ নির্মিত অবয়ব, সৌজন্যে- মহম্মদ শফিকুল আলম ও Jean-Francois SALLES সম্পাদিত "ফ্রান্স বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়", ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট ১৯৯৩-১৯৯৯, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি,বাংলাদেশ, ২০০১ , পৃষ্ঠা- ১১৬

চিত্র নং– ৪ঙ পঞ্চচূড়া যক্ষী, মথুরা, ছাঁচ নির্মিত অবয়ব, সৌজন্যে- শিবানী আগরওয়াল, 'টেরাকোটাস ফ্রম মথুরা অ্যান্ড অহিচ্ছত্রঃ অ্যান আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি (৪০০ বিসি টু সেভেন্থ/এইটথ্ সেঞ্চুরি এডি)',, উপিন্দর সিং অ্যান্ড নয়নজ্যোৎ লাহিড়ী এডিটেড "এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া নিউ রিসার্চ", অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী , ২০০৯, পৃষ্ঠা- ২৪০

এখানে বেশ কিছু যক্ষী অবয়ব উপস্থাপনা করা হল যেগুলি যথাক্রমে হরিনারায়নপুর, মঙ্গলকোট, চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় ও মথুরা থেকে প্রাপ্ত। চিত্র গুলি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় প্রতিটি মূর্তিই কিন্তু বহুলাংশে একই ধাঁচের চিন্তাধারা তুলে ধরে। সর্বত্রই জাঁকজমক পূর্ণ নারী অবয়ব তুলে ধরা হয়েছে, গলায় নেকলেস, কানে বৃহৎ দুল, কোমরে কটিবন্ধ, হাতে বালা এবং সর্বোপরি উল্লেখ্য কেশবিন্যাশ। উল্লেখ্য উক্ত পর্বের নারী বা পুরুষ অবয়বে কেশসজ্জায় অধিক গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়, দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই চুল খোপা জাতীয় বাঁধা এবং তার মধ্যে নানান কারুকার্য। প্রদর্শিত চিত্রের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত অবয়বগুলি ৫টি আয়ুধ সম শলাকা দ্বারা সজ্জিত উপস্থাপনা, যার অনুরূপ উপস্থাপনা লক্ষ করা যায় মথুরার ক্ষেত্রেও এবং আরও একাধিক কেন্দ্রে। আর বলা বাহুল্য এই 'পঞ্চশলাকা' আলোচ্য যক্ষিণী অবয়বগুলির সহিত সম্পৃক্ত প্রধান প্রতীকী। তবে বঙ্গীয় উপস্থাপনায় এর কিছু নিজস্বতাও রয়েছে যা অধ্যায়ের শেষে

তুলে ধরা হবে। এছাড়া সর্বত্রই নারী দেহের যে রূপ-সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা অসামান্য। গোলাকৃতি মুখ, বড় চোখ, উন্মুক্ত স্তন, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ মধ্যদেশ, গুরু নিতম্ব প্রভৃতি সবকিছু একাধারে নারী সৌন্দর্যকে যেমন তুলে ধরে তেমনই অন্যান্য মাতৃ দেবীর ন্যায় এই অবয়বকেও উর্বরতার প্রতীক রূপে উপস্থাপিত করণের জন্যই দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্পষ্টতার উপস্থাপনা বলে মনে করা হয়। তবে যাইহোক যক্ষী 'কাল্ট' সম্পর্কিত চেতনা যে উত্তর ভারত বা বাংলা সর্বত্রই পরিচিত ছিল সমৃদ্ধ যক্ষী মূর্তির প্রাচুর্যই তার প্রমাণ এবং পাশাপাশি শিল্প নির্মাণ, কলাকৌশল ও সম্পৃক্ত প্রতীকও যে উভয় ক্ষেত্রে সমরূপে বিকাশ করেছিল তারও ইঙ্গিত এই মূর্তিগুলি।

এছাড়া বেশ কিছু ফলকে কেন্দ্রীয় যক্ষী অবয়বটি এক বা একাধিক সঙ্গী সহযোগে দৃশ্যমান, যেখানে অন্যান্য অবয়ব অপেক্ষা কেন্দ্রীয় মূর্তির বৃহদাকৃতি তার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়। শুধু চন্দ্রকেতুগড় নয় একই ধরণের উপস্থাপনা লক্ষ করা যায় বাংলা তথা ভারতের একধিক প্রত্নস্থলে; অহিচ্ছত্র, মথুরা প্রভৃতি নানান স্থল থেকে আবিষ্কৃত সঙ্গীসহ যক্ষী মূর্তির উপস্থাপনাও এপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানে বিষয় উপস্থাপনের ধরণ কিংবা যক্ষী মূর্তির দৈহিক উপস্থাপনা,বসন-ভূষণ ইত্যাদি চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত যক্ষী অবয়বগুলির কথাই মনে করায়। স্বল্প পরিসরে সকল চিত্র উপস্থাপন সম্ভব নয়,তাই নিম্নে কিছু চিত্র উপস্থাপন দ্বারা এই সমন্বয়ের দিকটিকে বোঝার চেষ্টা করব(চিত্র ৫ক,৫খ) -

৫ক

৫খ

চিত্র নং-৫ক সঙ্গিনী সহযোগে উপস্থাপিত যক্ষিণী মূর্তি ,চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা- ৮১

চিত্র নং-৫খ সঙ্গিনী সহযোগে উপস্থাপিত যক্ষিণী মূর্তি, মথুরা, সৌজন্যে- পি এল গুপ্তা, ‘গাঙ্গেটিক ভ্যালী টেরাকোটা আর্ট’ (Fig.97,98)

ইতিপূর্বেই দেখা গেছে কেবল যক্ষী নয় একাধিক যক্ষ বা কুবের অবয়বেরও সন্ধান মেলে বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে। যিনি মূলত সম্পদের দেবতা রূপে পরিচিত। একাধিক কুবের বা যক্ষ মূর্তির সন্ধান মেলে বাংলায় মূলত চন্দ্রকেতুগড় সহ উত্তর ভারতীয় বহু কেন্দ্রে। আবার কুবের ছাড়াও বেশ কিছু সমজাতীয় খর্বকায় বিকৃত চেহারার অবয়ব মেলে যেগুলিকে সাধারণভাবে দানব বা দৈত্য রূপে কল্পনা করা হলেও এর নিশ্চিত ব্যবহার বা এরূপ শিল্প সৃষ্টির পশ্চাতে উদ্দেশ্য কি ছিল তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়না। বাংলা বা বিহারাঞ্চল সর্বত্রই এরূপ অবয়ব লক্ষণীয়। নিম্নে চন্দ্রকেতুগড় ও কৌশাম্বী থেকে আবিষ্কৃত ২টি কুবের অবয়ব তুলে ধরা হল- এক্ষেত্রে প্রথম অবয়বটি (চিত্র-৬ক) চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত কুবের মূর্তি, যেখানে সে তার স্থূল উদর, সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত টুপি জাতীয় মুকুট বা পাগড়ি, কানে,গলায়,হাতে,পায়ে সমৃদ্ধ অলংকার, ডান হাতে সম্ভবত পদ্মফুল নিয়ে স্ব-মহিমায় উপস্থিত। অনুরূপভাবেই পার্শ্ববর্তী চিত্রটিতে (চিত্র-৬খ) পরিলক্ষিত কৌশাম্বী থেকেও সমগোত্রীয় পোড়ামাটি অবয়বের সন্ধান মেলে; গোলাকৃতি ঈষৎ

ফাঁপানো চেহারা, চন্দ্রকেতুগড়ের মূর্তিটির ন্যায় প্রায় অনুরূপ কারুকার্যমণ্ডিত উষ্ণীষ লক্ষণীয় তবে দেহের নীচের অংশটি ভাঙা। যদিও ২টি পৃথক অঞ্চলের উপস্থাপনা কিন্তু নির্বাচিত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এর পশ্চাতে নিহিত শিল্পীর চেতনা বা উদ্দেশ্য ছিল একই।

৬ক

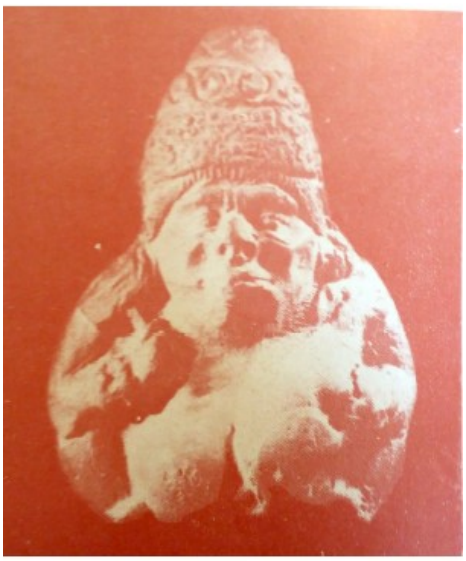
৬খ

চিত্র নং-৬ক যক্ষ (কুবের) অবয়ব, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে-'এলোকোয়েন্ট আর্থ' প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা- ১০৫
চিত্র নং-৬খ যক্ষ অবয়ব, কৌশাম্বী, সৌজন্যে-'এস সি কলা,'টেরাকোটাস অফ নর্থ ইন্ডিয়া',প্রাগুক্ত প্লেট-৩১

আলোচ্য সময় পর্বে আমরা দেখি টেরাকোটা শিল্প ধারায় উপস্থাপিত অবয়বের মধ্যে অধিকাংশই মাতৃশক্তির উপস্থাপনা, যাদের সাধারণত সম্পদ, সমৃদ্ধি, উর্বরতার প্রতীক স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।যার মধ্যে অন্যতম উল্লেযোগ্য অবয়ব সম্পদ বা সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীলক্ষ্মীর উপস্থাপনা। যদিও তার নাম বা পরিচিতি অপেক্ষা তার পশ্চাতে নিহিত চেতনা যে উক্ত সময় প্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্য বলা বাহুল্য। এই অবয়ব সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা বা উক্ত অবয়বের ক্রমবিকাশের দিকটিও ইতিপূর্বেই ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত। সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে যে মৎস্য আকৃতির ফলকের ওপর দুদিকে পদ্মনাল সহ প্রস্ফুটিত পদ্মে দণ্ডায়মান নারী মূর্তির উল্লেখ করা হয়েছে তার আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগের কথা বলেছেন। এই মূর্তিটির উপস্থাপনা বেশভূষা বা ফলকের সীমানা অলংকরণ এবং শৈলীগত রূপায়নে উত্তর ভারতীয় শুঙ্গ কালীন বহু নারীমূর্তি ও তথাকথিত শুঙ্গ শৈলীর সামঞ্জস্য রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে বাহ্যিক পরিকল্পনায় বহিরাগত যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও মুখমণ্ডলের রূপায়নে বঙ্গের শিল্পীর নিজস্বতা ফুটে উঠেছে বলেও মন্তব্য করেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ বাবু।[৬]

অর্থাৎ বঙ্গীয় মৃৎশিল্প নির্মাণে উত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য, শৈলীর প্রত্যক্ষ প্রভাবের দিকটি পরিস্ফুট হয় তাঁর এই আলোচনার মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি লক্ষ করলে দেখা যাবে চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক, বানগড়, হরিনারায়নপুর এর ন্যায় বাংলার বিবিধ প্রত্নস্থল সহ উত্তর ভারতীয় মথুরা, কৌশাম্বী, লৌড়িয়-নন্দনগড় প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদ্মসহ নারী অবয়বের অসংখ্য উপস্থিতি লক্ষণীয় যাকে সম্পদ সমৃদ্ধির দেবী বা শ্রীলক্ষ্মী অবয়ব রূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে।[৭] উল্লেখ্য এই শ্রেণীর অবয়বের বাহ্যিক আঙ্গিক কিন্তু সর্বত্র এক নয়, তবে মূল প্রতীক স্বরূপ পদ্মের উপস্থিতি তাঁর পরিচিতিকে ইঙ্গিতবাহী করে তোলে বলা যাতে পারে। পাশাপাশি উর্বরতার সহিত সম্পর্কিত অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ অবয়ব হল 'শস্যদেবীর' উপস্থিতি, ইতিপূর্বে বাংলায় যার উপস্থাপনা আমরা দেখেছি। উল্লেখ্য উত্তর ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও কিন্তু একইভাবে কেশবিন্যাসে শস্যদানা সংলগ্ন নারী অবয়ব পরিলক্ষিত হয় যা উক্ত অবয়ব সম্পর্কিত কাল্টের উপস্থিতির ক্ষেত্রটিকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলে। নিম্নে বাংলা এবং মধ্য গাঙ্গেয় অঞ্চল থেকে পদ্মসংলগ্না মাতৃ অবয়ব(চিত্র নং-৭ক,৭খ) এবং শস্য সংলগ্না মাতৃ অবয়বের(৭গ,৭ঘ) উপস্থাপনা করা হল।

৭ক

৭খ

চিত্র নং-৭ক পদ্মসংলগ্না মাতৃ অবয়ব, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-
চিত্র নং-৭খ পদ্মসংলগ্না মাতৃ অবয়ব, কৌশাম্বী, সৌজন্যে- শান্তি লাল নগর, ইন্ডিয়ান গডস্ অ্যান্ড গডেসেসঃ ভলিউম ৫, 'ডিটিস ইন টেরাকোটা আর্ট'- ফ্রম আর্লিয়েষ্ট টাইমস টু লেট, বি আর পাবলিকেশন , নিউ দিল্লী, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ২৬

৭গ

৭ঘ

চিত্র নং-৭গ শস্যদেবী/ধান্যদেবী, চন্দ্রকেতুগড়, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক, সৌজন্যে- "এলোকোয়েন্ট আর্থ", প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৪

চিত্র নং-৭ঘ শস্যদেবী, কৌশাম্বী, দেবাঙ্গনা দেশাই - 'এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস ইন দেয়ার সোশ্যাল কনটেক্সট' (৬০০ বি সি ই – সি ই ৬০০) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬১

এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রকেতুগড় ও মথুরা উভয় অঞ্চলে উক্ত সময়কালীন অন্যান্য দেবীমূর্তির ন্যায় দৈহিক উপস্থাপনার পাশাপাশি প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে ডান হাতে ঝুলন্ত মাছের উপস্থিতি সহ 'মৎসদেবী'র উপস্থিতিও লক্ষণীয়। চন্দ্রকেতুগড়ে ২টি এবং মথুরায় ৩টি মাছের উপস্থিতি দেখা যায়। মাছ সাধারণত সমৃদ্ধি ও প্রজনন স্বত্তার প্রতীক, শতপথ ব্রাহ্মণ বা যজুর্বেদ এর নানা ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে এর মঙ্গল সূচকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৮] তাই সম্ভবত আলোচ্য কালপর্বে সমৃদ্ধি ও উর্বরতার সহিত সম্পর্কিত দেবীর প্রতীক রূপে একে গ্রহন করা হয়েছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে।

এই সমৃদ্ধি, উর্বরতা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে অপর একটি অবয়ব উল্লেখ করা যেতে পারে, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যার আলোচনায় চন্দ্রকেতুগড়ে উক্ত অবয়ব প্রাপ্তির প্রমাণ মেলে। সেখানে মূলত সন্তান প্রসব ভঙ্গীতে এক নারী অবয়বের উপস্থাপনা করা হয়েছে যা খুব নিশ্চিত রূপেই

মানুষের উর্বরতা বা সন্তান কামনায় মঙ্গলদায়ী উপাদান বলে গৃহীত হত। সমজাতীয় অবয়ব কিন্তু বিদ্যমান উত্তর ভারতীয় একাধিক প্রত্নস্থলে। ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে যাকে সূক্ষ্য দৈহিক পার্থক্যে বা ভিন্ন ভিন্ন নামে পাওয়া যায়। তবে এখানে মূল আঙ্গিক অর্থাৎ সন্তান প্রসব ভঙ্গী কিন্তু সর্বত্র বিদ্যমান এবং বলা বাহুল্য সেটাই এই শ্রেণীর অবয়বের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। সার্বিকভাবে পোড়ামাটি শিল্পধারায় এইরূপ একাধিক প্রতীকের বিস্তার ঘটেছিল শিল্প ইতিহাসে যার গুরুত্ব অসামান্য। চন্দ্রকেতুগড় ও কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত ২টি অবয়বের উপস্থাপনা করা হল।

(৮ক)

(৮খ)

চিত্র- ৮ক সন্তান প্রসব ভঙ্গীতে নারী, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে-এলোকোয়েন্ট আর্থ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭

চিত্র -৮খ সন্তান প্রসব ভঙ্গীতে নারী, কৌশাম্বী, সৌজন্যে- সমীর কুমার মুখার্জ্জী, 'টেরাকোটা আর্ট ইন দ্য গাঙ্গেটিক ভ্যালী আন্ডার দ্য কুষানাস্' ইন প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত "ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচার (দ্য আর্লি পিরিয়ড)", মার্গ পাবলিকেশন, খণ্ড-৫৪, নং-১, ২০০২ পৃষ্ঠা-৮৪

এছাড়াও ধর্মীয় উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক অবয়বের উল্লেখ পাওয়া যায় ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসে যেগুলি একে অপরের সাথে নানাভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন প্রথমেই বেশ কিছু ডানাযুক্ত অবয়বের উল্লেখ করা যায়। ইতিপূর্বেই দেখা গেছে চন্দ্রকেতুগড় থেকে বেশ কিছু ফলকে অলংকার সমৃদ্ধ, পুষ্পশোভিত স্বপক্ষ নারী ও পুরুষ মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এই জাতীয় অনুরূপ অবয়বের সন্ধান মেলে বৈশালী, কৌশাম্বী, বালিরাজগড় প্রভৃতি বিভিন্ন উত্তর ভারতীয় প্রত্নস্থল থেকে। এখানে যথাক্রমে চন্দ্রকেতুগড় ও কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত ২টি অবয়বের চিত্র উপস্থাপিত করা হল, যেখানে প্রতিটি উপস্থাপনার ক্ষেত্রেই পুরুষ অবয়বের সহিত ডানার

উপস্থিতি বিদ্যমান। অবয়ব ২টি তে ব্যবহৃত ছাঁচ নিঃসন্দেহে ভিন্ন যার দরুন বাহ্যিক রূপায়ন পুরোপুরি এক নয় কিন্তু উপস্থাপনার ধরণ, শৈলী, বিষয়বস্তু সম্পূর্ণতই এক। উভয় ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম কারুকার্য মণ্ডিত ডানা ছাড়াও সুগঠিত দেহাবয়ব, জাঁকজমকপূর্ণ অলংকার, কেশবিন্যাস প্রভৃতি স্পষ্টতই লক্ষণীয়। এইরূপ অবয়বের প্রাপ্তি থেকে প্রমাণিত হয় সেসময় ক্রমে স্থান-কালের ঊর্ধ্বে মূর্তি নির্মাণে কিছু নির্দিষ্ট প্রতীকি গড়ে উঠছিল বলা বাহুল্য যা গবেষকদের এইরূপ আলোচনার প্রধান সহায়ক।

চিত্র নং-৯ক

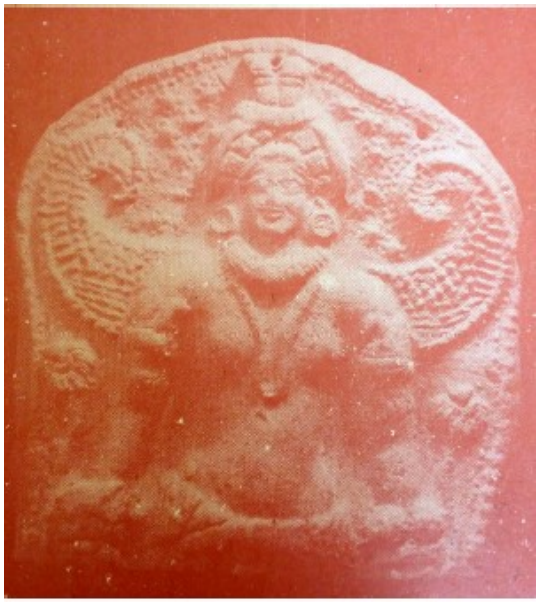

চিত্র নং-৯খ

চিত্র নং-৯ক স্বপক্ষ পুরুষ মূর্তি, ছাঁচ নির্মিত, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- এনামুল হক, ‘চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেসার হাউস অফ বেঙ্গল টেরাকোটাস’, আই সি এস বি এ, ঢাকা ২০০১ পৃষ্ঠা-২৩৬

চিত্র নং-৯খ স্বপক্ষ পুরুষ মূর্তি, ছাঁচ নির্মিত, কৌশাম্বী,সৌজন্যে-‘এস সি কলা,‘টেরাকোটাস অফ নর্থ ইন্ডিয়া’,প্রাগুক্ত প্লেট-42(b)

বাংলায় প্রাপ্ত পোড়ামাটি শিল্পধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কালের ব্যবধানে পরিবর্তিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ক্রমে শিল্পক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন নানান ধর্মীয় উপাদানের উপস্থিতি লক্ষণীয়। উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন প্রত্নস্থলেও কিন্তু একই ঐতিহ্য লক্ষ করা যায়। তবে

মৌর্য শাসন পর্ব থেকেই বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটলেও মোটামুটি কুষান বা গুপ্ত পর্বের আগে কিন্তু বৌদ্ধ মূর্তির কোন সন্ধান পাওয়া যায়না। বর্তমানে কিছু অবয়ব তুলে ধরা হচ্ছে সামগ্রীক রূপে বঙ্গীয় শিল্পধারায় যাদের গুরুত্ব অসামান্য তবে সময়কালের বিচারে কিন্তু সেগুলি অপেক্ষাকৃত বেশ কিছুটা পরবর্তীকালের সৃষ্টি, প্রাথমিক সমাজের চিন্তাধারা থেকে বহুলাংশে ভিন্ন। যেমন প্রথমেই এক্ষেত্রে তমলুকে প্রাপ্ত আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীয় একটি বোধিস্বত্ত অবয়বের কথা বলা চলে, যার আনত অর্ধ- নিমীলিত চক্ষুদ্বয়, মৃদু হাস্যরত সংবেদনশীল ওষ্ঠ, কোঁকড়ানো চুল ও তার কেশবিন্যাশ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।[৯](চিত্র-১০ক) আবার এজাতীয় অনুরূপ অবয়বের সন্ধান মেলে শ্রাবস্তী থেকে, যেখানে তার হাস্যরত ওষ্ঠ, অর্ধ উন্মীলিত চক্ষু, কোঁকড়ানো চুল তবে তার কেশসজ্জায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে; মাথার সম্মুখভাগে একটি ছোট নকশাযুক্ত চূড়া জাতীয় উপস্থাপনা দৃশ্যমান।(চিত্র-১০খ) এছাড়াও চন্দ্রকেতুগড়,তিলদা,কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি বাংলার আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রত্নস্থলে বৌদ্ধধর্মের সহিত সম্পর্কিত নানা অবয়বের সন্ধান মেলে যা বাংলায় উক্ত আদর্শের প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরে। নীচে কিছু চিত্র উপস্থাপন করা হল -

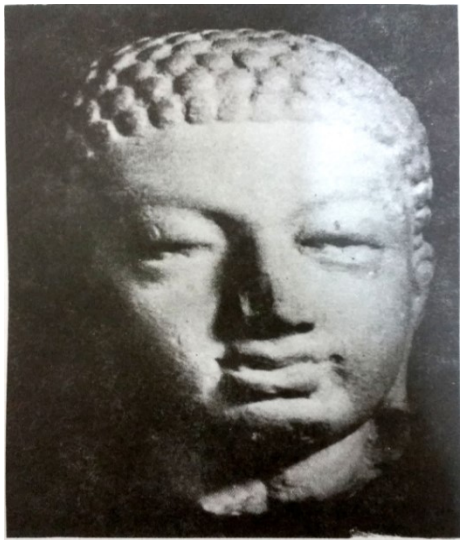

১০ক

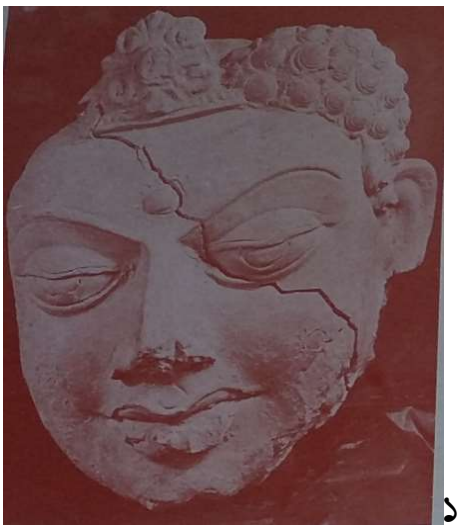

১০খ

চিত্র-১০ক বোধিস্বত্ত অবয়ব, তমলুক,সৌজন্যে-সমীর কুমার মুখার্জ্জী, 'আ নোট অন সাম বুদ্ধিষ্ট অ্যান্টিকুইটিস ইন টেরাকোটা ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল',"জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট" ১ম খন্ড,১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৮৪

চিত্র-১০খ বোধিস্বত্ত অবয়ব, শ্রাবস্তী সৌজন্যে-'এস সি কলা,'টেরাকোটাস অফ নর্থ ইন্ডিয়া',প্রাগুক্ত, প্লেট-২৭৫

উপরিউক্ত অবয়বের পাশাপাশি আরও একাধিক অবয়ব রয়েছে বাংলার টেরাকোটা শিল্প ভান্ডারে, যাদের চরিত্র সম্পর্কে একাধিক সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের পরিবর্তিত রুচি বা পছন্দ অনুযায়ী একাধিক নতুনত্ব উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল শিল্পক্ষেত্রে যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানেও চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানের পাশাপাশি অন্যান্য প্রত্নস্থলগুলি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তেমনই তার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ একাধিক অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় উত্তর ভারতীয় নানান প্রত্নস্থলেও। ফলস্বরূপ সর্বভারতীয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন প্রাচীন বাংলা সামগ্রীক রূপে প্রকৃতই কতটা বিচ্ছিন্ন ছিল তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় শিল্প- সংস্কৃতির এই সমন্বয়বাদী চরিত্র।

প্রথমেই বলা যায় উপস্থাপিত পশু পাখি অবয়বের কথা, সাধারণত বাংলা তথা উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক পশু পাখির মূর্তি পাওয়া যায় যেগুলি সাধারণত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কিংবা শিশুদের খেলনা সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হত বলে মনে করা হয়। চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানে এইরূপ বেশ কিছু মেষ, হাতি, বৃষ ইত্যাদি অবয়ব লক্ষণীয়। এগুলি মূলত হাতে গড়া, সম্পূর্ণ অলংকার বর্জিত আদিম শিল্পরীতি বা শিল্পীর অদক্ষ হাতের ছাপ সেখানে সুস্পষ্ট। দক্ষিণ বঙ্গের বেশ কিছু প্রত্নস্থলে এইরূপ উপস্থাপনা পাওয়া যায়। যেমন- হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত এইরূপ একক হস্তী মূর্তির উপস্থাপনা করা হল (চিত্র নং-১১ক) হুবহু ঐরূপ একই অবয়ব পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড় থেকেও।(চিত্র নং- ১১খ) আবার উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এইরূপ হস্তীমূর্তি মেলে যেমন কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত এইরূপ হাতে তৈরি একটি অবয়বের কথা বলা যায় যদিও তা প্রায় সম্পূর্ণতই ভগ্নপ্রায়,(চিত্র নং-১১গ) এছাড়াও আরও অসংখ্য এই ধাঁচের হাতে গড়া অলংকরণ বিহীন একক পশুমূর্তি বাংলা তথা উত্তর ভারতের নানান প্রত্নস্থলে পাওয়া যায়। দেখা গেছে এই ধাঁচের অবয়ব মানেই তা প্রাকমৌর্য বা আদিম পর্যায়ের নয় ,গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই শৈলীর অসংখ্য উপাদান পাওয়া যায় সমগ্র আদি ঐতিহাসিক পর্ব জুড়েই। এছাড়া পুরনো পদ্ধতি অনুসৃত উপাদানের চাহিদা যেমন দীর্ঘকালব্যাপী বিদ্যমান ছিল তেমনই আবার বেশ কিছু ফলক,ছাঁচ বা চাকার ব্যবহারে নির্মিত অবয়বও বহু ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। পূর্ব ভারত কিংবা উত্তর ভারত সর্বত্রই বেশ সুসজ্জিত, ক্ষেত্র বিশেষে অলংকার সম্পন্ন ষাঁড়, ভেড়া, হাতি, ঘোড়া, বানর ও কিছু পক্ষী অবয়ব লক্ষণীয়। স্বল্প পরিসরে সকল চিত্র উপস্থাপন সম্ভবপর নয় ফলত সীমিত কিছু চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল।

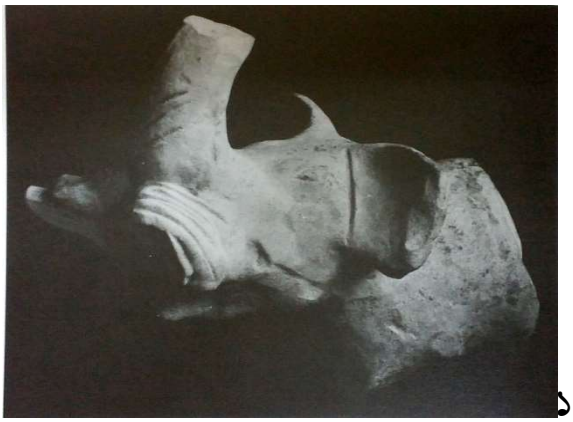

১১ক

১১খ

১১গ

চিত্র নং-**১১ক** হস্ত নির্মিত হস্তী অবয়ব, হরিনারায়নপুর, সৌজন্যে- 'এলোকোয়েন্ট আর্থ' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৮

চিত্র নং-**১১খ** হস্ত নির্মিত হস্তী অবয়ব, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে-'এলোকোয়েন্ট আর্থ' প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-২৪৭

চিত্র নং-**১১গ** হস্ত নির্মিত হস্তী অবয়ব, উত্তর ভারতীয় অজানা প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত, সৌজন্যে – 'এস সি কলা, 'টেরাকোটাস অফ নর্থ ইন্ডিয়া', প্রাগুক্ত প্লেট- ২৮৬

১২ক

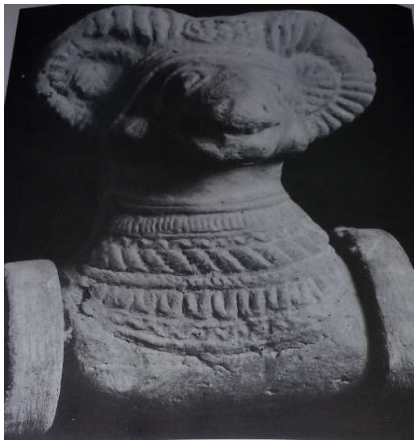

১২খ

চিত্র নং-**১২ক** ভেড়া অবয়ব, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে-'এলোকোয়েন্ট আর্থ' প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-২৬০
চিত্র নং-**১২খ** ভেড়া অবয়ব, তিলপি, সৌজন্যে-'এলোকোয়েন্ট আর্থ' প্রাগুক্ত (Acc no-R06.09)

এরপর উল্লেখ করা চলে নারী মূর্তি গুলির কথা যা প্রাচীন বাংলা তথা ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে বিদ্যমান, উপস্থাপিত শিল্প অবয়বের অধিকাংশই নারীকেন্দ্রিক। ইতিপূর্বেই যক্ষী বা মাতৃকাদেবীদের উপস্থাপনার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তাদের উপস্থাপনা একাধারে নারী সৌন্দর্য্যের, লাবণ্যের পরম দিক গুলিকে অতি সূক্ষ্মতার সাথে ফুটিয়ে তোলে। তার মুদ্রা, স্পষ্ট স্তনযুগল, অলংকৃত লাস্যময়ী দৈহিক অবয়ব নারী সৌন্দর্য্য সম্পর্কিত ভারতীয় ধারণাকে পরিস্ফুট করে। এছাড়াও একাধিক ভিন্ন ভঙ্গিমার নারী অবয়ব লক্ষণীয় বাংলা তথা সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন অংশে। যেমন চন্দ্রকেতুগড়ে বেশ কিছু নারী/যক্ষী মূর্তি মেলে যেখানে তারা কখনো দর্পণ হস্তে সাজসজ্জারত আবার কখনো পাখা হাতে নারী অবয়বের বেশ কিছু উপস্থাপনা রয়েছে। আশুতোষ সংগ্রহালয় বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্বশালার সংরক্ষণে এরূপ একাধিক অবয়ব লক্ষণীয়। এই একই ধরণের অবয়ব কিন্তু পাওয়া যায় উত্তর ভারতীয় কিছু ক্ষেত্রেও যেমন মথুরায় প্রাপ্ত একটি যক্ষী মূর্তি উল্লেখ্য যেখানে তিনি পাখা সহ উপস্থাপিত, আবার অনুরূপ ভাবে এখানকার অপর মূর্তিতে যক্ষীর হাতে দর্পণ লক্ষ করা যায় যা ২টি ভিন্ন অঞ্চলের পারস্পরিক সংযোগের দিকটিকে প্রকাশিত করে। এগুলি হতে পারে সাধারণ নারীদের প্রসাধন দৃশ্য তবে আবার এই মূর্তিগুলিও আরাধ্যা দেবীশক্তির প্রতিরূপ যে হতে পারে সে দিকটিও একেবারে সংশয়াতীত নয়, যেখানে উক্ত পাখা বা দর্পণ তাদের নির্দিষ্ট প্রতীক স্বরূপ উপস্থাপিত হয়েছে।

১৩ক

১৩খ

চিত্র নং-১৩ক দর্পন সহ প্রসাধনরতা নারী অবয়ব, ছাঁচ নির্মিত, চন্দ্রকেতুগড়,সৌজন্যে- গৌরীশঙ্কর দে, শুভ্রদীপ দে - 'চন্দ্রকেতুগড় আ লস্ট সিভিলাইজেশজন'- আর্ট এন্ড আর্ট মোটিফ (১ম খণ্ড) সাগ্নিকবুকস,কলকাতা,২০০৪,চিত্র-১০

চিত্র নং-১৩খ দর্পন সহ প্রসাধনরতা নারী উপস্থাপনা,ছাঁচ নির্মিত, কৌশাম্বী, সৌজন্যে- এস সি কলা, 'টেরাকোটাস অফ নর্দান ইন্ডিয়া' প্রাগুক্ত, প্লেট- ৩৯ পৃষ্ঠা- ২৬

মহাভারতে বলা হয়েছে পাখি মানুষের খাদ্যাভ্যাসের সহিত সম্পর্কিত ছিল কিংবা মনোরঞ্জনের অঙ্গ স্বরূপ। আবার বাৎস্যায়ন ৬৪টি কলার মধ্যে 'শূক-ক্রীড়া' বা পাখির সহিত খেলাকে অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন যা নারীদের উল্লেখযোগ্য অবসর যাপন ছিল।[১০] বহুক্ষেত্রে সুসজ্জিত নারীমূর্তির সাথে বিভিন্ন পক্ষী অবয়ব বিশেষত টিয়া উপস্থাপনা দেখা যায় পোড়ামাটি শিল্পে, ফলত হয়তো তা উচ্চ শ্রেণীর রমনীদের সখ বা বিলাসিতার অঙ্গ ও অবসর যাপনের মাধ্যম ছিল। এইরূপ উপস্থাপনা প্রাচীন ভারতে নারীদের উক্ত কর্মকাণ্ডের উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। চন্দ্রকেতুগড়ে এরূপ একাধিক অবয়ব মেলে যেখানে কোথাও নারী মূর্তির হাতের ওপর টিয়ার উপস্থাপনা, কোথাও বা তাকে উক্ত রমণী খাবার প্রদান করছেন প্রভৃতি। শুধু চন্দ্রকেতুগড় নয় এইরূপ পক্ষী সহ নারীর উপস্থাপনা দক্ষিণ বঙ্গের অন্যান্য প্রত্নস্থল যথা হরিনারায়নপুর, বোড়াল, পোখন্না প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকেও পাওয়া যায় যার অধিকাংশ সংরক্ষিত রয়েছে কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায়।[১১] পাশাপাশি এই ধরণের অনুরূপ বেশ কিছু মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু মথুরা থেকেও যেখানে কোথাও হাতে কোথাও কোমরে পক্ষী উপস্থাপনা লক্ষণীয়। নীচে এরূপ চন্দ্রকেতুগড় ও মথুরা থেকে প্রাপ্ত ১টি করে চিত্র উপস্থাপিত হল-

১৪ক

১৪খ

চিত্র নং-১৪ক পক্ষী সহ নারী উপস্থাপনা, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- এনামুল হক, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেসার হাউস অফ বেঙ্গল টেরাকোটাস', আই সি এস বি এ, ঢাকা ২০০১ পৃষ্ঠা ১০৭

চিত্র নং-১৪খ পক্ষী সহ নারী উপস্থাপনা, মথুরা, সৌজন্যে- পি এল গুপ্তা, প্রাগুক্ত (Fig- 87)

আবার বাংলার পোড়ামাটি শিল্পধারায় একাধিক অবয়ব মেলে যেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে একাধিক নৃত্যশিল্পী,বীণা বাদক, ড্রাম বাদকের উপস্থিতি লক্ষণীয়। যেমন চন্দ্রকেতুগড়ের একজন ড্রাম বাদনরত নারী অবয়বের কথা উল্লেখ করা চলে যেখানে তার সম্মুখে তবলা বা ঐ জাতীয় কোন বাদ্যযন্ত্র রয়েছে, তার উপস্থাপনা কিছুটা গোলাকৃতি ধাঁচের যুগ্ম ছাঁচ দ্বারা নির্মিত , অলংকার রূপে হাতে বালা ও গলায় নেকলেস এর উপস্থাপনা রয়েছে।(চিত্র-১৫ক) আবার নৃত্যরত বেশ কিছু অবয়ব রয়েছে যেখানে কোথাও একক উপস্থাপনা আবার কোথাও নারী পুরুষ একত্রে উপস্থাপনা দৃশ্যমান। এই ধরণের অবয়ব কেবল চন্দ্রকেতুগড়ই নয় একাধারে পাণ্ডু রাজার ঢিবি, তাম্রলিপ্ত, তিলপি প্রভৃতি প্রাচীন বঙ্গের বিভিন্ন প্রত্নস্থল এবং অপরদিকে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন প্রত্নস্থল থেকে বিভিন্ন সময়ে পাওয়া যায়। যেমন উত্তর প্রদেশের রাজঘাট থেকে ড্রাম বাদনরত ২টি বালকের অবয়ব পাওয়া যায় (চিত্র-১৫খ) যার সাথে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত নারী অবয়বের উপস্থাপনার বহুলাংশে সাদৃশ্য রয়েছে।

১৫ক

১৫খ

চিত্র নং- ১৫ক ড্রাম বাদনরত নারী মূর্তি, যুগ্ম ছাঁচ নির্মিত,চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৩৩

চিত্র নং-১৫খ ড্রাম বাদনরত বালক মূর্তি, যুগ্ম ছাঁচ নির্মিত, রাজঘাট, সৌজন্যে- পি এল গুপ্তা, প্রাগুক্ত, (Fig- 142)

আবার অপর একটি ফলকের উল্লেখ করা যায় যেখানে একাধারে কৃষিকাজ এবং পাশাপাশি সম্পর্কিত কোন লোকায়ত উৎসবের উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয় বলে অনুমিত। সেখানে

গীতবাদ্যকরদের (বাঁশি বাদক,ড্রাম বাদক) একটি শোভাযাত্রা লক্ষণীয়, তার পশ্চাতে একটি অলংকৃত হস্তী অবয়ব এবং অন্য অংশে কিছু মানুষ শস্য বহন করছে। এইরূপ আরেক উৎসবের চিত্র সম্বলিত ফলক কিন্তু পাওয়া যায় পাটনা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পোড়ামাটি উপাদানের মধ্য থেকেও, যেখানে এইরূপ কোন সামাজিক উৎসব পালনের দৃশ্য বর্ণিত বলে মনে করা যায়। ফলকটিতে পুষ্পশোভিত বৃক্ষের নীচে নৃত্য-সঙ্গীতানুষ্ঠান এর উপস্থাপনা, সেখানে পুরুষ বীণাবাদক ও মহিলা নৃত্যশিল্পী দৃশ্যমান। অর্থাৎ কোথাও গিয়ে সমাজে প্রচলিত নানান অনুষ্ঠানেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে পোড়ামাটি শিল্প এবং প্রেক্ষিত ভিন্ন হলেও উপস্থাপনার ধরণ আদর্শ বহুলাংশে একইরকম বলা যেতে পারে। উত্তর ভারতীয় প্রেক্ষাপটে একাধিক কেন্দ্রে এইরূপ 'গোষ্ঠী',[১২] বা সাংস্কৃতিক সমাবেশ ও বাগান দৃশ্যের বেশ কিছু উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় শুঙ্গ পর্বকালে।

১৬ক

১৬খ

চিত্র নং-১৬ক সাংস্কৃতিক সমাবেশের প্রতিচ্ছবি, চন্দ্রকেতুগড়,সৌজন্যে- 'এলোকোয়েন্ট আর্থ' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২০০

চিত্র নং- ১৬খ সাংস্কৃতিক সমাবেশের প্রতিচ্ছবি, সৌজন্যে- দেবাঙ্গনা দেশাই, 'সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস'; সোনালিকা কল সম্পাদিত, ''কালচারাল হিস্ট্রি অফ আর্লি সাউথ এশিয়া'', ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড,২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৫২

তেমনই একাধিক শিকারের দৃশ্য কিন্তু বাংলায় মেলে। বর্তমানে একটি অবয়বের উল্লেখ করা চলে যার পরিচিতি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে কিছু দ্বিধা থাকলেও মোতিচন্দ্র একে শিকারীর

দৃশ্য বলে উল্লেখ করেন, ফলকটিতে এক সুসজ্জিত যুবককে হাতে দড়ি বাঁধা ছাগল বা বাছুর সহ উপস্থাপন করা হয়েছে যার অনুরূপ দৃশ্য পাওয়া যায় উত্তর প্রদেশের রাজঘাট থেকে।[১৩] আবার কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত অপর এক ফলকে সুসজ্জিত হাতির পিঠে উপবিষ্ট ২জন ব্যাক্তির চিত্র প্রতিফলিত, পেছনের অবয়বটি ভগ্নপ্রায় তবে সম্মুখভাগে উপবিষ্ট অবয়বের হাতে একটি অঙ্কুশ এর উপস্থিতি লক্ষণীয়[১৪] যা থেকে তা শিকারের দৃশ্য বলে মনে করা যেতে পারে এছাড়াও তা পরিলক্ষিত বাংলা সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রত্নস্থলে।

চিত্র- ১৭ক,১৭খ,১৭গ(যথাক্রমে বাম থেকে ডান)

চিত্র নং-১৭ক শিকার দৃশ্য, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- এস এস বিশ্বাস, 'টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল', প্রাগুক্ত, (প্লেট- Lviiib)

চিত্র নং-১৭খ শিকার দৃশ্য,রাজঘাট, সৌজন্যে-পি এল গুপ্তা, প্রাগুক্ত(Fig-149)

চিত্র নং-১৭গ শিকার দৃশ্য, কৌশাম্বী, সৌজন্যে- এস সি কলা,প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ১৯

আদি ঐতিহাসিক পর্বের পোড়ামাটি শিল্পের মধ্যে অন্যতম উপস্থাপনা পশুর পিঠে উপবিষ্ট বাহকের অবয়ব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘোড়া এবং হাতির পিঠে উপবিষ্ট মানুষ পরিলক্ষিত হলেও অনেক সময় কুকুর, ভেড়া, বাঘ প্রভৃতিও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে তবে তা তুলনামূলক কম।

চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ বাংলার হরিনারায়নপুর,তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলে এরূপ উপস্থাপনা দেখা যায় অপর দিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে অনুরূপ অবয়ব পরিলক্ষিত হয় রাজঘাট, মথুরা, এলাহাবাদ, কৌশাম্বী প্রভৃতি অঞ্চলেও। নীচে যথাক্রমে চন্দ্রকেতুগড় ও রাজঘাট থেকে প্রাপ্ত কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ ২টি হস্তী বাহক সম্বলিত অবয়বের চিত্র উপস্থাপিত হল-

১৮ক

১৮খ

চিত্র নং-১৮ক হস্তী আরোহী, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে-'এলোকোয়েন্ট আর্থ', প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-১৬৬

চিত্র নং-১৮খ হস্তী আরোহী,রাজঘাট, সৌজন্যে- পি এল গুপ্তা, প্রাগুক্ত, (Fig-156)

এরপর উল্লেখ করা চলে টেরাকোটা শিল্পের উপস্থাপিত অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় মিথুন শৈলীর পোড়ামাটি অবয়বের কথা।এই প্রকার শিল্পকর্ম কিন্তু সর্বত্রই বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এজাতীয় ফলকের সন্ধান পাওয়া যায়। এইরূপ উপস্থাপনার সহিত সম্পৃক্ত সম্ভাবনার দিকগুলি ২য় অধ্যায়ে আলোচিত হওয়ায় বর্তমানে তার পুনরাবৃত্তি না করে সরাসরি অবয়ব গুলি তুলে ধরা হল।

১৯ক

১৯খ

চিত্র নং-১৯ক মিথুন দৃশ্য, ছাঁচ নির্মিত, রাজঘাট সৌজন্যে- পি এল গুপ্তা, প্রাগুক্ত (Fig-121)

চিত্র নং-১৯খ মিথুন দৃশ্য,ছাঁচ নির্মিত, চন্দ্রকেতুগড় সৌজন্যে- 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪২

এখানে উপস্থাপিত চিত্র ২টি যথাক্রমে চন্দ্রকেতুগড় এবং মথুরা থেকে প্রাপ্ত কিছুটা একই ধাঁচের উপস্থাপনা যেখানে একজন রমণী ও পুরুষ তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত যাপনে রত। রতিক্রিয়ার খুব বিস্তীর্ণ উপস্থাপনা কিন্তু উত্তর ভারতীয় ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম, তুলনায় এই শ্রেণীর প্রেমময় উপস্থাপনাই সেখানে অধিক। আরও একাধিক ভঙ্গিমার উপস্থাপনা বিদ্যমান নানা অঞ্চলে যা এই স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয় তবে সামগ্রীক রূপে মিথুন উপস্থাপনা বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও জনপ্রিয় ছিল সন্দেহ নেই।

শেষে বলা যায়, বাংলা তথা উত্তর ভারতে প্রাপ্ত পোড়ামাটি শিল্প উপাদানের মধ্যে অন্যতম বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কাহিনীমূলক উপস্থাপনা, যার মধ্যে নিহিত জাতক, পঞ্চতন্ত্র সহ একাধিক প্রাচীন সাহিত্য বা লোককাহিনীর দৃশ্য সম্পৃক্ত। বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থান থেকে এইরূপ বর্ণনামূলক বেশ কিছু পোড়ামাটি শিল্প উপস্থাপনা পাওয়া যায় কিন্তু সর্বত্র উপস্থাপিত কাহিনী পরিচিতি সুস্পষ্ট নয়। তবে উল্লেখ্য মহাস্থানগড়ের পলাশবাড়ি এলাকায় পাওয়া সমগ্র রামায়নের উত্তরকাণ্ডের কাহিনীবিন্যাশ, যা তার শিল্প ইতিহাসে বিশেষ মাত্রা সংযোগ করে কিন্তু তার সময় অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকাল। মোটামুটি গুপ্ত পরবর্তী অধ্যায় বা পাল পর্বে তার বিকাশ ঘটেছিল। এক্ষেত্রে উপস্থাপিত তমলুকে প্রাপ্ত উদয়ন বাসবদত্তার কাহিনী সম্বলিত ফলকও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, আবার

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত বেশ কিছু ফলকে কিছু জাতক, উদয়ন বাসবদত্তা, রামায়ন দৃশ্য উপস্থাপিত। উল্লেখ্য উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন কেন্দ্রেও কিন্তু এর উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কৌশাম্বী ও ভিটা থেকে উদয়ন বাসবদত্তা, রাবণ- সীতা, শকুন্তলা দুষ্যন্ত প্রভৃতি কাহিনী সম্বলিত ফলকের উল্লেখ করেছেন এস কে শ্রীবাস্তব।[১৫] কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রেও এরূপ সামঞ্জস্য সমাজে এসকল কাহিনীর জনপ্রিয়তাকে যেমন তুলে ধরে তেমনই বিভিন্ন অঞ্চলে অনুরূপ রীতি সম্পন্ন পোড়ামাটি ফলকের উপস্থাপনা গাঙ্গেয় উপত্যকীয় শিল্পক্ষেত্রে সমঐতিহ্যের উপস্থিতির ইঙ্গিতবাহী। তবে এছাড়াও আঞ্চলিক বিভিন্ন লোককাহিনীও নানা ক্ষেত্রে পোড়ামাটি শিল্পের অংশ হয়ে উঠেছে যার গুরুত্বও অপরিসীম।

২০ক

২০খ

চিত্র নং-২০ক উদয়ন বাসবদত্তার কাহিনী সম্বলিত ফলক, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- গৌরীশঙ্কর দে, শুভ্রদীপ দে – ‘চন্দ্রকেতুগড় আ লস্ট সিভিলাইজেশজন’- প্রাগুক্ত, চিত্র- ১৫

চিত্র নং-২০খ উদয়ন বাসবদত্তার কাহিনী সম্বলিত ফলক,কৌশাম্বী,সৌজন্যে- পি এল গুপ্তা, প্রাগুক্ত (Fig-150)

বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

এভাবে দেখা যায় ওপরের আলোচ্য অংশে একাধারে পূর্ব এবং উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত আদি ঐতিহাসিক পর্বের পোড়ামাটি শিল্প উপাদানের কিছু উল্লেখ করা হল, যা এই উভয় অঞ্চলে আবিষ্কৃত সামগ্রীক শিল্পধারার বৃহত্তর অংশ এবং এই উপস্থাপনা আদতে সমগ্র গাঙ্গেয় সমভূমির শিল্পঐতিহ্যকে দক্ষতার সাথে প্রতিস্থাপন করে বলা বাহুল্য। ভারত ইতিহাসে গাঙ্গেয় উপত্যকা এক বিস্তীর্ণ অধ্যায়ের সাক্ষী রূপে বিরাজমান। এই অঞ্চলের উর্বর ভূমি, খনিজ সম্পদ ও জল সম্পদের প্রাচুর্য একাধারে কৃষিক্ষেত্র ও নৌচালন ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে যা বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলের প্রতি প্রাচীন অধিবাসীদের আকৃষ্ট করেছে বারংবার। এই গাঙ্গেয় উপত্যকার জলবায়ু, মৃত্তিকা, জলপ্রবাহ বা অন্যান্য তারতম্যের ভিত্তিতে এই অঞ্চল সাধারনত ৩ভাগে বিভক্ত- উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা। মূলত পশ্চিমে হরিদ্বার থেকে পূর্বে এলাহাবাদে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল অর্থাৎ প্রয়াগ পর্যন্ত উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি বিস্তৃত। এই অঞ্চল বহু সমৃদ্ধ নগর পত্তনের সাক্ষী যথা- হস্তিনাপুর, কনৌজ, অহিচ্ছত্র, শ্রাবস্তী, মথুরা, আলমগীরপুর, ভিটা, কৌশাম্বী, ঝাঁসি প্রভৃতি। অপর দিকে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকীয় অঞ্চল মূলত এলহাবাদ থেকে বাংলা-বিহার সীমান্ত এলাকার মধ্যে বিস্তৃত সমতলভূমি। এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধ, কাশী, কোশলের ন্যায় সমৃদ্ধ জনপদের বিকাশ ঘটে যা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিশেষ যুগান্তকারী ঘটনা। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলি ছিল পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা), রাজগীর, চম্পা, রাজঘাট, অযোধ্যা, শোনপুর, চিরান্দ, বৈশালী, বালিরাজগড় ইত্যাদি। অর্থাৎ ইতিপূর্বে উল্লিখিত উত্তর ভারতীয় টেরাকোটা সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি মোটামুটি উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্গত। অপর দিকে আলোচনার প্রধান কেন্দ্র বাংলা নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার অধীন, মূলত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ এবং তাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ব্যাপৃত এই অঞ্চল। এখানে নগরায়ন অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে সূচিত হয় এবং প্রধান নগরগুলির মধ্যে মহাস্থানগড়, চন্দ্রকেতুগড়, বানগড়, মঙ্গলকোট, তমলুক, কর্ণসুবর্ণ অন্যতম ধরা হয়ে থাকে।[১৬] এগুলির মধ্যে চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড় প্রধান নির্বাচিত প্রত্নস্থল হলেও বাংলার টেরাকোটা শিল্প ইতিহাসে অন্যান্য এই সকল নগরকেন্দ্রের ভূমিকাই যে অনস্বীকার্য তা উপরিউক্ত উপস্থাপনা থেকে সুস্পষ্ট।

আদি ঐতিহাসিক বাংলার এই সকল অঞ্চল থেকেই আদি ঐতিহাসিক পর্যায়ের একাধিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় যার মধ্যে নিঃসন্দেহে টেরাকোটা অন্যতম। তবে উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায় শুধু এই কেন্দ্র কয়েকটিই নয় বাংলায় আরও একাধিক প্রত্নস্থলের সাক্ষ্য বিদ্যমান যেখানে চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ সমৃদ্ধ আদি ঐতিহাসিক টেরাকোটা উপাদানের সন্ধান

পাওয়া যায়, যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত। এই অধ্যায়ে মূলত চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানের সহিত একাধারে বাংলার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রত্নস্থল ও পাশাপাশি উল্লিখিত উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন অঞ্চলের টেরাকোটা ঐতিহ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে উপরিল্লিখিত এসকল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা অবয়বের তুলনামূলক উপস্থাপন করা হল, যেখানে আকার-আঙ্গিক বা শৈলী এবং বিষয়গত দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ অবয়বগুলির পাশাপাশি চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে অধ্যায়ের প্রথমাংশে। আরও হয়তো বহু পোড়ামাটি শিল্প অবয়বের উপস্থাপনা সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া যায় যাদের মধ্যে নানান দিক থেকে বিবিধ সামঞ্জস্য বিদ্যমান কিন্তু আদি ঐতিহাসিক পর্বীয় পোড়ামাটি শিল্পের বিস্তার এত ব্যাপক তাদের সমস্ত অবয়বকে একত্রে নথীবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। এছাড়াও নিঃসন্দেহে অঞ্চল ভেদে এই শিল্পের নিজস্ব ধারাও রয়েছে যার দরুন সাদৃশ্যপূর্ণ অবয়বের বাইরেও বাংলা বা উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন প্রত্নস্থলগুলিতে আরও একাধিক ধাঁচের একাধিক বিষয়াদির পোড়ামাটি শিল্প অবয়বের উপস্থাপনা রয়েছে যা সামগ্রীক রূপে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে।

এই সামগ্রীক আলোচনা মূলত আদি ঐতিহাসিক পর্বকেন্দ্রিক, যদিও বর্তমানে আলোচ্য বাংলা বা উত্তর ভারতীয় বহু প্রত্নস্থল প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে শুরু করে আদি মধ্যযুগীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলে কিন্তু এই পর্ব সামগ্রীক রূপে কৃষি, বাণিজ্য, নগরায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক সর্বভারতীয় সংস্কৃতির সাক্ষ্য রূপে বিরাজমান।[১৭] ফলস্বরূপ তৎকালীন শিল্পঐতিহ্য কতখানি উক্ত আদর্শপুষ্ট ছিল তার চর্চা নিঃসন্দেহেই বিশেষ আকর্ষণীয়। বাংলা ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন টেরাকোটা উপাদানের বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় – এগুলি নিঃসন্দেহে আদি ঐতিহাসিক পর্বের শিল্পক্ষেত্রে এক সমন্বয়ী ধারার ইঙ্গিত দেয়।

বঙ্গীয় বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কঃ

প্রথমে বাংলার অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের যদি উল্লেখ করা যায় সেক্ষেত্রে খুব স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে কেবল চন্দ্রকেতুগড় বা মহাস্থানের ন্যায় মূল বড় কেন্দ্রই কিন্তু প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটি শিল্প সমৃদ্ধির একমাত্র পরিচায়ক নয়, তার প্রবহমানতাকে তুলে ধরে আরও অন্যান্য বিবিধ প্রত্নস্থলগুলি। সেসকল অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটি উপাদান সহ অন্যান্য সমগোত্রীয় প্রত্নউপাদান বাংলার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বা সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের দিকটিকে প্রকাশিত করে সন্দেহ নেই। বাংলার প্রত্নস্থলগুলির মধ্যে চন্দ্রকেতুগড় ছিল বন্দর নগরী

এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র, অপরদিকে মহাস্থানের পরিচিতি তৎকালীন বাংলার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র রূপে যার বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত। এছাড়াও বাকি কেন্দ্রগুলির চরিত্র নির্ধারণ করতে হলে দেখা যায় চন্দ্রকেতুগড় ছাড়াও তৎকালীন অন্যতম সমৃদ্ধ নগর ও বন্দর ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক(তাম্রলিপ্ত) অঞ্চলটি। যার উল্লেখ রয়েছে একাধিক প্রাচীন লেখনীতে এবং পাশাপাশি এই অঞ্চলের বিপুল প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যও এর সমৃদ্ধি বা গুরুত্বের ইঙ্গিত দেয়। আরও যে একাধিক প্রত্নস্থলের উপস্থিতি আজ বিদ্যমান তাদের চরিত্র কিরূপ ছিল কিংবা শিল্পক্ষেত্রে তথা সামগ্রীকভাবে আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে তাদের অবদান কিরূপ ছিল তা বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ হলেও সর্বদা তার যথাযথ ব্যাখ্যা নিরূপণ সম্ভবপর হয়না।

তা সত্ত্বেও বলা চলে বহু ক্ষেত্রে এইসকল কেন্দ্র বা প্রত্নস্থলগুলির পত্তন ঘটে বাণিজ্য পথের সুযোগ সুবিধার দরুন। সময়কালের বিচারে উক্ত পর্যায় ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের উর্বরতার যুগ যার হাত ধরে সমাজ, অর্থনীতি তথা জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। ফলস্বরূপ একে কেন্দ্র করেই বহু নতুন অঞ্চল বা নগরের বিকাশ ঘটেছিল আদি ঐতিহাসিক কালপর্বে যারা মূলত বিভিন্ন বাণিজ্য পথ বা বন্দর সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত ছিল এবং সমুদ্রে পোঁছাবার নির্গমনপথ হিসেবে কাজ করত। ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও প্রসার নদী তীরবর্তী এসকল বিভিন্ন কেন্দ্রের তাৎপর্য বৃদ্ধি করে, বিভিন্ন বৃহৎ কেন্দ্রের মধ্যে পরিচালিত সমৃদ্ধ বাণিজ্যপথের মধ্যে এগুলি একপ্রকার 'হল্ট' রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং ক্রমে সময়ের ব্যবধানে নিজেদের পশ্চাদভূমির বিকাশ ঘটায়। তবে এসকল অপেক্ষাকৃত ছোট প্রত্নস্থলগুলির বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভূমিকার পর্যালোচনা করা হয় তার প্রত্ন উপাদানের নিরিখে কেননা বহু ক্ষেত্রে এসকল অঞ্চলের যথাযথ নিয়ম মাফিক উৎখনন হয়না, ফলে সেক্ষেত্রে তার ভৌগোলিক অবস্থান, আকার আয়তন, প্রত্নরাজি প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এছাড়া বহু ক্ষেত্রে বাজার এলাকাগুলিও তার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে স্থায়ী বাসস্থান রূপে গড়ে উঠতে থাকে যা ক্রমে নাগরিক চরিত্র লাভ করে।[১৮]

বিভিন্ন গবেষণা থেকে স্পষ্ট যে তাম্রলিপ্ত এবং গাঙ্গে(চন্দ্রকেতুগড়) উভয়ই প্রাচীন বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে 'বন্দর' হিসেবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। সাধারণত অধিকাংশ গবেষকের চর্চা থেকে অনুমিত হয় এই উভয় বন্দরই ছিল নদীকেন্দ্রিক বন্দর, কিন্তু উপত্যকীয় ও দূরবর্তী সমুদ্র বাণিজ্য উভয় সুযোগ সুবিধাই বিদ্যমান ছিল। এছাড়া অন্যান্য বেশ কিছু কেন্দ্র যথা বাহিরি, তিলদা, হরিনারায়নপুর, দেউলপোতা প্রভৃতি সাধারণত প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গীয় নদীকেন্দ্রিক এবং সমুদ্রকেন্দ্রিক উভয় বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল বলে

মনে করা হয় যদিও অবশ্যই তা চন্দ্রকেতুগড় বা তাম্রলিপ্তের ব্যপকতার সহিত তুলনীয় নয়। তবে তাদের এই সংযোগ ছোট বন্দর হিসেবে তাদের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে যারা সম্ভবত নিকটবর্তী বড় পোতাশ্রয়ের সহায়ককারী রূপে কাজ করত।[১৯]

চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক বা মহাস্থানের ন্যায় কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সাথে বাংলার এসকল অন্যান্য অঞ্চলগুলির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগের ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একপ্রকার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় যার সাক্ষ্য তাদের অজস্র প্রত্নদ্রব্য। আর সেকারণেই পোড়ামাটি শিল্পধারার ক্ষেত্রেও সেই সমন্বয়ের ধারা লক্ষণীয় যেখানে বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রের শিল্পী বা কারিগর সম্প্রদায় তাদের শিল্প উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একই ধরণের সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ ঘটিয়েছে এবং চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতির ন্যায় সমৃদ্ধ কেন্দ্রের শিল্প ঐতিহ্যের অনুসরণ ঘটেছে আঞ্চলিক বিভিন্ন ক্ষেত্রেও যা সামগ্রীক রূপে বাংলার এক নিজস্ব শিল্পধারার পরিচায়ক। আর তৎকালীন পরিস্থিতিতে এইসকল বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নিঃসন্দেহেই নদীপথের ভূমিকা যে অসামান্য তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। বাংলার প্রায় সকল প্রত্নস্থলগুলিই কোন না কোন নদী সংলগ্ন রূপে অবস্থিত ছিল এবং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় বহু ক্ষেত্রে নদী বাণিজ্য বা সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে তাদের ওপর জলপ্রবাহের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়েই বিভিন্ন প্রত্নস্থলের মধ্যে এক সুসংবদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপস্থিতি পারস্পরিক সংযোগ সাধনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে নদীর অবদানের দিকটিকে স্পষ্ট রূপেই তুলে ধরে।

দেখা যায় অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্তও নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় সংযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল নৌকো বা নৌযান। বিভিন্ন প্রাচীন লিপি, সমসাময়িক সাহিত্যাবলী, জ্ঞান বা পদে 'নৌসাধনোদ্যত সমুদ্রাশ্রয়ী' হিসেবে বাঙালীর উল্লেখ রয়েছে এবং 'নৌবিতান', 'নৌদন্ডক', 'নাবাতক্ষেণী' প্রভৃতি নদনদী বা নৌকার সহিত সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দের উল্লেখ থেকে অনুমান করা হয় প্রাচীন বাংলায় যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল জলপথ এবং নৌবাণিজ্য ছিল বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপাদান। উপরিল্লিখিত আদি বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্র তাই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকতে পারে অবশ্যই এই নদীপথের দ্বারা।[২০] যদি বাংলার বিভিন্ন ভূখণ্ডের মূল নদীপ্রবাহ গুলি দেখা যায় সেক্ষেত্রে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র অঞ্চল সাধারণত পদ্মা ও করতোয়া নদী বেষ্টিত, বঙ্গ ভাগীরথী ও পদ্মা সংলগ্ন, রাঢ়-সুহ্ম ও গৌড় সাধারণত ভাগীরথী দ্বারা এবং সমতট ও হরিকেল অংশ মূলত মেঘনা ও মেঘনা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহের দ্বারা বেষ্টিত।[২১] ফলত উক্ত ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রগুলি এসকল নদী প্রবাহ ও তাদের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা দ্বারা একে অপরের সাথে নিবিড় ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল অনুমান করা চলে। বিভিন্ন

সময় সাধারণ মানুষ তীর্থযাত্রা বা ভ্রমণ এবং বিশেষত বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন গ্রাম, নগর, বন্দর বা বাণিজ্যকেন্দ্রে যাতায়াতের সাক্ষ্য এগুলি যার দ্বারা শিল্প সংস্কৃতিরও অভিগমন ঘটে। তবে কেবলমাত্র জলপথ নয় নিঃসন্দেহেই স্থলপথও ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু প্রাচীন বাংলার অন্তর্বাণিজ্যের স্থলপথের বিবরণ স্বল্প। বিভিন্ন লিপি বা বৈদেশিক বিবরণীতে কিছু মাত্র ইঙ্গিত ধরা যায়। সাধারণত বিদেশী পর্যটক ও ঐতিহাসিকরা বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কেই অধিক আগ্রহী ছিলেন ফলে উক্ত বানিজ্যপথের বিবরণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় বিভিন্ন প্রত্নস্থলের পোড়ামাটি শিল্প ঐতিহ্যের সাদৃশ্যমানতা এবং কেন্দ্রীয় শিল্পধারার সহিত অভিন্নতা তাদের পারস্পরিক সংযোগ ও সমন্বয়ী চিন্তাধারার ফলশ্রুতি সন্দেহ নেই।

বাংলার সহিত উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় সংস্কৃতির সংযোগঃ

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে এই শিল্প বাংলার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে সম্প্রসারিত ছিল এবং এক সমৃদ্ধ শিল্পরীতির বিকাশ ঘটিয়েছিল। বাংলার টেরাকোটায় অপর উল্লেখযোগ্য দিক হল এই শিল্প কিন্তু ভারতীয় মূল স্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ধারা নয়। সামগ্রীকভাবে বাংলার এই শিল্পধারায় বিভিন্ন বহির্বঙ্গীয় প্রভাব লক্ষণীয়, যা ভারতীয় মূল সংস্কৃতির সাথে বাংলার সংযোগের দিকটিকে প্রকাশ করে এবং সর্বোপরি বাংলার শিল্পধারায় বিপ্লবের সূচনা করে। প্রযুক্তি, কলাকৌশল, শৈলী, আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, আদর্শ ইতাদি বিভিন্ন দিক থেকে কিন্তু বাংলার শিল্পধারা উত্তর ভারতীয় ঐতিহ্য দ্বারা পরিপুষ্ট। অধ্যায়ের প্রথমাংশের বিভিন্ন চিত্র উপস্থাপনা থেকে দেখা যায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সহিত উত্তর ভারতীয় পোড়ামাটি শৈলীর বিবিধ সামঞ্জস্য বিদ্যমান যা নিশ্চিতরূপে উভয় অঞ্চলের পারস্পরিক সংযোগের দিকটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং একই সাথে নানান বৈদেশিক সংস্কৃতি ও নতুন জগতের সাথেও পরিচিত হয় বাংলার মানুষ যার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয় সেখানকার শিল্পধারায়। বাংলার বিভিন্ন অবয়বগুলির বিশ্লেষণে দেখা যায় সেগুলি নানান দিক থেকে বহুলাংশে উত্তর ভারতীয় সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল যথা চম্পা, পাটলিপুত্র, কৌশাম্বী, মথুরা প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা অবয়বের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ যা ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে লক্ষণীয় কোনও কোনও অবয়ব হুবহু তার আকার আঙ্গিক, নির্মাণ শৈলী বা বিষয়বস্তুর নিরিখে প্রায় অনুরূপ আবার কখনো বিষয়বস্তুগত বা প্রতীকী সাদৃশ্য ভীষণভাবে পরিলক্ষিত হলেও বাহ্যিক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে যা নিঃসন্দেহে অঞ্চলভেদে শিল্পীর

ভিন্ন কারিগরীর পরিচায়ক। তবে বিভিন্ন অবয়বের বিশ্লেষণ যে বাংলার সহিত উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন অংশের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে সন্দেহ নেই কিন্তু সামগ্রীক প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হল বা কিরূপে গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধিত হল তার আলোচনা আবশ্যক কেননা তৎকালীন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অবশ্যই বিষয়টি ততখানি সহজসাধ্য ছিলনা।

বাংলায় এই সমৃদ্ধ টেরাকোটা শিল্পকর্মের প্রসার নিশ্চিতরূপে আদি ঐতিহাসিক নগরায়নের ফলশ্রুতি, যা ছিল মূলত উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকীয় নগরায়নের প্রবহমান ব্যাপ্তি। উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় বিভিন্ন নগরগুলি পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ছিল গঙ্গা ও তার বিভিন্ন প্রবাহ দ্বারা যা অবশ্যই সেসময়ে ভারতের যেকোনো অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগমাধ্যম ছিল। এর মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ, বণিক শ্রেণী কিংবা পন্যদ্রব্য এক অঞ্চল থেকে অন্যত্র গমন করত। যেহেতু আদি বাংলার প্রায় সমস্ত কেন্দ্র গঙ্গার নিম্নপ্রবাহ বা তার বিভিন্ন শাখানদী সংলগ্ন রূপে অবস্থিত ছিল ফলে খুব সহজেই উত্তরের আর্য সংস্কৃতি মূখ্যত নদীপথেই বাংলায় প্রবেশ করেছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। [২২]

বাংলায় নগরায়নের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ মৌর্য যুগের(আনুমানিক ৩২২-১৮৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) আগে থেকেই অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী অঞ্চল থেকে ভাগীরথী ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট নানান নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে মানুষের আগমন শুরু হয়েছিল। ফলত মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্য অঞ্চলের লোকেদের আনাগোনায় তাম্রলিপ্তির ন্যায় বাণিজ্যকেন্দ্র ও শাসন কেন্দ্রের গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। খুব স্বাভাবিক নিয়মে এরই সাথে আসে বাইরের বাণিজ্য দ্রব্য, বণিককুল এবং কারিগরীবিদ্যা ও শিল্প জ্ঞান। ইতিপূর্বে যে নান্দনিক শিল্প ছিল গ্রামভিত্তিক ও লোকশিল্পের পরিমণ্ডলের অন্তর্গত তার সীমানায় প্রবেশ করে বাইরের শিল্পশৈলী ও প্রযুক্তিবিদ্যা।[২৩] ফলস্বরূপ উন্মেষ ঘটল এমন কিছু অবয়বের যা ইতিপূর্বের বঙ্গীয় ধারা থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন, যেমন মেডালিয়ন ও স্কার্ট পরিহিতা নারীমূর্তিগুলি এই পর্যায়ের অন্যতম উপস্থাপনা যা মূলত পাটনা, বুলন্দীবাগ সহ মৌর্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও একাধিক মৌর্য শৈলীর অবয়ব মেলে বাংলার নানা প্রত্নস্থলে যা থেকে বোঝা যায় উক্ত পর্ব থেকেই মৃৎশিল্পে এক ব্যাপক উত্তর ভারতীয় রীতির প্রসার ঘটেছিল প্রাচীন বঙ্গে।

একইভাবে শুঙ্গ ও কুষান শৈলীর একাধিক অবয়বের উপস্থাপনা বিশেষ ভাবে আমাদের চোখে পড়ে চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থান বা তমলুক সহ বাংলার অন্যান্য প্রত্নস্থলগুলিতে যার মধ্যে এক বহির্বঙ্গীয় ঐতিহ্যের ছাপ সুস্পষ্ট। সর্বোপরি যেখানে বাংলায় অদ্যাবধি তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের

কোন সন্ধান পাওয়া যায়না কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে এই ব্যপক প্রসার নিঃসন্দেহে উত্তর ভারতের সহিত বাংলার সংযোগের ফলশ্রুতি বলে মনে হয়। সেখানে তাদের বেশভূষা, দৈহিক উপস্থাপনা, অলংকরন,শৈলী প্রভৃতি নানাভাবে তাদের পরিচিতিকে তুলে ধরে। এই পর্যায়ে মৃৎশিল্পে ছাঁচের প্রয়োগ টেরাকোটা শিল্পইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন মূলত উত্তর ভারতীয় অনুপ্রেরণাতেই ছাঁচের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় বাংলায়। সাধারণত শিল্পীরা অতি দক্ষতার সাথে ছাঁচ তৈরি করে তাতে মাটি ভরে তার থেকে মাটির পটভূমির ওপর অবয়বের সম্মুখ ভাগের প্রতিরূপ বার করে নিয়ে নিজ হাতে এর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অলংকার ও অন্যান্য বিষয়বস্তুকে সূক্ষ্মভাবে গড়ে তুলে মূর্তিকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিত। এইরূপ বিষয়বস্তুর আবিষ্কার হয়েছে উত্তর ভারতের কৌশাম্বী সহ নানা অঞ্চলে যার প্রেক্ষিতে এই প্রযুক্তি উত্তর ভারত থেকে বাংলায় আসে অর্থাৎ উত্তর ভারত থেকে আমদানীকৃত প্রযুক্তি জ্ঞান, শিল্পরীতি সংক্রান্ত নতুন ধারণা ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের নতুন অনুপ্রেরণা বাংলার শিল্পীমনকে নাড়া দিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[২৪]

এই উত্তর ভারতীয় আদর্শের পাশাপাশি বিশেষভাবে চন্দ্রকেতুগড় ও তমলুক সহ বাংলার আরও নানা কেন্দ্রে বেশ কিছু অবয়ব পাওয়া যায় যা বৈদেশিক ঐতিহ্যের বহনকারী বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখ্য গান্ধার শিল্প শৈলীর কথা। যার সূচনা আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসনের অবসানের পর। এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গ্রীক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক শক- কুষানগণ। ফলস্বরূপ ভারতে তাদের শাসন পর্বের সূত্র ধরেই উক্ত শিল্পধারার সূচনা ঘটে উত্তর ভারতীয় মূলকেন্দ্র সহ বাংলাতেও। সাধারণত মূর্তির লম্বমান রেখা বা ভাঁজযুক্ত পরিচ্ছদ, পাদুকা প্রভৃতি গ্রীক রীতির উপাদান। আবার এর সাথে মধ্যএশীয় শৈলীও সংমিশ্রিত ছিল যথা- ছুঁচলো টুপি, সজ্জিত ঘোড়া প্রভৃতি মধ্যএশীয় মূর্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২৫] এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঘোড়া নিম্ন বঙ্গীয় অঞ্চলে সুপরিচিত ছিলনা, তা মূলত উত্তর পশ্চিম ভূভাগ থেকে বাণিজ্য সূত্রে বাংলায় আসত। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন বাংলার সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্কের অন্যতম প্রধান ভিত্তি ছিল ঘোড়ার ব্যবসা। মধ্য এশিয়ার ফরগনা ছিল ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত, ভারতের উত্তর-পশ্চিমের কুষান বণিকরা উক্ত অঞ্চল থেকে ভারতে ঘোড়া আমদানি করে তা আবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে যেত এবং যেসকল বন্দরের মধ্য দিয়ে সমুদ্রপথে ঘোড়া বিদেশে নিয়ে যাওয়া হত তার মধ্যে সম্ভবত তমলুক বা গাঙ্গে বন্দর ছিল অন্যতম। ফলত সেই সূত্রেই বাংলার মানুষ উক্ত ঘোড়া ব্যবসায়ীদের সহিত পরিচিত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয় এবং তার স্ফূরণ ঘটান শিল্পীরা তার শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে।[২৬]

আবার চন্দ্রকেতুগড়ে বেশ কিছু যক্ষী অবয়ব বা বিচ্ছিন্ন রূপে শুধুমাত্র পদযুগলের ভগ্নাংশ পাওয়া যায় যেখানে তারা পুষ্পশোভিত চটি পরিহিতা, যা মূলত হেলেনীয় রোমান ও গান্ধার ঐতিহ্যের বাহক বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন।[২৭] গান্ধার শৈলীর সর্বাধিক প্রভাব পরিস্ফুট হয় বুদ্ধমূর্তিতে; কোঁকড়া চুল, মুখে গোঁফ, বস্ত্রে পরতে পরতে ভাঁজ এসবই ভারতীয় শিল্পে নতুন। ইতিপূর্বে বাংলায় প্রাপ্ত এই শৈলীর বুদ্ধ মূর্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রভাব সর্বাধিক দেখা যায় মথুরা শিল্পরীতিতে, তবে সেখানে ভারতীয় স্বকীয়তা অধিক পরিস্ফুট। অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে এক সমন্বয়ী সংস্কৃতির সূচনা ঘটে যার অন্যতম উদাহরণ বিভিন্ন পোড়ামাটি শিল্প অবয়ব এবং অবশ্যই সমকালীন উত্তর ভারতীয় প্রস্তর ভাস্কর্য এবং এই সংমিশ্রিত নতুন ধারাই কুষান শৈলীর মূল পরিচায়ক হয়ে দাড়ায়। এছাড়াও উক্ত প্রভাব যুক্ত একাধিক প্রত্নবস্তুর সন্ধান মেলে যা উত্তর পশ্চিম ভারতের সাথে বঙ্গের সম্পর্কের পরিচয়বাহী। গৌরীশঙ্কর দে কর্তৃক চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত একটি কুষান সম্রাট হুবিষ্কের স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ করা যায় যেখানে মুখ্য দিকে সম্রাটের আবক্ষ মূর্তি ও গৌণ দিকে ব্যবিলনীয় দেবী নানা-র মূর্তি খোদিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। মুদ্রার হরফ গ্রীক ও ভাষা প্রাচীন ইরাণীয় যা উত্তর পশ্চিম ভারতের সঙ্গে নিম্নবঙ্গের সংযোগকে প্রমাণিত করে এবং সমৃদ্ধ বাণিজ্যেরও ইঙ্গিত দেয় কেননা সম্ভবত বাণিজ্য সূত্রেই বাংলায় এই মুদ্রার আমদানী ঘটেছিল।[২৮]

আবার চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত হেলেনীয় প্রভাবপুষ্ট একটি পোড়ামাটির সীল এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, যেখানে এক নিরাবরণ ,দাঁড়িসহ পুরুষ মূর্তি পাথরের ওপর কিছুটা শায়িত ভঙ্গিতে উপস্থাপিত যা ব্যাকট্রীয় ও ইন্দো-গ্রীক মুদ্রায় অঙ্কিত হেরাক্লেসের অবয়বের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার অপর পিঠে এক নারীমূর্তি উপস্থাপিত যার ডান হাতে সম্ভবত ডুগডুগি জাতীয় উপাদান, বাম হাত কোমরে এবং পা পর্যন্ত লম্বা পোশাকে আবৃত। মাথায় হেলেনীয় উষ্ণীষ (Polos) যা মূলত গ্রীক সমৃদ্ধির দেবী 'Tyche' এর সহিত সংলগ্ন। সুতরাং উপরিউক্ত এসকল উপস্থাপনা বাংলার শিল্প ঐতিহ্যে প্রযুক্ত বহির্দেশীয় উপাদান তথা আদি ঐতিহাসিক পর্বে নিম্ন বঙ্গীয় অঞ্চল ও ভারত মহাদেশের উত্তর পশ্চিম ভূভাগের মধ্যেকার পারস্পরিক সংযোগকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপস্থাপিত করে।[২৯]

সুতরাং সামগ্রীক প্রক্রিয়াটি যদি বিশ্লেষণ করা যায় দেখা যাবে বাংলার আদি ঐতিহাসিক পোড়ামাটি শিল্পে বেশ কিছু ধারা লক্ষণীয়।

(১) বাংলার নিজস্ব বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সাদৃশ্যপূর্ণ শিল্পঐতিহ্য বজায় ছিল।

(২) নিম্ন বঙ্গীয় অঞ্চলের সাথে উত্তর ভারত তথা উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের নানান দিক থেকে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং আবশ্যক রূপে শিল্পক্ষেত্রেও সেই ধারা সুস্পষ্ট। উক্ত অঞ্চলের সহিত সংস্পর্শে আসার ফলেই বঙ্গীয় শিল্পকলা তার পরিণত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ লাভ করে বলে মনে করা হয়ে থাকে।

(৩) এছাড়া বলা চলে, সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং অবশ্যই পোড়ামাটি শিল্পরীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল বহির্ভারতীয় প্রভাব, যেখানে বিশেষ উল্লেখ্য গান্ধার শিল্পরীতি যার সূত্রে হেলেনীয়, রোমান ইত্যাদি নানা আদর্শের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বাংলা এবং উত্তরভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে। বহুক্ষেত্রে আমরা বাংলায় কোন বিশেষ মূর্তিকে উত্তর ভারতীয় প্রভাবপুষ্ট বলে মনে করে থাকি কিন্তু দেখা যায় উত্তর ভারতীয় প্রত্নস্থলেও উক্ত দ্রব্যাদির বিকাশ আদতে উত্তর পশ্চিম ভূভাগের সাংস্কৃতিক আদর্শের প্রতিফলন। অর্থাৎ সামগ্রীক রূপে বাংলার টেরাকোটা এক সমন্বয়বাদী আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটায় যা কেবল তার শিল্পশৈলী বা বাহ্যিক আকার আকৃতির বিকাশ নয়, সামগ্রীক অঞ্চল বা নগরের উন্মুক্ত চরিত্রকে পরিস্ফুট করে।

সমন্বয় প্রক্রিয়াবলী ও অন্যান্যঃ

বাংলার সহিত বিভিন্ন অঞ্চল বা সংস্কৃতির এই সমন্বয়ের স্বপক্ষে নিঃসন্দেহে বেশ কিছু প্রক্রিয়ার অনুমান ও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যার মধ্যে প্রধান ২টি দিক উল্লেখ্য। যেমন- প্রথমেই বলা যায় মানুষের ভ্রমণ বা অভিবাসন জনিত ঘটনা সূত্রে এক অঞ্চল থেকে অন্যত্র যাতায়াত এই ধরণের শিল্প সংস্কৃতির গমনেরও কারণ হয়ে থাকতে পারে এবং উক্ত অভিবাসিত মানুষদের মধ্যে শিল্পী বা কারিগর সম্প্রদায়ের উপস্থিতি অসম্ভব কিছু নয়। একজন অভিবাসিত ব্যক্তি সামাজিক পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক এর ভূমিকা পালন করে। প্রতাপাদিত্য পাল এরূপ সম্ভাবনার ইঙ্গিতও দেন যেখানে তিনি চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাপ্ত শিল্পদ্রব্যে উত্তর ভারতীয় মৌর্যশৈলীর চমক বা আভিজাত্যের উপস্থিতি হেতু উল্লেখ করেছেন বিহারাঞ্চলে মৌর্য শাসন দুর্বল হওয়ার পর উক্ত অঞ্চলের শিল্পীরা নতুন পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে নতুন সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দ্রকেতুগড়ে অভিবাসিত হয়েছিল এরূপ অনুমান করা একেবারে ভিত্তিহীন নয়।[৩০] তাছাড়া সর্বদা ব্যক্তি কেন, পণ্যের অভিবাসন ও অবশ্য বিচার্য। টেরাকোটা উপাদান সমূহ অধিকাংশই সহজে পরিবহণ যোগ্য ছিল যার ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় অবয়ব বা অন্যান্য অবয়বও নিঃসন্দেহেই বহুবার তার

ঠিকানা বদল করেছে মানুষের যাত্রাকালে যা এইরূপ বহির্বঙ্গীয় ঐতিহ্য সম্বলিত উপাদানের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ।

এছাড়া বলা যায়, এই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অপর যে উপাদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা অবশ্যই বাণিজ্যিক সম্পর্ক, অসংখ্য নদীনালা যেমন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পথ সুগম করেছিল তেমনই বঙ্গোপসাগরের সান্নিধ্য বাংলাকে দিয়েছিল সামুদ্রিক বাণিজ্যের সুযোগ। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায় বাংলার আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঞ্চল যেমন নানা স্থলপথ ও জলপথের দ্বারা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তেমনই সামগ্রীকভাবে বাংলা স্বয়ং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল এবং বহির্ভারতীয় অঞ্চলের সহিতও স্থলপথ এবং নদীপথ বা সমুদ্রপথের দ্বারা সংযুক্ত ছিল, এবং এর পশ্চাতে আবশ্যক রূপে কাজ করেছিল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাণিজ্য প্রক্রিয়া। প্রাচীন বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতীয় ও বৈদেশিক নানান তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আদি ঐতিহাসিক পর্বে মহাস্থান বা পুণ্ড্রবর্ধন ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র, ধর্মীয় স্থান এবং খুব স্বাভাবিক নিয়মেই আদান প্রদান বা বিনিময় প্রক্রিয়ার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী উত্তর বঙ্গের প্রাচীন জনপদ পুণ্ড্রের সহিত সমবিস্তৃত অপর একটি প্রাচীন ভৌগোলিক অঞ্চল যা প্লিস্টোসিন যুগীয় বারিন্দ ভূভাগে অবস্থিত।[৩১] বি.ডি.চট্টোপাধ্যায় আদি বাংলার নগরায়ন সম্পর্কিত প্রবন্ধে নাগরিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জনবসতিগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে গঙ্গার উত্তরে অবস্থিত বরেন্দ্রর অন্যতম নগর হিসেবে মহাস্থানকে তুলে ধরেন। এই অঞ্চল বহুলাংশে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ বিহারের পাটলিপুত্র, চম্পা প্রভৃতি প্রত্নস্থলের সরাসরি উত্তরে অবস্থিত ছিল[৩২] যা এই উভয় অঞ্চলের মধ্যে কার্যকরী সংযোগের ইঙ্গিত দেয় বলে মনে করা যেতে পারে। মহাস্থানে প্রাপ্ত মৌর্যলিপি, গাঙ্গেয় রীতির টেরাকোটা,মৃৎপাত্র ও অন্যান্য প্রাপ্ত দ্রব্যাদি এই সংযোগকে আরও যুক্তিপূর্ণ করে তোলে সন্দেহ নেই। তবে খ্রিষ্টীয় প্রথম থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্তও বাংলার যেসকল অঞ্চল সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করেছিল তা মূলত বর্তমান পশ্চিমবঙ্গেই অবস্থিত, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বা তার সন্নিহিত অংশ আদি ঐতিহাসিক পর্বে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে মূলত পঞ্চম- ষষ্ঠ শতক থেকে উক্ত অঞ্চল সমূহের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়।[৩৩]

পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড় ও তমলুক ছিল নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল এবং প্রাচীন বাংলা তথা ভারতের উল্লেখযোগ্য বন্দরকেন্দ্র। যেকোনো বন্দর মানেই তা যেমন অবশ্যই নির্দিষ্ট অঞ্চলের অভ্যন্তরীন ভূভাগের সাথে সম্পর্কিত থাকে তেমনই অন্যান্য বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র, পোতাশ্রয় প্রভৃতির সাথেও সম্পর্কিত থাকে। জলপথ হোক বা স্থলপথ অন্যান্য

পার্শ্ববর্তী বা দূরবর্তী অঞ্চলের সাথে নিয়মিত সংযোগ বজায় থাকাটা যেকোনো বন্দর অঞ্চলের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে আবশ্যক।[৩৪] ফলস্বরূপ তৎকালীন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম সাক্ষী যে বাংলার এই প্রত্নস্থল ২টি তা বলা বাহুল্য। বাংলার বিভিন্ন বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বা পথগুলি যদি বিশ্লেষণ করা যায় সেক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে বাংলার যোগাযোগ তথা তৎকালীন সংযোগ বা সমন্বয়ের প্রক্রিয়াটিকে অনুধাবন হয়তো কিছুটা সহজসাধ্য হবে। ভারতীয় মানচিত্র লক্ষ করলেই দেখা যায় গাঙ্গেয় উপত্যকার বৃহত্তর অংশ মূলত স্থলবন্দী, মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং হিমালয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে সমুদ্রের সাথে সংযোগের একমাত্র নির্গমনপথ ছিল বাংলার বদ্বীপ অঞ্চল অর্থাৎ যেকোনো উদ্দেশ্যে সমুদ্রের সহিত যোগাযোগ বা যাত্রার ক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলের মানুষকে আবশ্যকভাবে বাংলার ওপর দিয়ে যেতে হত। ফলস্বরূপ উত্তর ভারতীয় অঞ্চলগুলিকে তাদের সমুদ্রবাণিজ্য সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডের জন্য বাংলার বন্দরগুলির ওপর নির্ভর করতে হত।[৩৫] যা সামগ্রীকরূপে আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় উপত্যকার বন্দর বা পোতাশ্রয়ের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি করে। এসম্পর্কে সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন জাতকের কাহিনীগুলি থেকে, সেগুলি নানান বণিকদের যাত্রাপথের বিবরণীতে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বারাণসী বা চম্পা থেকে সুবর্ণভূমির যাত্রা, সম্ভবত ঐসকল বণিকরা প্রথমে গঙ্গা-ভাগীরথী নদীপথে বঙ্গীয় উপত্যকায় তাম্রলিপ্তে আসত এবং সেখান থেকে সমুদ্রপথে বঙ্গোপসাগরের কূল ধরে সিংহল অথবা সমুদ্র অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করত।[৩৬] নীহাররঞ্জন রায় স্ট্রাবোর বর্ণনার উল্লেখ করে বলেন ভাগীরথী গঙ্গার উজান বেয়ে সাগরমুখের বন্দর থেকে বাণিজ্যতরীগুলি প্রাচ্য ও গঙ্গা রাষ্ট্রের তদানিন্তন রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যন্ত যাতায়াত করত। নদীপথে গঙ্গা- ভাগীরথীর মাধ্যমেই মূলত বাংলার সাথে উত্তর ভারতের যোগাযোগ ছিল, ১৯ শতকেও বাঙালী এই নৌকাপথে কাশী যাতায়াত করত বলে জানা যায়। এছাড়া বাংলার অপর ২ প্রধান নদী করতোয়া এবং ব্রহ্মপুত্রে কিন্তু খুব একটা বাণিজ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়না তবে করতোয়া প্রাচীন কালে ভীষণ খরস্রোতা ছিল এবং সরাসরি সমুদ্রে পড়ত। অর্থাৎ বাংলার ইতিহাসে নদীর ভূমিকা কোন অংশে কম ছিলনা এবং উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের পারস্পরিক যোগাযোগও এই নদীপথেই ছিল সন্দেহ নেই।[৩৭]

এক্ষেত্রে অন্যতম উল্লেখ্য বিষয় হল বাংলায় রোমক প্রভাবযুক্ত শিল্পশৈলীর উপস্থিতি। রুলেটেড পাত্র বা প্রাপ্ত রোমান প্রভাবযুক্ত আরও নানান প্রত্নদ্রব্য বাংলা ও রোমের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিকে বিবিধ প্রশ্ন ও তর্কের মুখে দাঁড় করিয়েছে। গবেষক গৌরীশঙ্কর দে চন্দ্রকেতুগড় ও তমলুকে প্রাপ্ত একাধিক প্রত্নদ্রব্য যথা রোমান দেবতা জানুসের মুর্তি, রুলেটেড মৃৎপাত্র, অ্যাম্ফোরা প্রভৃতির প্রেক্ষিতে দাবী করেন রোমের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলে এই

প্রাপ্তি সম্ভবপর হতনা। তিনি উল্লেখ করেছেন- বিহারের বামনঘাটি নামক স্থানে(চাইবাসা ও বালাসোর এর মধ্যবর্তী স্থানে তাম্রলিপ্ত থেকে পশ্চিমাভিমুখী প্রাচীন এক প্রধান সড়কের ধারে) রোমক মুদ্রার একটি ভান্ডার আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এই অঞ্চল মূলত তাম্রলিপ্তের মাধ্যমে রোমের সাথে যুক্ত ছিল। যে পথের ওপর বামনঘাটি অবস্থিত ছিল তা আবার কৌশাম্বী হয়ে মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এবং অন্য এক পথের দ্বারা তা তক্ষশীলার সাথেও সংযুক্ত ছিল ফলস্বরূপ এর দ্বারা ভারত রোম বাণিজ্যের স্থলপথটি তাম্রলিপ্তের সাথে নিশ্চিত ভাবে যুক্ত ছিল বলে তিনি বিভিন্ন সূত্রের ভিত্তিতে তার বক্তব্যকে যুক্তিযুক্ত করে তুলতে চেয়েছেন বারংবার।[৩৮]

অপরদিকে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রনবীর চক্রবর্তী, শাহনাজ হোসেন জাহান প্রমুখ ঐতিহাসিকরা নানান যুক্তির ভিত্তিতে বাংলার সাথে রোমের সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপস্থিতির বিরোধিতা করেন। টলেমী 'এম্পোরিয়া' শব্দের ব্যবহার করেছেন ভারতে রাজকীয় তত্ত্বাবধানে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে রোমান বণিকদের বাসস্থানকে বোঝাতে, এর সর্বাধিক বিস্তৃতির পরিচয় মেলে অন্ধ্রের উপকূল পর্যন্ত কিন্তু বঙ্গ বা কলিঙ্গে এর কোন উল্লেখ না দেখে অনুমান করা হয় এই দুই অঞ্চলের সাথে রোমান বাণিজ্যের প্রত্যক্ষ কোনও সংযোগ ছিলনা।[৩৯] এছাড়াও এনাদের মতে বাংলায় রোমান মুদ্রার পরিচয় পাওয়া যায়না অথচ দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহ যথা কাবেরীপত্তনম্, আরিকামেডু, কাঞ্চীপুরম প্রভৃতি অঞ্চলে একাধিক রোমক মুদ্রা ও রোমক প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয় যার প্রেক্ষিতে তারা মনে করে থাকেন বাংলার সাথে দক্ষিণ ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং উক্ত অঞ্চল বাংলা ও রোমান বাণিজ্যের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করত অর্থাৎ বাংলা থেকে যাবতীয় দ্রব্যাদি দক্ষিণ ভারতে আদান প্রদান করা হত এবং সেখান থেকে তা রোমে যেত।[৪০] এপ্রসঙ্গে রনবীর চক্রবর্তী উল্লেখ করেন বাংলার চন্দ্রকেতুগড়,তমলুক, উড়িষ্যার সিসুপালগড় সহ দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় ক্ষেত্রে রুলেটেড পাত্রের প্রাপ্তিকে কেবল রোম ভারত বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে বিচার না করে বরং তা বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলের পারস্পরিক সংযোগ প্রক্রিয়াকে যে তুলে ধরে সেদিক থেকে বিশ্লেষণ করা উচিৎ, এটা এক দেশীয় প্রক্রিয়া যার নিজস্ব ধারা বিদ্যমান ছিল ফলত তাকে কেবল বহিরাগত সম্পর্কের ভিত্তিতে বিচার না করাই শ্রেয় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।[৪১] তবে একটা কথা বলা যায় যে সংযোগের প্রক্রিয়া যাই হোক না কেন ক্ষেত্র বিশেষে বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে উক্ত ঐতিহ্যের প্রতিফলন যে ঘটেছিল বলা বাহুল্য।

তবে শুধু নদী পথ বা সমুদ্র পথই নয় একাধিক স্থলপথের মাধ্যমেও বাংলা তার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কেন্দ্র তথা ভারতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক

নীহাররঞ্জন রায় বেশ কিছু আন্তর্দেশিক ও বহির্দেশীয় স্থলপথের উল্লেখ করেছেন যার পরিচয় মেলে হিউয়েন সাং, ফা হিয়েন ও ইতসিঙ্ এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা', সহ অন্যান্য কিছু সাহিত্য গ্রন্থ এবং বেশ কিছু শিলালিপিতে। এইরূপ আন্তর্দেশিক যেসকল পথের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল- পুন্ড্রবর্ধন থেকে পাটলিপুত্র,তাম্রলিপ্ত থেকে বোধগয়া,তাম্রলিপ্ত থেকে অযোধ্যা, এছাড়া হিউয়েন সাং এর যাত্রাপথ বিবরণী প্রসঙ্গে আন্তর্দেশিক পথ সম্পর্কে বেশ কিছু ইঙ্গিত মেলে। তিনি বারাণসী, বৈশালী, পাটলিপুত্র, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, নালন্দা, অঙ্গ- চম্পা প্রভৃতি ভ্রমণ করে কজঙ্গলে আসেন এবং সেখান থেকে যান বাংলার অন্যান্য নানা অংশে যা বিভিন্ন সংযোগপথ গুলির ইঙ্গিত দেয় যথা- কজঙ্গল থেকে পুন্ড্রবর্ধন, পুন্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপ, কামরূপ থেকে সমতট, সমতট থেকে তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্ত থেকে কর্ণসুবর্ণ, এবং কর্ণসুবর্ণ থেকে ওড্র, কঙ্গোদ, কলিঙ্গ। এই ছিল হিউয়েন সাং এর পথ, চম্পা (অধুনা ভাগলপুর) থেকে বর্তমান যে রেলপথ রাজমহলের পাহাড়ের ভেতর দিয়ে নানা শাখা প্রশাখায় দক্ষিণমুখী হয়ে বাঁকুড়া, বীরভূমের দিকে চলে গিয়েছে সেই পথেই তিনি কজঙ্গল প্রবেশ করেন।[৪২] এছাড়া তার এই যাত্রার মধ্য দিয়ে দেখা যায় ২টি উপকূলীয় অঞ্চল অর্থাৎ সমতট এবং তাম্রলিপ্ত পরস্পর সংযুক্ত ছিল কিন্তু স্থলপথের দ্বারাও যা আবার উপকূলীয় অঞ্চলকে কামরূপ এবং রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত করে। অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত একাধারে স্থলপথ ও জলপথ উভয় দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল যা নিঃসন্দেহে এর সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তির পশ্চাতে অন্যতম কারণ ছিল সন্দেহ নেই।[৪৩] এই বিস্তৃত যাত্রাপথের বিবরণী আদতে উক্ত বিভিন্ন অঞ্চল গুলির সংযোগ সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দেয়।

সুতরাং প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ এবং পাশাপাশি বাংলার বাইরেও বিভিন্ন অঞ্চল তৎকালীন সময়ে যেসব সুদীর্ঘ পথের দ্বারা পরস্পর যুক্ত ছিল সেসব পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই জাতীয় উপাদানগুলি থেকে। এইরূপ ৩টি প্রধান বহির্দেশীয় স্থলপথেরও উল্লেখ করেছেন নীহাররঞ্জন রায় – একটি পুণ্ড্রবর্ধন থেকে মিথিলা বা উত্তর বিহার ভেদ করে চম্পা হয়ে পাটলিপুত্রের ভিতর দিয়ে বুদ্ধগয়া স্পর্শ করে বারাণসী-অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেখান থেকে একদম সিন্ধু-সৌরাষ্ট্র-গুজরাটের বন্দর পর্যন্ত। হিউয়েন সাং এর বিবরণী ও কথাসরিৎসাগরের কাহিনী থেকে এই পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ২য় পথটিরও ইঙ্গিত মেলে হিউয়েন সাং এর বিবরণীতেই, এই পথটি তাম্রলিপ্ত থেকে উত্তরাভিমুখী হয়ে কর্ণসুবর্ণের ভিতর দিয়ে রাজমহল চম্পা স্পর্শ করে পাটলিপুত্রের দিকে চলে গিয়েছে। ৩য় পথটির আভাষ পাওয়া যায় ইৎসিঙের বিবরণী ও হাজারিবাগ জেলার দুধপানিপাহাড়ের অষ্টম শতকীয় লিপিতে, এই পথ তাম্রলিপ্ত থেকে সোজা উত্তর পশ্চিমাভিমুখী হয়ে বুদ্ধগয়ার ভেতর দিয়ে অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই তিনটি পথকে

কেন্দ্র করেই মূলত প্রাচীন বাংলা উত্তর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করত। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যদিও এসকল উপাদানগুলি অধিকাংশই সপ্তম – অষ্টম শতকীয় বা মধ্যযুগীয় সময়কালের তবে নীহাররঞ্জন রায় যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে হিউয়েন সাং বা অন্যান্য আগন্তুকরা নিঃসন্দেই এইসকল পথ নিজে আবিষ্কার করেননি, তার বহু আগে থেকেই মানুষের যাতায়াত প্রভৃতি কারণে এসব পথ প্রশস্ত হয়েছিল এবং পরবর্তীতেও এসকল পথ ব্যবহৃত হয়ে ক্রমে বর্তমানের রেলপথে বিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান বাংলা বা উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত রেলপথই কোন নতুন আবিষ্কৃত পথ নয়, বস্তুত তা সেসব প্রাচীন পথ অনুসরণ করেই চলছে বলে মনে করা হয়ে থাকে।[৪৪] অর্থাৎ সুদূর প্রাচীন কাল থেকে কিন্তু এসকল পথে বাংলার আন্তর্দেশীয় বা বহির্দেশীয় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল যারই ফলশ্রুতি এই সংমিশ্রিত শিল্পধারার সূচনা। উপরে আলোচিত এসকল যোগাযোগ পথগুলি একাধারে যাতায়াত ও বাণিজ্যের পথ হিসেবে বিবেচ্য ছিল যার দ্বারা খুব স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ ও পন্যাদির সহিত আদর্শ,ঐতিহ্য,সংস্কৃতি, নান্দনিকতা, রুচিবোধ এক অঞ্চল থেকে অন্যত্র গমন করেছিল এবং একে অপরের সহিত সংমিশ্রিত হয়েছিল বলা চলে।

উপরিউক্ত আলোচনা সূত্রে স্পষ্টত বলা যায় চন্দ্রকেতুগড় বা মহাস্থান আদি ঐতিহাসিক বাংলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল বা টেরাকোটা শিল্প ইতিহাসে চন্দ্রকেতুগড় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রক্রিয়া কেবল উক্ত অঞ্চলেই সীমিত কোন বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া ছিলনা। এর পশ্চাতে একাধিক আদর্শ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক চেতনার মেলবন্ধন কাজ করেছিল যার গুরুত্ব ইতিহাসে সর্বাধিক। চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়ের টেরাকোটা অবয়ব গুলির বিশ্লেষণে দেখা যায় এই অবয়বের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায় বাংলার একাধিক অঞ্চল সহ উত্তর ভারতীয় নানান কেন্দ্রে যা পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ইঙ্গিত দেয়। তবে মূলগত ভাবে বাংলার এইরূপ পোড়ামাটি শৈলী উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন প্রান্তে থাকলেও বাংলায় প্রাপ্ত পোড়ামাটি শিল্পে কিন্তু নিহিত ছিল উত্তর পশ্চিম ভারতীয় শিল্পরীতি তথা গান্ধার এবং সেই সূত্রে গ্রেকো-রোমান, ইরানীয় প্রভৃতি ঐতিহ্যও। হয়তো কিছু প্রতীক সরাসরি বাংলায় এসেছে, কিছু বা মধ্য গাঙ্গেয় শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে উত্তর ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে একযোগে প্রবেশ করেছে বাংলায়। সেই সমগ্র প্রক্রিয়াটি কিরূপে সম্ভব হল বা এই সমন্বয়ের পশ্চাতে কিরূপ অনুঘটক কাজ করেছিল তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সংযোগের মাধ্যম হিসেবে উপরিউক্ত বাণিজ্যপথ বা যাতায়াত পথ এবং অভিবাসন জনিত ঘটনা গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্ত বিবিধ আদর্শের উৎস অনুসন্ধানে।

এখন মূলগতভাবে এই বাণিজ্যিক সংযোগের সূত্র ধরে বাংলায় শিল্পধারার সমন্বয়ের পশ্চাতে নিহিত একাধিক সম্ভাবনার অনুমান করা যেতে পারে যথা-

প্রথমত, আমরা দেখেছি আলোচ্য পর্বের শিল্পধারার এক বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে ধর্মীয় ঐতিহ্য, শুভ চেতনা, মঙ্গল চেতনার ন্যায় আদর্শ। বাংলায় প্রাপ্ত অধিকাংশ অবয়বই যেহেতু উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা পুষ্ট ফলত সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে শিল্পক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট প্রতীকের বিস্তার ঘটেছে। কেবল শিল্পের বাহ্যিক অবয়ব বা শৈলী নয় নিঃসন্দেহে সার্বিকভাবে উভয় অঞ্চলের আদর্শ বা চিন্তনেরও যে পারস্পরিক সমন্বয় সাধন ঘটেছিল বলাবাহুল্য, যার বহিঃপ্রকাশ এই বিপুল সমৃদ্ধ শিল্পধারা। বাংলা বিশেষত চন্দ্রকেতুগড় বা তমলুক ছিল বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারতের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ এলাকা ফলত বাণিজ্য সূত্রে যখন উত্তর ভারত বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ বা বণিক সম্প্রদায় বাংলায় আসছে তাদের আচার আচরণ, সংস্কৃতি, প্রথা পোশাক পরিচ্ছদ, অলংকার, দৈহিক বিন্যাস সবকিছুর সাথে স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও শিল্পীরা পরিচিত হচ্ছে এবং পাশাপাশি ধর্ম, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক সমন্বয় সাধিত হচ্ছে যার সার্বিক প্রতিফলন ঘটছে স্থানীয় শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে। কেননা উক্ত সংস্কৃতি সেখানকার স্থানীয় মানুষের কাছে ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও আকর্ষণীয় এবং বলা বাহুল্য তমলুক বা চন্দ্রকেতুগড় থেকে বিভিন্ন স্থলপথ বা নদীপথে উক্ত সংস্কৃতি খুব সহজেই বাংলার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অঞ্চলেও প্রবেশ করেছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

দ্বিতীয়ত, উক্ত বণিকরা হয়তো যাত্রাকালে বিভিন্ন ক্ষুদ্র পোড়ামাটির অবয়ব বা ফলকগুলি তাদের সৌভাগ্যের প্রতীক স্বরূপ বা তাবিজ রূপে নিজেদের সঙ্গে বহন করতেন। কেননা দূরবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানান ঝুঁকি বা বিপদের সম্ভাবনাও জড়িত থাকত ফলত এজাতীয় তাবিজের ব্যবহার অসম্ভব নয় বলেই মনে হয়। এছাড়াও বিলাস বহুল সমৃদ্ধ বণিক শ্রেণী নিজেদের সখ বা বিনোদনের স্বার্থেও হয়তো বিভিন্ন শিল্প উপাদান বহন করতেন অনুমান করা চলে যেগুলি সম্ভবত যাতায়াতকালে ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সংস্পর্শে আসে কিংবা এক অঞ্চলের দ্রব্য অন্য অঞ্চলে হাতবদলের সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পভাবনারও বিকাশ ঘটে। তারপর অনুরূপ ছাঁচে ঢেলে বাংলায় শিল্পীরা হয়তো অনুরূপ অবয়বের ব্যাপক বিস্তার ঘটিয়েছেন স্থানীয়ভাবে নিজস্ব ঢঙে। বহু ক্ষেত্রে হয়তো উক্ত ছাঁচ প্রাথমিক ভাবে উত্তর ভারত আমদানী করা হয়ে থাকতে পারে তবে সম্পূর্ণ রূপে তার ওপর নিশ্চয় নির্ভর ছিলনা বাংলার শিল্পীরা, ক্রমে উক্ত প্রযুক্তিও তারা আয়ত্ত করেছে।

তৃতীয়ত বলা চলে, বাণিজ্য সূত্রে বা অন্যান্য কারণে বাংলায় আগত বিভিন্ন মানুষের বসতি স্থাপনের নিদর্শন বা অভিবাসনের সম্ভাবনার দিকটি ইতিপূর্বেই উল্লিখিত। সম্ভবত বিভিন্ন সময়

উত্তর ভারত কিংবা উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে আগত বাংলায় বসবাসকারী পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদা মেটানোর জন্যও বহুক্ষেত্রে তাদের রুচিসম্মত শিল্প উপাদানের আমদানী কিংবা তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শিল্পশৈলী গড়ে তোলার এক তাগিদ বাংলার শিল্পীমহলে বৃদ্ধি পেয়েছিল যা ক্রমে বাংলার শিল্পধারার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে শিল্পের নতুন সংজ্ঞা গড়ে তুলেছিল বলা বাহুল্য।

স্থানীয় তারতম্যঃ

তবে বিশেষ উল্লেখ্য সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা ব্যাপী শিল্পক্ষেত্রে এক সাধারণ ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটলেও উভয় ক্ষেত্রেই কিছু বিশেষত্ব কিন্তু অবশ্য লক্ষণীয়। বাংলায় যেমন শিল্পক্ষেত্রে কিছু স্বতন্ত্রতা বজায় ছিল ঠিক তেমনই উত্তর ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও বহু অবয়বের সন্ধান মেলে যা একান্তই তার নিজস্ব অর্থাৎ বাংলায় তার কোনও উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়না। যেমন প্রথমেই বাংলার কথা বলা চলে; উল্লেখ্য, বাংলার পোড়ামাটি শিল্পধারার বৃহত্তর অংশ জুড়ে উত্তর ভারতীয় অবদান বা বহির্ভারতীয় আদর্শের সংমিশ্রন থাকলেও বাংলা কিন্তু তার নিজস্বতা হারায়নি। বাংলার বিভিন্ন অবয়বগুলির বাহ্যিক রূপ বা বিষয়বস্তু এবং প্রযুক্ত শৈলী বহিরাগত হলেও তার রূপায়নে কিন্তু বাংলার নিজস্বতা বহুক্ষেত্রে লক্ষণীয়। যেমন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত মৎস্য আকৃতির ফলকে দন্ডায়মান 'শ্রীলক্ষ্মী'র অবয়ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন মূর্তিটির পরিকল্পনায় বহিরাগত প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও তার মুখমণ্ডলের রূপায়নে বঙ্গের শিল্পীর নিজস্বতা ফুটে উঠেছে।[৪৫] বলা বাহুল্য এই মন্তব্য কিন্তু কেবল এই একটি অবয়বেই প্রযুক্ত নয় বহু ক্ষেত্রেই এই ধারা লক্ষণীয়, যেখানে শিল্পী তার বাহ্যিক রূপ কল্পনায় বহির্বঙ্গীয় উৎকর্ষতা ও ঐতিহ্যের অনুসারী হলেও তার অন্তর্দর্শন হয়তো বাংলার নিজস্বতায় পরিপূর্ণ ছিল। এছাড়া আবার এমন কিছু অবয়বের নিদর্শন মেলে যা একান্তভাবে বাংলার স্বতন্ত্র শিল্পবৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে, যেগুলি বহুলাংশে গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরল বা উপস্থিতি থাকলেও তার বিস্তৃতির ব্যাপকতা বাংলার তুলনায় একদম কম। যেমন-

(ক) প্রথমেই বলা যায় চন্দ্রকেতুগড় সহ সমগ্র বাংলা পোড়ামাটি শিল্পের বিশেষ উল্লেখ্য শলাকা যুক্ত যক্ষী অবয়বের কথা, যার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে ভারতের সর্বত্র কিন্তু আদি ঐতিহাসিক বাংলার যক্ষী অবয়বের বিশেষত্ব হল এখানে প্রচুর সংখ্যক দশচূড়া বা দ্বাদশচূড়া সম্বলিত যক্ষীর সন্ধান মেলে যা বাংলার বাইরে উচ্চ বা মধ্য গাঙ্গেয় প্রত্নস্থলগুলিতে প্রায় বিরল। মূলত মস্তকের এক পাশে পঞ্চচূড়া ও অন্যপাশে শস্যদানা প্রভৃতি সম্বলিত যক্ষীই শুঙ্গ পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যার

উপস্থিতি মেলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সহ উত্তর ভারতীয় চম্পা, কৌশাম্বী, মথুরা প্রভৃতি কেন্দ্রে। কিন্তু মস্তকের উভয়পার্শ্বে দশ বা দ্বাদশচূড়ার উপস্থিতি বাংলার বিশেষত্ব।

(খ) বাংলার টেরাকোটা শিল্পধারার অন্যতম বিশেষত্ব হল তার বিপুল সংখ্যক কাহিনী সম্বলিত বা বর্ণনা মূলক ফলকের উপস্থিতি। বঙ্গীয় নানান কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন জাতক, রামায়ন, পঞ্চতন্ত্র সহ আরও একাধিক প্রাচীন কাব্য এবং নানান লৌকিক কাহিনীর বিভিন্ন অংশ সম্বলিত একাধিক পোড়ামাটি ফলক আবিষ্কৃত যা গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্য যেকোনো অঞ্চলের তুলনায় স্বতন্ত্র। কৌশাম্বী বা মথুরা থেকে কিছু কাহিনী মূলক উপস্থাপনা পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু তার ব্যাপকতা কখনই বাংলার সাথে তুলনীয় নয়।

(গ) পরবর্তীতে বলা যায় চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত সন্তান প্রসব ভঙ্গীতে নারী অবয়বের কথা, এক একই ধাঁচের অবয়ব পাওয়া যায় ভারতের একাধিক প্রত্নস্থলে। তবে উল্লেখ্য চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর কিছু অবয়বে সম্পূর্ণ মানবীয় উপস্থাপনা থাকলেও ঝাঁসি, কৌশাম্বী প্রভৃতি অন্যান্য স্থানগুলিতে সাধারণত মানবদেহের সাথে মস্তিষ্কের অংশে পুষ্পের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত, ষ্টেলা ক্র্যামরিশ পদ্ম মোটিফ সহ এই ধাঁচের নারী অবয়বকে 'অদিতি উত্তনপদ' বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ বাংলায় এই অবয়ব এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ফুটে উঠেছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।[৪৬]

(ঘ) এছাড়া বিশেষ উল্লেখ্য মিথুন ফলক গুলির কথা, যা সামগ্রীক বাংলা সহ ভারতের একাধিক অঞ্চলের শিল্প উপস্থাপনার অন্যতম উপাদান, প্রস্তর হোক বা মৃৎশিল্প সর্বত্র মিথুন শৈলী অন্যতম বিবেচ্য উপাদান। কিন্তু আদি ঐতিহাসিক পর্বের টেরাকোটা শিল্পের বিচারে বাংলায় বিশেষত চন্দ্রকেতুগড়ের নাম এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যেখানে রতিক্রিয়ার বিভিন্ন ভঙ্গি অতি দক্ষতার সহিত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্যান্য কেন্দ্রে তুলনামূলক ভাবে বহুলাংশে কম। বাংলার তুলনায় অন্যান্য প্রত্নস্থলে সংখ্যাগত প্রাপ্তি কম হওয়ার পাশাপাশি সেখানে ফলকগুলি সাধারণত অলংকারিত প্রেক্ষাপটে নারী পুরুষের প্রেমময় দৃশ্য বলে মনে হয়, কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়ে যৌনক্রিয়ার বিভিন্ন ভঙ্গীকে অতি বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেভাবে তাতে মনে হয় উক্ত ভঙ্গীই মুখ্য বিষয় শিল্প উপস্থাপনার যা বহুলাংশে বাংলার শিল্পী বা পৃষ্ঠপোষকদের উন্মুক্ত মানসিকতা এবং স্বতন্ত্র শিল্পধারারও পরিচয় দেয়।

অপর দিকে যদি উত্তর ভারতীয় ক্ষেত্রের কথা বলা যায় সেখানেও দেখা যাবে বিপুল সাংস্কৃতিক সমন্বয় স্বত্তেও এমন বহু উপস্থাপনা রয়েছে বাংলায় যা অনুপস্থিত। বলা বাহুল্য লক্ষ

করলে দেখা যায় বাংলায় বিকশিত অবয়ব সমূহের অধিকাংশের পশ্চাতেই কিন্তু বিশেষ প্রতীক বা চিন্তন জড়িত। সেগুলি বহুলাংশে মানুষের মঙ্গল চেতনার সহিত জড়িত কিন্তু উত্তর ভারতীয় প্রেক্ষপটে এর পাশাপাশি এমন বিপুল মাত্রার টেরাকোটা অবয়ব পাওয়া যায় যাদের এর থেকে বিচ্যুত কিছুটা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন উপস্থাপনা বলে মনে হয়। যেখানে 'নান্দনিকতা', 'শিল্প অবয়ব' এসকল চেতনা অধিক সম্পৃক্ত বলে অনুমান করা যেতে পারে। যেমন প্রথমেই বলা যায় উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন কেন্দ্রে অসংখ্য নারী পুরুষের মুখাবয়ব পাওয়া যায় যার মধ্যে অন্যতম মৌর্য শৈলীর হাস্যরত বালকের উপস্থাপনা, (চিত্র -২১) তা নিঃসন্দেহেই উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা। পাশাপাশি শুঙ্গ ও বিশেষত কুষান পর্বে বিশেষ মৌখিক অভিব্যক্তি সম্পন্ন এই শ্রেণীর অসংখ্য অবয়ব রয়েছে যা সম্ভবত প্রতিকৃতি নির্মাণ রীতির জনপ্রিয়তার ফলশ্রুতি বলে দেবাঙ্গনা দেশাই উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক পর্বের ভাসের নাটকেও এরূপ বিভিন্ন রাজ পরিবারের পূর্ব পুরুষদের প্রতিকৃতি নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায় বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন।[৪৭] সমকালীন বঙ্গীয় শিল্পধারাতেও চন্দ্রকেতুগড়, তমলুকের ন্যায় অঞ্চলে এই শ্রেণীর কিছু অবয়ব পরিলক্ষিত হলেও গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্যত্র তার প্রবণতা অনেক বেশি ছিল বলেই মনে হয়।

আবার কিছু সামাজিক চিত্রাবলী উল্লেখ্য, যেমন কিছু ফলকে মদ্যপান দৃশ্য প্রতিফলিত। কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত একটি ফলকের নির্দিষ্ট অংশে মদ্যপানরত নারী পুরুষের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত। যেখানে নারী মূর্তিটি ডান হাতে সুরাপাত্র এবং বাম হাত সঙ্গীর কোমরের দিকে উদাত্ত অপরদিকে পুরুষ অবয়বটির ডান হাতে পানপাত্র বাম হাত কোমরে এবং একটি ছোরা ধরে আছেন।[৪৮] (চিত্র নং-২২) এছাড়াও বেশ কিছু ফলকে মেলা, সার্কাস প্রভৃতির নানান দৃশ্য প্রতিফলিত যা নগরাঞ্চলের জীবনযাত্রার চিত্র মনে করা যেতে পারে।

২১

২২

চিত্র নং- ২১ হাস্যরত বালক, উত্তর প্রদেশ, ভারত কলা ভবন, সৌজন্যে- এস কে শ্রীবাস্তব, 'টেরাকোটা আর্ট ইন নর্দান ইন্ডিয়া', পরিমল পাবলিকেশন, দিল্লী, ১৯৯৬, অবয়ব নং-১৬

চিত্র নং-২২ মদ্যপান দৃশ্য, কৌশাম্বী, সৌজন্যে- এস কে শ্রীবাস্তব, 'টেরাকোটা আর্ট ইন নর্দান ইন্ডিয়া', তদেব, অবয়ব নং-৩৪

তবে এছাড়াও বেশ কিছু ধর্মীয় অবয়বের উপস্থাপনাও পরিলক্ষিত হয় বাংলায় যা অনুপস্থিত। যেমন ভিটা থেকে প্রাপ্ত পক্ষী, মাতৃ অবয়ব সজ্জিত ভোটিভ ট্যাংক(উপাস্য জলাধার?),[৪৯] মথুরার একমুখী শিবলিঙ্গ বা অন্যান্য কেন্দ্রে প্রাপ্ত শিবের মুখাবয়ব,[৫০] মথুরায় প্রাপ্ত মহিষাসুরমর্দিনীর[৫১] উপস্থাপনা সহ আরও একাধিক উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় উত্তর ভারতীয় ক্ষেত্রে যা শিল্পক্ষেত্রে তার বিশেষত্বকে তুলে ধরে কিন্তু বঙ্গীয় ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। সুতরাং উপরিউক্ত এই আলোচনা থেকে বলা যায় বিপুল সাদৃশ্য বা সমন্বয় স্বত্ত্বেও কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই কিছু নিজ নিজ বৈচিত্র্য অব্যাহত ছিল যা আলোচ্য ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

(২৩)

(২৪)

চিত্র নং-২৩ একমুখী শিবলিঙ্গ, মথুরা, সৌজন্যে- এস কে শ্রীবাস্তব, 'টেরাকোটা আর্ট ইন নর্দান ইন্ডিয়া', প্রাগুক্ত, অবয়ব নং- ৫৯

চিত্র নং-২৪ মহিষাসুরমর্দিনী, মথুরা, সৌজন্যে- এস কে শ্রীবাস্তব, 'টেরাকোটা আর্ট ইন নর্দান ইন্ডিয়া', প্রাগুক্ত, অবয়ব নং- ৬০

শেষে বলা যায় বাংলার পোড়ামাটি শিল্পধারা এক বিস্তীর্ণ ইতিহাসের সাক্ষী, যার মধ্যে একাধিক চরিত্রের সমন্বয় বিদ্যমান। চন্দ্রকেতুগড়,তমলুক এবং মহাস্থানগড় অঞ্চল সহ আরও একাধিক প্রত্নস্থলের আবিষ্কার এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত প্রায় সমগোত্রীয় টেরাকোটার উপাদান আদি ঐতিহাসিক বাংলাকে শিল্প ইতিহাসের চর্চায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করে সন্দেহ নেই। এসকল বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে উল্লেখযোগ্য টেরাকোটার প্রাপ্তি বাংলার গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ সংযোগের পাশাপাশি বঙ্গবাসীর মধ্যে তার বিপুল গ্রহণযোগ্যতাকে প্রকাশিত করে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প উপাদান সামগ্রীকভাবে তার নিজস্ব শিল্পরীতিকে প্রকাশিত করে। আবার একইভাবে দেখা যাচ্ছে বাংলার টেরাকোটা সম্ভারের সাথে উত্তর ভারতীয় শিল্পশৈলীর বিপুল সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে, এবং তারই সাথে সংমিশ্রিত রয়েছে উত্তর পশ্চিমী তথা গান্ধার ও হেলেনীয় উপাদান। এই যে উত্তর পশ্চিমের সাংস্কৃতিক উপাদান বঙ্গের পোড়ামাটি শিল্পে পরিলক্ষিত হয় ভারতে তার অনুপ্রবেশ ঘটে মূলত কুষানদের হাত ধরে, ফলত অনুমান করা চলে উক্ত ধারা মধ্য গাঙ্গেয়

উপত্যকা হয়ে খুব সম্ভবত বাণিজ্য সূত্রে বাংলায় চন্দ্রকেতুগড় বা তমলুকের ন্যায় বড় বন্দরে প্রবেশ করেছে এবং সেখান থেকে খুব সহজেই পণ্য সরবরাহের পাশাপাশি উক্ত সংস্কৃতিরও সম্প্রসারণ ঘটেছে বঙ্গের অন্যান্য বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিতে। চন্দ্রকেতুগড়ের সহিত গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্যান্য কেন্দ্রের সংযোগের ক্ষেত্রটিতে তো কোন সন্দেহই নেই পাশাপাশি গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে বিচ্ছিন্ন পরিসরে অবস্থিত থেকেও মহাস্থান যে আদতে বিচ্ছিন্ন নয় তার প্রমাণ উক্ত অঞ্চলের টেরাকোটা উপাদান সহ অন্যান্য কিছু প্রত্ন উপাদান। বঙ্গীয় বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংযোগের প্রেক্ষিতে মহাস্থানগড়ও খুব সহজেই যে নিম্ন গাঙ্গেয় ঐতিহ্য তথা সমগ্র গাঙ্গেয় সংস্কৃতির সহিত সম্পর্কিত ছিল বলা বাহুল্য।

সুতরাং বাংলা ও উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন টেরাকোটা উপাদান যে আদতে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকার সংস্কৃতিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলে বলা যায়, এবং সমগ্র উপত্যকা জুড়ে প্রায় সমজাতীয় শিল্পধারার বিকাশ উক্ত অঞ্চলের সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। তবে এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য বাংলার সাথে উচ্চ ও মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকীয় টেরাকোটা শিল্পধারার যে সাদৃশ্য বা সাংস্কৃতিক সমন্বয় তা অবশ্যই লক্ষণীয় কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অবয়বগুলির বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় বাংলার টেরাকোটা শিল্প উচ্চ বা বিশেষত মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকীয় শৈলীর অনুসরণ হলেও অনুকরণ নয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাপ্ত শিল্পদ্রব্যের সাক্ষ্যে যথার্থই দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু বা শৈলীর ক্ষেত্রে উত্তর ভারতীয় ঐতিহ্যের মিল থাকলেও তার আঙ্গিক বা রূপায়ন কিন্তু হুবহু এক নয়, শিল্পীর নিজস্ব চিন্তাধারা সেখানে প্রতিফলিত। আর তাছাড়া কে কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল এবং বহুলাংশেই সামগ্রীক ইতিহাসের বিচারে অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিথুন উপস্থাপনা সংক্রান্ত আলোচনায় এস কে শ্রীবাস্তব[৫২] উল্লেখ করেছেন উত্তর ভারতীয় কেন্দ্রে মিথুন উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সরাসরি রতিক্রিয়া সংক্রান্ত ভঙ্গিমা বহুলাংশে কম এবং তা বিশেষ রূপে কৌশাম্বীতেই পাওয়া যায়। তিনি বলেন যদি তা জনপ্রিয় হত তাহলে প্রাপ্তির সংখ্যা অনেক বেশি হত, কিন্তু যেহেতু তা নয় ফলে সম্ভবত সেসময় বাণিজ্য সূত্রে উক্ত প্রবণতা তমলুক থেকে উক্ত অঞ্চলে গিয়েছিল এবং তা থেকে শিল্পীরা স্বল্পসংখ্যায় তা তৈরি করেছিল বলে তিনি অনুমান করেন। সুতরাং গাঙ্গেয় উপত্যকার অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে যদি বাংলায় শিল্পশৈলীর, চিন্তনের, আদর্শের আগমন ঘটে তাহলে খুব সহজেই সেই পথে তার গমনও যে সম্ভব সেই দিকটি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। তবে যাইহোক উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে সমগ্র আদি ঐতিহাসিক পর্ব জুড়ে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী পর্যন্ত টেরাকোটা শিল্পে এক সাধারণ

শিল্পশৈলী অনুসৃত হয়েছিল যা নানান আঞ্চলিক স্বত্তাকে এক বৃহৎ শিল্পঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত করে এবং এক সামগ্রীক ধারা রূপে গড়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র

১) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতাঃ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম, ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৬-১৩

২) পি এল গুপ্তা, 'গাঙ্গেটিক ভ্যালী টেরাকোটা আর্ট', পৃথিবী প্রকাশনী, বারাণসী-৫(ইন্ডিয়া), ১৯৭২ পৃষ্ঠা- ৯৯-১১৪

৩) দেবাঙ্গনা দেশাই, 'এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস ইন দেয়ার সোশ্যাল কনটেক্সট' (৬০০ বি সি ই – সি ই ৬০০) ইন "আর্ট অ্যান্ড আইকনঃ এসেস অন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট" , আরিয়ান বুকস ইন্টারন্যাশনাল , ২০১৩ পৃষ্ঠা- ৫৩

৪) তদেব

৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৯-৬৯

৬) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ২১-২২

৭) দেবাঙ্গনা দেশাই, 'এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস ইন দেয়ার সোশ্যাল কনটেক্সট' (৬০০ বি সি ই – সি ই ৬০০), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬০

৮) ভি এস আগরওয়াল, 'মথুরা টেরাকোটাস্', পৃথিবী প্রকাশনী, ১৯৩৬, পৃষ্ঠা- ২৯-৩০

; সীমা রায় চৌধুরী, 'আর্লি হিস্টোরিক টেরাকোটাস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ স্টাডি ইন থিমস্ অ্যান্ড মোটিফস', "প্রত্নসমীক্ষা", খণ্ড- ৪ ও ৫, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম গভঃ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৯৫-৯৬, পৃষ্ঠা- ৬৭

৯) সমীর কুমার মুখার্জ্জী, 'আ নোট অন সাম বুদ্ধিষ্ট অ্যান্টিকুইটিস ইন টেরাকোটা ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল', জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,১ম খন্ড, দ্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডি অফ বেঙ্গল আর্ট,১৯৯৬ পৃষ্ঠা- ৮৫-৮৭

১০) এস কে শ্রীবাস্তব, 'টেরাকোটা আর্ট ইন নর্দান ইন্ডিয়া', পরিমল পাবলিকেশন, দিল্লী, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৮২

১১) গৌরীশঙ্কর দে শুভ্রদীপ দে ,– 'চন্দ্রকেতুগড় আ লস্ট সিভিলাইজেশন-, আর্ট এন্ড আর্ট মোটিফ'(ভলিউম ১) ,কলকাতা ,সাগ্নিক বুকস , ২০০৪ পৃষ্ঠা-১৮-১৯

১২) দেবাঙ্গনা দেশাই, 'এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস ইন দেয়ার সোশ্যাল কনটেক্সট' (৬০০ বি সি ই – সি ই ৬০০), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৩

১৩) এস এস বিশ্বাস – 'টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল', বিশ্বাস , এস এস 'টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল' , আগম কলা প্রকাশনী, দিল্লি,১৯৮১ পৃষ্ঠা- ৮৭-৮৮

১৪) এস সি কলা, 'টেরাকোটাস অফ নর্থ ইন্ডিয়া' আগম কলা প্রকাশন,দিল্লী, ১৯৯৩ পৃষ্ঠা-১৯

১৫) এস কে শ্রীবাস্তব, 'টেরাকোটা আর্ট ইন নর্দান ইন্ডিয়া', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৫

১৬) সমীর কুমার মুখার্জ্জী, 'টেরাকোটা আর্ট ইন দ্য গাঙ্গেটিক ভ্যালী আন্ডার দা কুষানাস', প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত, "ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড", মার্গ পাবলিকেশন, খণ্ড-৫৪, নং-১, ২০০২ পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫

১৭) শর্মি চক্রবর্তী, 'চন্দ্রকেতুগড়-আ সাইট ইন লোয়ার বেঙ্গল', ইন গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত - 'আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, নিউ পার্সপেক্টিভস", সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, কলকাতা - ২০০২ পৃষ্ঠা- ১৪৫

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৫-১৫৫

১৯) রনবীর চক্রবর্তী, ‘ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি’, মনোহর পাবলিকেশন, ২০০২, পৃষ্ঠা- ১৩০-১৩১ ; শ্রেয়সী ভট্টাচার্য, ‘মেরিটাইম পোর্টস অ্যান্ড পলিটিক্যাল অথরিটি ইন আর্লি হিস্টোরিক কোস্টাল বেঙ্গলঃ এক্সপ্লোরিং সার্টন হিস্টোরিকাল ইস্যুস’ ইন ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পার্সপেক্টিভস অফ ইন্ডিয়ান হিস্টরি , প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা, ২০০৬ পৃষ্ঠা- ৬০-৭৭

২০) নীহার রঞ্জন রায় , ‘বাঙালীর ইতিহাস’ - আদি পর্ব, দে’জ প্রকাশনী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৪০২ পৃষ্ঠা- ১৫৬

২১) অমিতাভ ভট্টাচার্য- ‘ট্রেড রুটস অফ এনসিয়েন্ট বেঙ্গল’ ইন অশোক দত্ত সম্পাদিত “হিস্টরি অ্যান্ড আর্কিওলজি অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া”, বুকস অ্যান্ড বুকস ,নিউ দিল্লী, ১৯৯৮ পৃষ্ঠা- ১৫৭

২২) অশোক কুমার ভট্টাচার্য, ‘টেরাকোটাস্ অফ বেঙ্গল’ , শুঙ্গ কুষান পিরিয়ড - প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত , “ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড” , মার্গ , ২০০২ পৃষ্ঠা – ৫৯

২৩) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম “উচ্চ” মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯

২৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ২১

২৫) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে’ -প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড় , ‘বুক সেলার্স এন্ড পাবলিসার্স ,কলকাতা , ২০১৩ , পৃষ্ঠা-৫০৩

২৬) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ‘বঙ্গ বাংলা ও ভারত’ প্রগ্রেশিভ পাবলিশার্স, কলকাতা,২০০০,প্রথম প্রকাশ পৃষ্ঠা- ২০-২১

২৭) নুর বানো সত্তর, ‘ফরেন ইনফ্লুয়েন্স অ্যাস নোটিশড অন সাম ইউনিক টেরাকোটা ফিগারিনস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়’, জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, খণ্ড- ৯-১০, ২০০৪-২০০৫ পৃষ্ঠা- ২৭৮

২৮) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে, ‘প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা– ৫০৪-৫০৫

২৯) সুচন্দ্রা ঘোষ, ‘হেলেনেস্টিক এলিমেন্ট ইন দ্য আর্ট অফ বেঙ্গলঃ আ ফার্দার এভিডেন্স’, জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, খন্ড- ৭,দ্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডি অফ বেঙ্গল আর্ট, ২০০২, পৃষ্ঠা- ২৫৯-২৬২

৩০) প্রতাপাদিত্য পাল, “ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড”, মার্গ , ২০০২ পৃষ্ঠা -১১

৩১) বাংলাপিডিয়া

৩২) ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়,‘স্টাডিং আর্লি ইন্ডিয়া’ আর্কিওলজি, টেক্সটস্ অ্যান্ড হিস্টরিকাল ইস্যুস, পার্মানেন্ট ব্ল্যাক পাবলিশার্স, দিল্লী, ২০১১- ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা– ৬৯-৭০

৩৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৮

৩৪) রনবীর চক্রবর্তী, ‘ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩২

৩৫) শাহনাজ হুসেন জাহান, ‘বেঙ্গল অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান ওসিয়ান মেরিটাইম ট্রেড নেটওয়ার্ক ডিউরিং দ্য আর্লি হিস্টোরিক পিরিয়ড’, ইন গৌতম সেনগুপ্ত ও শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত “আর্কিওলজি অফ আর্লি হিস্টোরিক সাউথ এশিয়া” প্রগতি পাবলিকেশানস্ এবং সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিস অ্যান্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত, নিউ দিল্লী,২০০৮, পৃষ্ঠা- ৫৬৩

৩৬) রনবীর চক্রবর্তী, ‘ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি ’, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ১৩২

; নীহাররঞ্জন রায়,আদিপর্ব ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা- ৯৬

৩৭) নীহাররঞ্জন রায়,আদিপর্ব ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭

৩৮) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে, ‘প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৫৭

৩৯) রনবীর চক্রবর্তী, ‘ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি’, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ১৩৫

৪০) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদীপ দে, ‘প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড়’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা– ৫০৩-৫০৪

৪১) রনবীর চক্রবর্তী, ‘ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি ’, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ১৩৪

৪২) নীহাররঞ্জন রায়,আদিপর্ব ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা- ৯২-৯৩

৪৩) রনবীর চক্রবর্তী, ‘ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি’, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ১৩৩

৪৪) নীহাররঞ্জন রায়,আদিপর্ব ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’, প্রাগুক্ত , পৃষ্ঠা-৯৩

৪৫) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম “উচ্চ” মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২২

৪৬) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’, আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭

৪৭) দেবাঙ্গনা দেশাই, ‘এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস ইন দেয়ার সোশ্যাল কনটেক্সট’ (৬০০ বি সি ই – সি ই ৬০০), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৮

৪৮) এস কে শ্রীবাস্তব, ‘টেরাকোটা আর্ট ইন নর্দান ইন্ডিয়া’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১১২- ১১৩

৪৯) সমীর কুমার মুখার্জ্জী, ‘টেরাকোটা আর্ট ইন দ্য গাঙ্গেটিক ভ্যালী আন্ডার দ্য কুষানাস্’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮২

৫০) এস কে শ্রীবাস্তব, ‘টেরাকোটা আর্ট ইন নর্দান ইন্ডিয়া’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৫৯

৫১) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬০

৫২) তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৫

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন বঙ্গের মৃৎশিল্প ও সামাজিক প্রেক্ষিত

আদি ঐতিহাসিক বাংলার টেরাকোটা শিল্পের সহিত সম্পৃক্ত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের আলোচনার প্রয়াস বর্তমান লেখনী। প্রতিটি শিল্পধারার বিকাশের সহিত সম্পৃক্ত সামাজিক প্রেক্ষিতের ভূমিকা অসামান্য, তার অনুধাবন ব্যতীত এইরূপ শিল্প ইতিহাসচর্চা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যেকোনো শিল্পধারা আদতে তার সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। সমাজকে বাদ দিয়ে, তার দর্শক বা পৃষ্ঠপোষক কে বাদ রেখে কোন শিল্প কখনো স্থিতিশীল হতে পারেনা। তাই শিল্প সৃষ্টির পূর্বে তাকে অবশ্যই সমাজের কথা ভাবতে হয়; সময়ের সাথে পরিবর্তিত চাহিদা, পছন্দ অপছন্দের সাথে নিজেকে মানিয়ে চলতে হয় তথা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে তার সৃজনশীলতা, শিল্পস্বত্তাকে পরিচালিত ও পরিশীলিত করতে হয়। সুতরাং শিল্প ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক যে অবিচ্ছেদ্য সে সম্পর্কে সংশয়ের কোন ক্ষেত্র নেই। সময় ভেদে মানুষ নিজ জীবন, দর্শন, সমাজ সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে তুলে ধরার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে তার সৃজনশীলতা বা সৃষ্টি ক্ষমতাকে। হয়তো শিল্পের মাধ্যম পরিবর্তিত হয়েছে, শৈলী পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু তার সাথে জড়িত মানবিক আদর্শ নয়। তবে এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু একান্তই প্রাচীন বাংলার টেরাকোটা শিল্পধারা এবং তার সহিত সম্পৃক্ত সামাজিক প্রেক্ষিত অর্থাৎ আলোচ্য বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের মধ্য দিয়ে সমকালীন সামাজিক চিত্র বা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জনজীবন কতখানি প্রতিফলিত তা অনুসন্ধানের প্রয়াস। সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি, সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের চিন্তাধারা, পছন্দ অপছন্দ, ধর্মীয় বিশ্বাস, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানান অভিজ্ঞতা সযত্নে সংরক্ষিত হয় শিল্প উপাদানগুলির মধ্যে। ফলত এজাতীয় শিল্পের আলোচনায় তার সামাজিক প্রেক্ষিতের অনুধাবন আবশ্যক।

পূর্ববর্তী আলোচনার ভিত্তিতে আমরা দেখেছি আদি ঐতিহাসিক বাংলার শিল্প ইতিহাসে সমৃদ্ধ পোড়ামাটি শিল্পের বিকাশ ঘটেছে যেখানে সময়ের সাথে ভিন্ন প্রযুক্তি, কলাকৌশলের পাশাপাশি অবয়বগুলিতে সম্পৃক্ত হয়েছে নানান প্রতীকী যারা কখনো অপরিবর্তিত রূপে দীর্ঘকাল নিজ স্বত্তা বজায় রেখেছে আবার কখনো কালের বিবর্তনে নতুন সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সহিত সম্মিলিত হয়ে নিজ রূপের বিবর্তন ঘটিয়েছে। আর এই সমন্বয়ের সূত্র ধরেই সমগ্র গাঙ্গেয়

উপত্যকা ব্যাপী পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রে এক সর্বজনীন সংজ্ঞা গড়ে ওঠে বা সমজাতীয় শিল্পরীতির বিকাশ ঘটেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে, যার প্রমাণ উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে আবিষ্কৃত অসংখ্য সাদৃশ্যপূর্ণ অবয়ব। কিন্তু বলা বাহুল্য শিল্প উপাদানের স্বার্থকতা কেবল তার বাহ্যিক অবয়ব বা শৈলীতে সীমিত থাকেনা। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে এই জাতীয় আলোচনায় কখনোই ফর্ম বা শিল্পের বাহ্যিক উপস্থাপনার মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিৎ নয়। টেরাকোটা অবয়বগুলি তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দীর্ঘকাল সমাজে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে বলে বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক নথী রূপে আমরা তাকে পাই, ফলে উক্ত সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দীর্ঘকাল সে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় সেই প্রক্রিয়াকে অন্বেষণের ওপর গুরুত্ব আরোপের কথা বলেন তিনি।[১]

এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রধান ভূমিকা রয়েছে বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলগুলির, যাদের পরিচিতি ও শিল্পধারার বিস্তীর্ণ উপস্থাপনা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে উল্লিখিত। যার মাধ্যমে বলা যায় নির্বাচিত প্রত্নস্থলদ্বয় অর্থাৎ চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড় সহ আদি ঐতিহাসিক বাংলার পোড়ামাটি শিল্প ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার আরও অসংখ্য প্রত্নস্থল ও তাদের প্রত্নসম্ভার ইতিহাসে যাদের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিপূর্বের অধ্যায় সমূহের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাদের সকলের সম্পর্কেই আবশ্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে ফলত বর্তমানে উক্ত বিষয়াদির পুনরুক্তি অর্থহীন। তাই সরাসরি বাংলায় প্রাপ্ত বিবিধ পোড়ামাটি উপাদানের মধ্যে নিহিত সামাজিক প্রবনতার বিশ্লেষণ সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশ করাই শ্রেয়।

বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পে সম্পৃক্ত সমাজভাবনাঃ

বর্তমানে আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু টেরাকোটা শিল্প উপাদানগুলির প্রেক্ষিতে সমকালীন সমাজ ইতিহাস অনুধাবন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সামাজিক ইতিহাস কিন্তু কোন পৃথক বিষয় নয়; শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন তথা মানব জীবনের বিবিধ দিক আদতে সমাজের মধ্যে সম্পৃক্ত। বঙ্গীয় টেরাকোটার বিশেষত্বই হল তার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে। সেখানে যেমন বাস্তব রূপ পেয়েছে শিল্পীর মানস জগৎ তেমনই তারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা বিষয় থেকে নিজ শিল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছে। এক্ষেত্রে প্রথমেই সমকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় চেতনার কথা বলা যেতে পারে। কেননা শিল্পের সাথে ধর্মীয় চেতনার যোগ যে অবিচ্ছেদ্য বলা বাহুল্য। বাংলায় প্রাপ্ত টেরাকোটা অবয়বের মধ্যে দিয়েও সমকালীন ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বাস বা উক্ত কর্মকাণ্ডের নানান দিক সম্পর্কে

বিশেষভাবে আভাষ পাওয়া যায় বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। ইতিপূর্বেই প্রাপ্ত টেরাকোটা অবয়ব সমূহের সহিত সম্পৃক্ত ধর্মীয় প্রবনতার দিকগুলিকে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যা সমকালীন ধর্মচিন্তা বা বিশ্বাসের প্রতিফলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত তথা বিশ্বের নানান কেন্দ্রে প্রাপ্ত মাতৃকা অবয়বগুলি সমকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত মাতৃতান্ত্রিক চেতনার পরিচয় দেয়। যেখানে উক্ত অবয়বসমূহ উর্বরতা ও প্রজনন স্বত্তা জনিত ভিন্ন ভিন্ন কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত ছিল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। বাংলার ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রাপ্ত অধিকাংশ অবয়বে মানুষের প্রাথমিক ধর্মচিন্তার প্রতিফলন পাই, যেখানে মূখ্যত বিভিন্ন ভঙ্গীতে অজস্র মাতৃঅবয়ব গড়ে তোলা হয়েছে। যার প্রাপ্তির পরিমাণ উপস্থাপিত অন্য সকল অবয়বকে ছাপিয়ে যায়। তা নিঃসন্দেহে সমকালীন সমাজে উক্ত অবয়বগুলির প্রাসঙ্গিকতার দিকটিকে তুলে ধরে। এই মাতৃ অবয়বগুলিই পরবর্তী 'দেবী' চেতনার প্রাথমিক অভিব্যক্তি বলে অনুমান করা যেতে পারে।[২] স্বাভাবিক রূপেই ক্রমে মানুষের সংরক্ষণ চেতনা স্বরূপ সার্বিক মঙ্গল চিন্তার প্রতীক হিসেবে কখনো সম্পদ সমৃদ্ধির দেবী, কখনো শিশুর রক্ষাকর্ত্রী দেবী, কখনো শস্যাদির রক্ষাকর্ত্রী বা কখনো মৎস্য দেবীর ন্যায় অবয়বের বিকাশ ঘটেছে। এছাড়া পাওয়া যায় একাধিক যক্ষ যক্ষী অবয়ব, নাগ উপাসনার সহিত সম্পর্কিত অবয়ব, হাতে গড়া অজস্র পশুপাখির অবয়ব প্রভৃতি যাদের সাথেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের বিশ্বাস, প্রথা বা রীতিনীতি জড়িত ছিল বলে অনুমান করা হয়।

আবার দেখা যায় গবেষকগণ বাংলায় ক্রমে সামাজিক বিবর্তনের সাথে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য দেবস্বত্তার উপস্থিতিকেও চিহ্নিত করেছেন। হয়তো ক্রমে সময়ের ব্যবধানে সমাজব্যবস্থায় জটিলতা আসলে মানুষের চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হয়েছে ধর্মচেতনায় পরিবর্তন এসেছে। যা থেকে মানুষ তার নিজস্ব ধর্মীয় আবেগের নির্দিষ্ট রূপ দিতে তৎপর হয়েছে এবং ফলস্বরূপ বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে এই ধরণের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের বিকাশ ঘটেছে। পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পর্যায়ে স্বল্প কিছু বৌদ্ধ বা জৈন অবয়বও পরিলক্ষিত হয় বাংলায়। অর্থাৎ একাধারে লৌকিক চিন্তাধারা, ব্রাহ্মণ্য অবয়ব এবং বৌদ্ধ ও জৈন উপাদানের উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় বাংলার মানুষ উক্ত আদর্শসমূহের সহিত পরিচিত ছিলেন আলোচ্য সময়পর্বে। যদিও বৌদ্ধ, জৈন ঐতিহ্য বা ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারা অপেক্ষা মানুষের উক্ত প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাসের উপস্থিতির দিকটি অধিক প্রকাশিত পোড়ামাটি শিল্পধারার মধ্য দিয়ে যা নিঃসন্দেহে সমাজে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে নির্দেশ করে। উল্লেখ্য খ্রিষ্টপূর্ব সময়কাল থেকেই বাংলায় জৈন সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কিত ধারনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিভিন্ন তথ্যে, যা দীর্ঘকাল তথা আনুমানিক সপ্তম শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেই তুলনায় জৈন শিল্প সাক্ষ্য খুব সামান্য[৩]। অপরদিকে বাংলায় মোটামুটি কুষান পর্যায় থেকে

কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ অবয়বের উপস্থাপনা পাওয়া গেলেও তা নিশ্চিত রূপে সমাজে তার ধর্মীয় প্রাসঙ্গিকতাকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করে এমনটা নিশ্চিত রূপে বলা সম্ভব কিনা ভেবে দেখা দরকার। যদিও প্রাপ্ত বোধিস্বত্ত্ব অবয়ব, বেশ কিছু ফলকে জাতকের চিত্র উপস্থাপনা, কিছু ফলকে উপস্থাপিত চৈত্য, স্তূপ ইত্যাদির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি থেকে বাংলায় অন্তত শিল্পক্ষেত্রে উক্ত আদর্শের উপস্থিতির দিকটি উল্লেখ করা চলে। কেননা উক্ত সময়কাল বিচার করলে দেখা যায় তা ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির যুগ, বহির্বঙ্গীয় মানুষ তথা ঐতিহ্যের সহিত সমন্বয়ের যুগ, যার প্রভাব প্রতিফলিত হয় শৈল্পিক ক্ষেত্রে। সেসময় ভারতে কুষান আগমনে শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় চেতনা সর্বত্র এক সংমিশ্রনের সূচনা হয়েছিল। আর চন্দ্রকেতুগড় বা তমলুক এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরী তথা বাণিজ্যকেন্দ্রের ক্ষেত্রে উক্ত ধারার উপস্থিতি নেহাতই অপ্রত্যাশিত নয়।

শুধু উপরিউক্ত উপস্থাপনাই নয় বেশ কিছু স্থাপত্য ক্ষেত্রের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় যার মধ্যে ধর্মীয় প্রতিফলন সম্পৃক্ত থাকতে পারে বলে অনুমিত হয়। চন্দ্রকেতুগড়ে একটি ভগ্নফলকে ২টি পশু ও মৎস্য উৎকীর্ণ স্তম্ভের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় যা সম্ভবত কোন দেবতার মন্দিরের ভগ্নাংশ বলে ধারণা করা হয়।[৪] পাশাপাশি রাজ্য প্রত্নতত্ত্বশালায় সংরক্ষিত একাধিক ফলকে তোরণ জাতীয় প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ যার সাথে ময়ূরের উপস্থাপনা দেখা যায়। একাধিক ফলকে এইরূপ ময়ূরের উপস্থাপনা ধর্মীয় লক্ষণের প্রতিফলন নাকি উক্ত স্থাপত্য কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত কোন রাজকীয় শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত তা অন্যতম প্রশ্ন। আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাঘ্রপিষ্ঠে উৎকীর্ণ দম্পতির পশ্চাৎভাগে মন্দির ন্যায় আকৃতির উপস্থাপনার উল্লেখ করা হয়েছে,[৫] যা আলোচ্য পরিসরেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া এস এস বিশ্বাস[৬] কর্তৃক উল্লিখিত তমলুকের একটি শুঙ্গ পর্বীয় অবয়বের কথা বলা চলে যেখানে সাঁচি স্তূপের তোরণদ্বারের হুবহু এক ক্ষুদ্র প্রতিরূপ পরিলক্ষিত। এটি একাধারে বিদিশার সাথে শিল্প সাংস্কৃতিক সংযোগকে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি আদি ঐতিহাসিক বাংলার স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কেও ধারণা দেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন যদিও তার কোন চিত্র উপস্থাপনা তিনি প্রদান করেননি। এছাড়াও আরও একাধিক অবয়ব থেকে এজাতীয় স্থাপত্যশৈলীর সন্ধান মেলে যার গুরুত্ব অসামান্য, এজাতীয় উপস্থাপনা সম্ভবত সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাচরণের উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয় বলে অনুমান করা যেতে পারে। পাশাপাশি আরও একাধিক ফলকের সন্ধান মেলে বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে যেগুলি নানান ধর্মীয় প্রথা বা প্রচলিত রীতিনীতির সহিত সম্পর্কিত ছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ সমকালীন ধর্মীয় চিন্তা বা বিষয়াদি যে পোড়ামাটি শিল্পীদের নিকট অন্যতম গ্রহণীয় উপাদান ছিল বলাবাহুল্য। পাশাপাশি এই বিপুল

উপস্থাপনা সমাজে উক্ত দ্রব্যাদির চাহিদার দিকটিকেও প্রাসঙ্গিক করে তোলে, খুব স্বাভাবিক নিয়মেই সাধারণ মানুষের নিকট তার গুরুত্ব ছিল বলেই তা সৃষ্টির তাগিদ কাজ করেছিল কারিগর মহলে।

ধর্মীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি প্রাচীন বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথা সমকালীন সমাজ সংস্কৃতির নানান দিককে অনুধাবন করতে হলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই পোড়ামাটির উপাদানগুলি। কেননা বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের বিপুল পরিমাণ ফলকে কিন্তু এক সামাজিক প্রবনতাও লক্ষণীয়। যেখানে শিল্পী বা কারিগরগন ক্রমে তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সাধারন মানুষ ও তাদের বেঁচে থাকার মাধ্যম গুলিকে সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন নিজ কর্মের মধ্য দিয়ে, ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষ তার সাথে নিজেদের সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হন। যা উক্ত শিল্প শৈলীর জনপ্রিয়তা বা চাহিদার বৃদ্ধি ঘটায় সমাজে, এরই ফলশ্রুতি পরবর্তীতে আদি-মধ্য যুগ বা মধ্যযুগীয় পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ সামাজিক উপাদানের প্রাধান্য যার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় একটি সামগ্রীক সমাজের চরিত্র। এখন আলোচ্য টেরাকোটা উপাদানের প্রেক্ষিতে আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় সমাজের কোন কোন দিকগুলি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তার আলোচনা করা চলে।

প্রথমেই বলা যায় মানবসভ্যতার যেকোনো পর্যায়ে তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল সমকালীন পরিবেশ। তার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে মানুষের জীবনযাপন ও সংস্কৃতির বিকাশ। আর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মূলগত চরিত্রই ছিল অরণ্যকেন্দ্রিক, যার প্রমাণ পাওয়া যায় নানা সাহিত্যিক উপাদান বা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সাক্ষ্যে এবং অবশ্যই বাংলাও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বঙ্গীয় সমাজের নানান চরিত্র তৎকালীন টেরাকোটা শিল্পের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয় যার মধ্যে অন্যতম উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল। এর ব্যাপক উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলের প্রাপ্ত শিল্পসাক্ষ্যে। প্রথমেই উল্লেখ্য কলাগাছ, চন্দ্রকেতুগড়ের বেশ কিছু ফলকে উন্মত্ত হস্তী কর্তৃক বৃক্ষ উচ্ছেদনের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যা মূলত কলা গাছ বলেই অনুমিত হয়। এছাড়াও চন্দ্রকেতুগড়ের বিভিন্ন ফলকে, আম, কাঁঠাল, তাল প্রভৃতি বৃক্ষের উপস্থিতি লক্ষণীয়। পাশাপাশি ফুলের মধ্যে সর্বাধিক প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে পদ্ম, যা শ্রীলক্ষ্মী অবয়বের সহিত একাত্ম রূপে অসংখ্য ফলকে উপস্থাপিত রয়েছে বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলগুলিতে। এছাড়াও অশোক, কদম্ব প্রভৃতি ফুলের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় চন্দ্রকেতুগড়ে।[৭]

এরপর অবশ্য উল্লেখ্য বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত অসংখ্য পশুপাখি অবয়বগুলির কথা, যাদের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে বারংবার উঠে এসেছে। উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখেছি

দীর্ঘকাল ব্যাপী টেরাকোটা শিল্পীদের নিকট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব ছিল পশু পাখির উপস্থাপনা। সুদূর অতীত থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিদ্যমান হাতে গড়া অলংকরণ বর্জিত একক পশু-পক্ষী অবয়বের সহিত সম্পর্কিত প্রতীকী সংযোগ বা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনার দিকটি দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল অবয়বের উপস্থিতি একদিকে যেমন প্রচলিত ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান বা বিভিন্ন সামাজিক প্রথায় উক্ত পশুর প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরে তেমনই নিঃসন্দেহে সমকালীন সমাজে তাদের উপস্থিতির প্রমাণ দেয়।

প্রাপ্ত অবয়বের মধ্যে বৃষ, হস্তী, ঘোড়া, মেষ প্রভৃতি অবয়বের অধিক প্রাপ্তি সম্ভবত তাদের সামাজিক গুরুত্বকেও প্রতিফলিত করে। হরিনারায়নপুর, চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থান সহ বিভিন্ন বঙ্গীয় প্রত্নস্থলে বিভিন্ন পর্বের বৃষ মূর্তির সন্ধান মেলে, যার মধ্যে উল্লেখ্য হাতে তৈরি অলংকার বিহীন উপস্থাপনা সমূহ, যে ধারা ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, খুব সম্ভবত নানান ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হত এগুলি। এর পরেই উল্লেখ করা চলে হস্তী উপস্থাপনার কথা, সংখ্যাগত দিক থেকে সম্ভবত এর উপস্থাপনা সর্বাধিক। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় হাতির উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে। হরিনারায়নপুর, তমলুক, চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সর্বত্র কিছুটা গোলাকার ধাঁচের হাতে তৈরি চিরন্তন রীতির কিছু হস্তী মূর্তি যেমন মেলে তেমনই আবার কখনো খেলায় মত্ত রূপে, কখনো ডানা ও পদ্মনাল সহ সুসজ্জিত অলংকারসম্পন্ন হস্তী মূর্তির উল্লেখ মেলে বিভিন্ন অঞ্চলে। (চিত্র নং-১) এছাড়া ইতিপূর্বেই হাতি কর্তৃক বৃক্ষচ্ছেদনের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে সুসজ্জিত ঢঙে মানুষ বহনকারী রূপেও তাকে পাওয়া যায়। যা সমকালীন সমাজে হস্তী সম্পর্কিত গুরুত্বের দিকগুলিকেই প্রতিফলিত করে। আবার চন্দ্রকেতুগড়ের একটি ফলকে সন্তান সহ পশুদের পলায়নরত উপস্থাপনা লক্ষণীয়, (চিত্র নং-২) তা একদিকে যেমন শিল্পীর অসীম কারিগরী দক্ষতাকে ফুটিয়ে তোলে তেমনই সমাজে প্রচলিত শিকার ব্যবস্থারও ইঙ্গিত দেয়। এইরূপ গতিশীল বা ভিন্ন ক্রিয়ারত একাধিক ফলকের উপস্থাপনা চন্দ্রকেতুগড়ের শিল্পইতিহাসে বিশেষ মাত্রা যোগ করে যাদের একান্তই নান্দনিক শিল্পকর্মের উদাহরণ বলেই মনে হয়। এছাড়াও একাধিক পশুর বিবিধ উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলগুলিতে যা খুব বিস্তৃত রূপে এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবে মূলত ভেড়া,(চিত্র নং- ৩) হরিন, কুকুর, ঘোড়া, বাঁদর প্রভৃতি অসংখ্য অবয়ব মেলে। এছাড়াও মাছ, কচ্ছপ, গরু, গন্ডার, সিংহ প্রভৃতির উপস্থাপনাও লক্ষণীয়। আবার মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত উটের অবয়ব বাংলার সাথে পশ্চিম ভারতীয় সংযোগকে তুলে ধরে।[৮] কেননা বঙ্গীয় পরিবেশে উটের উপস্থিতি নেহাতই অপ্রত্যাশিত,

ফলত তার উপস্থাপনা বহির্দেশীয় বিষয়াবলীর সাথে বাংলার সাংস্কৃতিক সম্পর্কের দিকটিকে প্রকাশিত করে যা খুব সম্ভবত বাণিজ্য সূত্রে বাংলায় প্রবেশ করেছে।

অপরদিকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিবিধ পক্ষীর উপস্থাপনাও লক্ষণীয় চন্দ্রকেতুগড় সহ একাধিক প্রত্নস্থলে যার মধ্যে ময়ূর,পেঁচা,(চিত্র নং- ৪) হাঁস,টিয়া প্রভৃতির উপস্থিতি লক্ষণীয়। টিয়া সাধারণত প্রেমের দেবতা কামদেবের বাহন, বহু ক্ষেত্রে নারী মূর্তির সাথে টিয়ার উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় যা তাদের প্রিয় সঙ্গীর অনুপস্থিতে তার প্রতি অনুরাগ বা বিরহের প্রতীক আবার একই সাথে অবসর যাপনেরও মাধ্যম। ধর্মীয় প্রেক্ষিত ব্যতীতও সাধারণত বহু ক্ষেত্রেই শিশুদের খেলনা হিসেবে এবং অলংকরণের মাধ্যম হিসেবে তথা নান্দনিকতার প্রকাশস্বরূপ বিভিন্ন পশুপক্ষী উৎকীর্ণ ফলক বা অবয়বগুলি ব্যবহৃত হত বলে অনুমান করা যায়। সুতরাং বাংলার পরিবেশের বিভিন্ন দিককে অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তুলে ধরেছেন শিল্পীরা যা একাধারে সমকালীন দিনকাল সম্পর্কে ধারণা দেয় তেমনই পাশাপাশি টেরাকোটা শিল্পধারাকে সমৃদ্ধ করে।[৯] এসকল উপস্থাপনা শিল্পীদের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে দক্ষতারও পরিচয় দেয় যার ফলে পরিবেশের বিবিধ দিক তথা মানুষের সাথে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের দিকগুলিকে তারা সূক্ষ্ম ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন।

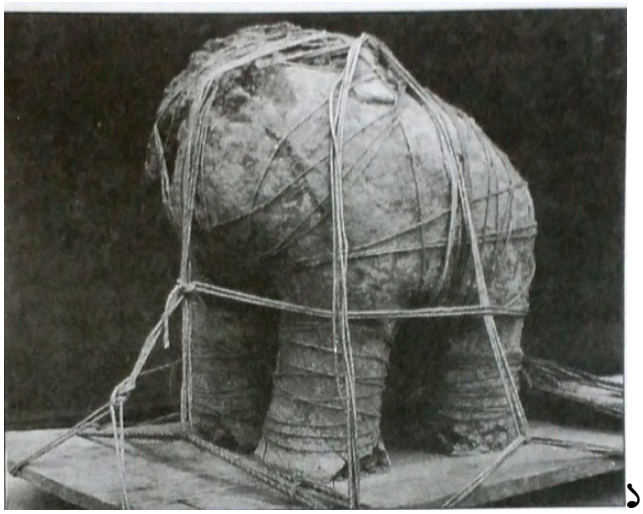

১

২

চিত্র নং- ১ হস্তী অবয়ব, মহাস্থানগড়, শাহ সুফী মোস্তাফিজুর রহমান, 'আর্কিওলজিকাল ইনভেস্টিগেশন ইন বোগড়া ডিসট্রিক্ট' , ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডি অফ বেঙ্গল আর্ট পাবলিকেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ ২০০০ পৃষ্ঠা- ১৮১

চিত্র নং-২ সন্তান সহ হরিণীর পলায়নরত উপস্থাপনা, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে – অশোক কুমার ভট্টাচার্য, ‘টেরাকোটাস্ অফ বেঙ্গল’, শুঙ্গ কুষান পিরিয়ড - প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত, “ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড”, মার্গ, ২০০২ পৃষ্ঠা – ৭১

৩

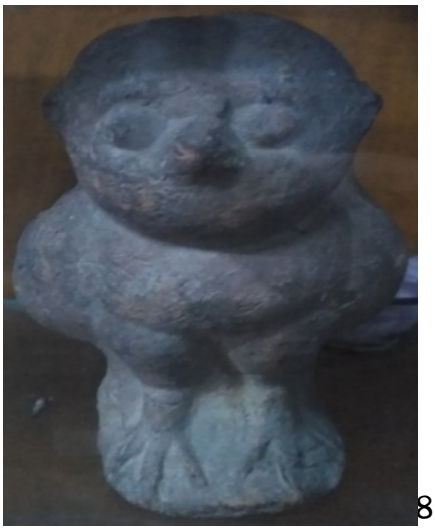

৪

চিত্র নং-৩ ভেড়া, মহাস্থানগড়, সৌজন্যে- মহম্মদ শফিকুল আলম ও Jean-Francois SALLES সম্পাদিত “ফ্রান্স বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়”, ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট ১৯৯৩-১৯৯৯, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি,বাংলাদেশ, ২০০১ , ১৯৯৩-১৯৯৯ পৃষ্ঠা-১১৫

চিত্র নং-৪ পেঁচা, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয় সংগ্রহালয়, ব্যাক্তিগত চিত্র সংগ্রহ

উপরিউক্ত প্রসঙ্গ থেকেই বলা যায় আদি ঐতিহাসিক বাংলায় প্রাপ্ত অন্যতম অবয়ব হল একাধিক পশুর পিঠে উপবিষ্ট মনুষ্য উপস্থাপনা এবং একাধিক পণ্য বা মনুষ্য বাহী খেলনা গাড়িরও (চিত্র নং-৫ক,৫খ) সন্ধান মেলে যেগুলি হয়তো একস্থান থেকে অন্য স্থানে প্রয়োজনীয় বস্তু সম্পদ বা মানব সম্পদ পরিবহনে সহায়ক ছিল বলে অনুমান করা যায়। কেননা প্রাচীনকালে এইসকল উপাদানই ছিল পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তবে এক্ষেত্রেও কিন্তু কিছু প্রশ্ন আসতে পারে যেমন খেলনা গাড়িগুলির বাস্তবিকতা অনুমান করা গেলেও অন্যান্য পশুর পিঠে পরিবহনের বিষয়টি ক্ষেত্রবিশেষে ভেবে দেখা প্রয়োজন। কেননা, সর্বদা উক্ত অবয়ব যে সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমনটা নাও হতে পারে। যেমন- মেষ বা হস্তীর পিঠে উৎকীর্ণ ২টি অবয়বকে অগ্নি ও ইন্দ্রদেব রূপে কল্পনা করা হয়, সেক্ষেত্রে হতেও পারে এরূপ উপস্থাপনা অর্থাৎ উক্ত পশু নির্দিষ্ট ঐশ্বরিক শক্তির সহিত সম্পৃক্ত বা তার বাহন রূপে পরিগণিত ছিল। বলা চলে ঘোড়া বা হাতিকে সমসাময়িক পর্বে পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা গেলেও আরও একাধিক

উপস্থাপনা যথা কুকুর, বাঘ, ভেড়া এজাতীয় প্রাণীর পিঠে সাধারণ মানুষের পথ অতিক্রমের বিষয়টি দ্বিধান্বিত। তাই এজাতীয় অবয়বের সামাজিক বাস্তবিকতার দিকটি হয়তো ভেবে দেখা দরকার। আবার মঙ্গলকোট থেকে একটি ফলকের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে এক নারী অবয়ব তরবারি হাতে ঘোড়ার পিঠে উৎকীর্ণ। (চিত্র নং- ৬) এইরূপ একটি অবয়ব দেখে একদিকে যেমন তাকে নারী সৈন্য বা যোদ্ধা রূপে কল্পনা করা যায় তেমনই আবার কোন প্রতিরক্ষা দেবী হিসেবেও তার উপস্থাপনা অসম্ভব নয়।[১০] ফলস্বরূপ এজাতীয় অবয়বকে ঠিক কোন পর্যায়ে রাখা যায় সেটি অন্যতম জটিল প্রশ্ন।

৫ক

৫খ

চিত্র- ৫ক অশ্বারোহী, মহাস্থানগড়, সৌজন্যে- শাহ সুফী মোস্তাফিজুর রহমান, 'আর্কিওলজিকাল ইনভেস্টিগেশন ইন বোগড়া ডিসট্রিক্ট', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৩

চিত্র-৫খ পণ্যবাহী গাড়ি, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল ,কলকাতাঃ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম , ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৩৫২

চিত্র- ৬ ঘোড়ায় উপবিষ্ট নারী মূর্তি, মঙ্গলকোট, সৌজন্যে – অশোক কুমার ভট্টাচার্য, 'টেরাকোটাস্ অফ বেঙ্গল', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৬৯

তবে উল্লেখ্য উপরিউক্ত উপস্থাপনা স্বত্তেও অর্থাৎ নির্দিষ্ট শ্রেণীর উপস্থাপনার সাথে বিশেষ ধর্মীয় চেতনা সম্পৃক্ত থাকলেও হাতি, ঘোড়া বা অন্যান্য কিছু পশুর পিঠে অবতীর্ণ মনুষ্য অবয়বগুলি যে পরিবহণ ব্যবস্থার অন্যতম পথ হিসেবে প্রতিফলিত হতে পারে তা কখনোই অস্বীকার করা চলেনা। কেননা প্রাপ্ত অবয়বগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে সকল উপস্থাপনা কিন্তু একই ধাঁচের নয়, হস্তীর পিঠে উৎকীর্ণ ইন্দ্রদেব রূপে পরিগণিত অবয়বের সাথে অপর হস্তী পিঠে উপবিষ্ট মনুষ্য অবয়বের স্পষ্ট পার্থক্য দৃশ্যমান। সেই বাহ্যিক উপস্থাপনার দিকটিও ভেবে দেখা দরকার। (চিত্র নং- ৭,৮) অর্থাৎ তৎকালীন সময়পর্বে স্থলপথের যোগাযোগ মাধ্যম রূপে বিভিন্ন পশু বা কিছু পশুচালিত গাড়ির অস্তিত্বের অনুমান করা যায় আলোচ্য টেরাকোটা শিল্পমাধ্যমের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি জলপথেও নিঃসন্দেহেই নৌকো বা সমজাতীয় অন্য জলযানের উপস্থিতি ছিল বলা বাহুল্য। কেননা তা নাহলে বিপুল পরিমাণ সমৃদ্ধ বাণিজ্যের বিকাশ সম্ভবপর হতনা যার বিস্তীর্ণ আভাষ রয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। একাধিক সীলমোহর বা নামমুদ্রায় খোদিত নৌযানের চিত্র তার গুরুত্বপূর্ণ নথী।

৭

৮

চিত্র- ৭ – হস্তী বাহী ইন্দ্র, ছাঁচ নির্মিত, চন্দ্রকেতুগড়,সৌজন্যে এলোকোয়েন্ট আর্থ, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ১৬৮

চিত্র-৮ - সাধারণ হস্তী আরোহী, চন্দ্রকেতুগড়, হস্ত নির্মিত অবয়ব, সৌজন্যে- 'এলোকোয়েন্ট আর্থ',প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬৬

এর পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, তাদের অবস্থান সম্পর্কে যদি আলোকপাত করতে হয় সেখানে দেখা যাবে তার বেশ কিছু চরিত্রের প্রতিফলন কিন্তু প্রকাশিত হয় পোড়ামাটি শিল্পীদের হাত ধরে। যেমন বিশেষ উল্লেখ্য, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত ফলকের মধ্য দিয়ে সমাজের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত একাধিক শ্রেণীর আভাষ অনুমিত হয় যা একাধারে সমাজে তৎসম্পর্কিত কিছু পেশারও ইঙ্গিতবাহী বলে ধারণা করা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে এগুলি সমকালীন আর্থ- সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নথী। যেমন প্রথমেই বলা যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত চন্দ্রকেতুগড়ের একাধিক ফলকে জাঁকজমক পূর্ণ অলংকার সুসজ্জিত পুরুষ, সঙ্গে তার সঙ্গিনী (মহিষী) সহ উপস্থাপিত। তিনি কখনো হাতির পিঠে কখনো বা সিংহাসন জাতীয় অবয়বে উপবিষ্ট। এই জাতীয় অবয়ব হতেই পারে কোন আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করে নির্মিত তবে পাশাপাশি এগুলি একান্তই সামাজিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত এও সম্ভব। ফলে হয়তো ক্ষমতাবান পুরুষ বা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বের/(রাজা?) প্রতিফলন রূপে তাকে অনুমান করা চলে। কেননা সমাজের সাধারণ মানুষ বা শিল্পীদের নিকট নিঃসন্দেহেই

রাজকীয় জীবনযাত্রা বা তাদের রীতিনীতি বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল, ফলত তাদের হতেই পারে শিল্পক্ষেত্রে তাকে ফুটিয়ে তুলতেও তারা আগ্রহী হয়েছিলেন।

আরও কিছু মনুষ্য অবয়বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যাদের বাহ্যিক উপস্থাপনা বা আঙ্গিক পূর্ববর্তী ধর্মীয় রীতিনীতির সহিত সম্পর্কিত অবয়ব অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন। মোটামুটি শুঙ্গ পর্যায় (২য়-১ম খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) থেকে এজাতীয় অবয়বের উল্লেখ মেলে, যাদের সাধারণত নগরাঞ্চলের ধনী শ্রেষ্ঠী পুরুষ বা মহিলার প্রতিফলন বলে মনে করা হয়। এদের প্রতীকি হিসেবে নারী পুরুষ ভেদে রুচিসম্পন্ন মার্জিত পোশাক, মাথায় উষ্ণীষ, বিভিন্ন সমৃদ্ধ অলংকার যথা মালা, কানের দুল, বালা প্রভৃতি লক্ষণীয়। আবার উপরিউক্ত পোশাক বা অলংকারে সজ্জিত পুরুষ অবয়বকে বীণা ইত্যাদি বাদনরত রূপেও পাওয়া যায় যেগুলি প্রতিপত্তিসম্পন্ন নাগরিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার প্রতিফলন রূপে উপস্থাপিত হতেই পারে। বিশেষরূপে চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক এর ন্যায় বাণিজ্য সমৃদ্ধ অঞ্চলের পাশাপাশি আদি ঐতিহাসিক বাংলার বেশ কিছু কেন্দ্রেও এজাতীয় কিছু উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়। অশোক কুমার ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন, এসকল অবয়বের উপস্থাপনার সহিত তথাকথিত যক্ষ- যক্ষী অবয়বের বাহ্যিক উপস্থাপনার কিছু মিল আছে। যদিও তাদের আধ্যাত্মিক সংযোগ কিন্তু বিশেষ পরিলক্ষিত নয়, ফলত এধরনের অবয়ব সার্বিকভাবে যক্ষ – যক্ষী উপস্থাপনার আঙ্গিক দ্বারা অনুপ্রানিত হলেও আপাত দৃষ্টিতে তাদের নাগরিক জীবনের প্রতিফলন বলেই অনুমান করা যেতে পারে।[১১] চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত এরূপ ১টি অবয়বের উপস্থাপনা করা হল নীচে- (চিত্র নং-৯)

চিত্র-৯ নাগরিক, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে – অশোক কুমার ভট্টাচার্য, ‘টেরাকোটাস্ অফ বেঙ্গল’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ৭০

আবার বেশ কিছু অবয়বের উপস্থাপনা থেকে তাদের মূলত যোদ্ধা বা সৈন্য রূপে গন্য করা হয়, যেমন রাজ্য প্রত্নতত্ত্বশালার সংগ্রহালয়ে রক্ষিত একটি গোলাকার হাতে গড়া পুরুষ মূর্তি পাওয়া যায় যেখানে তিনি পাগড়ির পরিবর্তে মাথায় শিরস্ত্রাণ বা হেলমেট পড়ে আছেন এবং কাঁধে তরবারি বহন করছেন যা মূলত তাকে সৈন্য আখ্যায় ভূষিত করে। (চিত্র-১০) তমলুক এও এজাতীয় অবয়ব মেলে।

চিত্র নং-১০ তরবারি সহ যোদ্ধা, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৯১

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত একটি ফলকে উপস্থাপিত আঙ্গিককে শিকারের দৃশ্য রূপে অনুমান করা হয়, যেখানে হাতে অঙ্কুশ নিয়ে হাতির পিঠে এক পুরুষ উপবিষ্ট এবং সামনে একটি হরিণ পলায়নরত।[১২] (চিত্র -১১) এছাড়াও একাধিক বেশ কিছু অবয়ব থেকে শিকারের উপস্থিতি অনুমেয়। যদিও চন্দ্রকেতুগড়ের ন্যায় সমৃদ্ধ নগর অঞ্চলে শিকার নির্ভর জীবনযাপন কিছুটা অনভিপ্রেত, তাই একে কি সমকালীন সমাজের উচ্চ শ্রেণীর বিলাসিতা বা অবসর যাপনের একটি মাধ্যম রূপে অনুমান করা যেতে পারে? নাকি এরূপ উপস্থাপনার পশ্চাতে অন্য কোনও উদ্দেশ্য কাজ করেছিল সেটি ভেবে দেখা দরকার। যদিও যেকোনো নগরাঞ্চলে আর্থিক প্রতিপত্তি সম্পন্ন নাগরিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার অন্যতম অঙ্গ রূপে বিভিন্ন ধারার বিলাশ বা বিনোদনের উপস্থিতির বিষয়টি অত্যন্ত প্রত্যাশিত, যার মধ্যে শিকার অন্যতম। যেমন- তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা পর্বে দেখা গেছে উত্তর ভারতীয় কেন্দ্র রাজঘাট, কৌশাম্বী প্রভৃতির ন্যায় সমৃদ্ধ অঞ্চলের টেরাকোটা অবয়বেও কিন্তু শিকারের উপস্থাপনা লক্ষণীয়। যা সমকালীন ইতিহাসে এর প্রাসঙ্গিকতাকে প্রকাশিত করে।

চিত্র-১১ শিকার দৃশ্য, চন্দ্রকেতুগড়, ২য়-১ম খ্রিষ্টপূর্বাব্দ, সৌজন্যে- 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২০৪

যেকোনো সমাজের সার্বিক বিকাশের প্রধান স্তম্ভ তার অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে যার মধ্যে অন্যতম ভিত্তি হল কৃষি ও বাণিজ্য যার বিস্তীর্ণ আভাষ দেয় বঙ্গীয় টেরাকোটা শিল্প। এর মধ্য দিয়ে সমকালীন বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন যাপন সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা করা যায় প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে যার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমেই বলা যায় কৃষিব্যবস্থার কথা, কেননা আর্থিক উন্নয়নের প্রাথমিক ধাপ হল সমৃদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থা। আর আদি ঐতিহাসিক পর্বে বঙ্গীয় সমাজে এর প্রাসঙ্গিকতার ইঙ্গিত পাই একাধিক টেরাকোটা ফলকে প্রকাশিত তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির উপস্থাপনা থেকে। যেমন চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটি ফলকে তিনজন ব্যক্তি কর্তৃক কাস্তে দিয়ে ফসল কাটার দৃশ্য পরিলক্ষিত যা কৃষিকাজ সম্পর্কিত স্পষ্ট ধারনার ইঙ্গিত দেয়। (চিত্র নং-১২) আবার আরও একাধিক ফলকের উল্লেখ পাওয়া যায় যা আদতে সমৃদ্ধ কৃষিব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতাকে প্রকাশিত করে। যেমন, ইতিপূর্বেই চন্দ্রকেতুগড়ে 'ধান্যদেবী'র কথা উল্লিখিত, যেখানে উপস্থাপিত দেবী মূর্তির সাথে ধান বা শস্যদানার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে; আবার কোশামে উৎখননকালে খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতকীয় স্তরে মাটির ফলকের ওপর প্রস্ফুটিত একটি নারী মূর্তি আবিষ্কৃত যার মাথা দিয়ে অনুরূপ ধাঁচে গাছের শাখা প্রশাখা বা ধান্য মঞ্জরী উৎসারিত হচ্ছে, চন্দ্রকেতুগড় ছাড়াও এইরূপ মূর্তি পাওয়া যায় ঐ সময়কালীন মঙ্গলকোটে যিনি দুর্গার শাকম্ভরী রূপকে পরিপুষ্ট করেন বলে ব্রতীন্দ্রনাথ বাবু উল্লেখ করেন।[১৩]

(চিত্র নং-১৩) অর্থাৎ নানাভাবে আদতে শস্যাদির সংরক্ষণ ও উর্বরতার প্রতীক হেতু এইরূপ মাতৃ অবয়বের উপস্থাপনা করা হয়েছে। যা সমকালীন সমাজে উক্ত শস্যাদির গুরুত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়।

চিত্র-১২

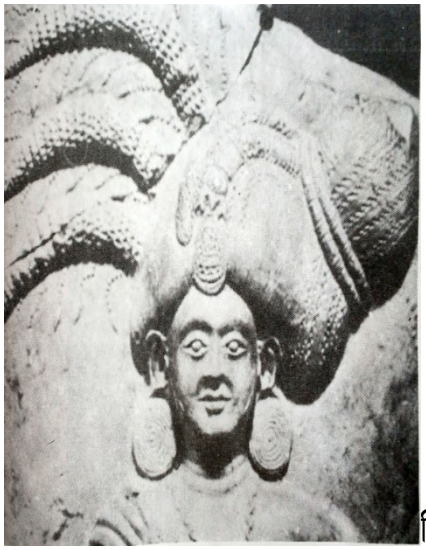

চিত্র-১৩

চিত্র-১২ লাঙল ও কাস্তে সহযোগে ফসল কাটা তথা কৃষিকাজ দৃশ্য, চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- এলোকোয়েন্ট আর্থ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২১১

চিত্র-১৩ শাকম্বরী মূর্তি, চন্দ্রকেতুগড় , ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, প্রাগুক্ত , চিত্রপত্রাবলী – ৪১

বলাবাহুল্য, কৃষিনির্ভর গোষ্ঠীর নিকট মাতৃদেবীর উপাসনা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মাতৃদেবীর আরাধনার সাথে কৃষি বা শস্য উৎপাদনের চেতনা কিন্তু পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত। কেননা উভয় ক্ষেত্রেই প্রধান চেতনা 'উর্বরতা', ফলত উক্ত আদর্শ থেকেই কৃষিনির্ভর সমাজে তৎসম্পর্কিত নানান ধর্মানুষ্ঠান বা আরাধনার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এছাড়া উল্লেখ্য ধানের কথা, বাংলার প্রধান খাদ্যশষ্য হল ধান। বাংলায় প্রাপ্ত একাধিক ফলক বা সীলে ধানের ছড়ার উপস্থিতি রয়েছে। তমলুক ,বানগড়, চন্দ্রকেতুগড়ে শষ্য সম্বলিত একাধিক ফলকের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার একটি ফলকে উপস্থাপিত বর্ণনা থকে কিছু লোকউৎসবের উপস্থিতি অনুমান করা হয়, যাকে সাধারণত কৃষিকার্যের সাথে সম্পর্কিত রীতি বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। উক্ত ফলকে কিছু অবয়বের হাতে শস্যদানার উপস্থিতি সহ এক শোভাযাত্রা লক্ষণীয়, আলোচনা প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ে তার

উপস্থাপনা রয়েছে। সুতরাং কৃষিকে কেন্দ্র করে কিছু প্রচলিত লোকানুষ্ঠানের আভাষ দেয় পোড়ামাটি ফলকগুলি যা খুব স্বাভাবিক সমাজে কৃষির গুরুত্বের দিকটিকে প্রকাশিত করে।

এই আলোচনা পরিসরে অরুন্ধতী ব্যানার্জী-র একটি বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তিনি প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কৃষির উর্বরতার উদ্দেশ্যে ষাঁড় ও গরুর উপাসনার কথা উল্লেখ করেছেন। 'ষাঁড়' কে একাধারে শক্তি ও উর্বরতার প্রতীক রূপে গ্রহন করা হত এবং কুল্লি, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, আহার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্রে প্রাপ্ত বিপুল 'ষাঁড়' অবয়বগুলি আদতে ভারতে 'ষাঁড়' উপাসনার পথিকৃৎ বলে তিনি উল্লেখ করেন। অপরদিকে 'গরু' ছিল কৃষক তথা সাধারণ মানুষের নিকট বিশেষ গ্রহণীয়, কেননা সে সর্বাধিক খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করত। ফলত একাধারে সুরক্ষা, উর্বরতা, প্রতিপত্তির উদ্দেশ্যে এইরূপ উপাসনা করা হত যার মূলে ছিল আদতে কৃষি বা শস্য উৎপাদন।[১৪] তাহলে কি অনুমান করা চলে এই অনুরূপ প্রবনতা বাংলার ক্ষেত্রেও কার্যকর ছিল? কেননা চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় বা অন্যান্য বঙ্গীয় বিভিন্ন প্রত্নস্থলে একাধিক এজাতীয় পশু অবয়বের উপস্থাপনা মেলে, এমনকি আজও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে এদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তাছাড়া উক্ত অবয়বের সহিত ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের সংযোগের সম্ভাবনার দিকগুলি ইতিপূর্বেই ২য় অধ্যায়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে, যার থেকে অরুন্ধতী ব্যানার্জীর উপরিউক্ত বক্তব্যটি বাংলার ইতিহাসেও প্রাসঙ্গিক বলেই অনুমান করা যেতে পারে। অর্থাৎ সামগ্রীকরূপে আদি ঐতিহাসিক টেরাকোটা শিল্পউপাদানের প্রেক্ষিতে সমকালীন বঙ্গীয় সমাজে কৃষির গুরুত্বের দিকটি বিশেষ রূপেই অনুধাবনযোগ্য সন্দেহ নেই।

কৃষির পরেই আসে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অর্থাৎ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড। এখন প্রশ্ন হল টেরাকোটা শিল্পের মধ্য দিয়ে সমকালীন বাণিজ্য সম্পর্কে কতখানি ধারণা পাওয়া সম্ভব। প্রথমত বলা যায়, বেশ কিছু ফলকে পাগড়ি, মার্জিত বস্ত্র, অলংকার সহ কিছু পুরুষ অবয়বের সন্ধান মেলে যাদের দৈহিক ভঙ্গিমা থেকে তাদের কিছুটা বণিক বা শ্রেষ্ঠী পুরুষের প্রতিফলন বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। বর্তমান অধ্যায়েই ইতিপূর্বে তার উপস্থাপনা রয়েছে। ফলত বণিকের উপস্থাপনা মানে তা নিশ্চিত বাণিজ্যের আভাষ।

দ্বিতীয়ত, একাধিক পোড়ামাটির সীলমোহর বা নামমুদ্রার সন্ধান মেলে চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে যা নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি । যেমন- চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত একটি সীলমোহরের উল্লেখ করা যায় যার মধ্য দিয়ে সমুদ্র বাণিজ্যের আভাষ মেলে। বর্তমানে সেটি রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের সংগ্রহশালায় রক্ষিত(Acc No.- CKG 184)। এতে একটি মাস্তুল সংলগ্ন জাহাজ সহ উড়ন্ত ধ্বজা, শস্যদানা প্রভৃতি প্রতিকৃতি রয়েছে এবং এক কিংবদন্তী

উৎকীর্ণ যেখানে যশোদা অর্থাৎ বহির্বিশ্বে খাদ্য সম্পদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত একজন বণিকের তিন দিশা তথা তিন দেশে যাত্রার কথা বলা হয়েছে বা তাকে উদ্দেশ্য করে বর্ণিত হয়েছে। সমুদ্রবাহী জাহাজ, শস্যদানা তার শস্য বাণিজ্যের চরিত্রকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। (চিত্র নং- ১৪) এরূপ আরও একাধিক সীলমোহরের সন্ধান মেলে যা সমকালীন অর্থনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নথী।[১৫]

এছাড়া তৃতীয়ত বলা চলে, পোড়ামাটির উপাদানগুলি স্বয়ং নিজেই বহুলাংশে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের প্রতীক। ক্রমে সময়ের বিবর্তনে বঙ্গীয় মৃৎশিল্পের ধারায় নানান আদর্শ, ঐতিহ্যের সম্মিলন ঘটেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রযুক্তি-কলাকৌশল, বিষয়বস্তু, প্রতীকী, আঙ্গিক, অলংকরণের আবির্ভাব ঘটেছে। নানান বহির্বঙ্গীয় আদর্শ বা ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বঙ্গীয় শিল্পধারায়। যার অন্যতম কারণ নিঃসন্দেহে বিস্তীর্ণ বাণিজ্যিক সংযোগ। এই সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনা উল্লিখিত তৃতীয় অধ্যায়ে, অর্থাৎ আলোচ্য কালপর্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাণিজ্য যে অন্যতম ভিত্তি ছিল তার উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্য এই বিস্তির্ণ পোড়ামাটি শিল্পধারা।

চিত্র - ১৪ , জলযান, শস্যদানা প্রভৃতি উৎকীর্ণ পোড়ামাটি সীল, প্রাপ্তিস্থান- চন্দ্রকেতুগড়, সৌজন্যে- ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'নিউ এপিগ্রাফিক অ্যান্ড পেলিওগ্রাফিক ডিসকভারিস', "প্রত্নসমীক্ষা"- ১ম খন্ড, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি, গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা,১৯৯২

পরবর্তীতে উল্লেখ করা চলে বাংলার বিবিধ প্রত্নস্থলগুলির প্রাপ্ত পোড়ামাটি ফলকে উপস্থাপিত অবয়বের মধ্যে নৃত্য- গীত বাদ্য, লোকায়ত অনুষ্ঠানাদির উপস্থাপনা স্থান পেয়েছে তৎকালীন শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্যে। যেমন- তমলুক, চন্দ্রকেতুগড়ের বেশ কিছু ফলকে নারী

পুরুষ নির্বিশেষে সুসজ্জিত নৃত্যরত মূর্তির উপস্থাপনা বিদ্যমান, তমলুকে প্রাপ্ত একটি ফলকে নৃত্যরত নারীর উপস্থাপনা রয়েছে যিনি এমব্রয়ডারি করা ফুলহাতা পোশাক (ব্লাউজ?) পরিহিতা অর্থাৎ একাধারে নৃত্যশিল্প ও সমকালীন পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেয় ফলকটি।[১৬] এছাড়াও এজাতীয় আরও একাধিক ফলক মেলে চন্দ্রকেতুগড়ে যেমন একটি ফলকে বীণা বাদনরত এক পুরুষের সাথে নৃত্যরত মহিলার উপস্থাপনা রয়েছে,[১৭] (চিত্র নং- ১৫) তেমনই পৃথক পৃথক ভাবে নারী পুরুষ নর্তক- নর্তকী পরিলক্ষিত। আবার কখনো একত্রে বহুজনের মিলিত জলসার ন্যায় অনুষ্ঠানেরও উপস্থাপনা রয়েছে বঙ্গীয় টেরাকোটায়।[১৮] এরূপে বাংলার একাধিক ফলকে নৃত্যশৈলীর উপস্থাপনা এবং উক্ত অবয়বাদির আঙ্গিকে শিল্পীর দক্ষতা নিশ্চিত রূপে সমাজে এই শিল্পের জনপ্রিয়তার দিকটিকে তুলে ধরে। পাশাপাশি কিছু ফলকে নারী, পুরুষ নির্বিশেষে বীণা বাদক ও ঢাক (ড্রাম) বাদকের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। একটি ফলকে ধুতি জাতীয় বস্ত্র, ভারী নেকলেস,কানের দুল, ও অনন্য কেশ অলংকারে সুসজ্জিতা নারী ড্রামার এর উপস্থিতি লক্ষণীয়।[১৯] এইরূপ আরও একাধিক উপস্থাপনার সন্ধান পাওয়া যায় আদি ঐতিহাসিক বাংলার প্রাপ্ত টেরাকোটা শিল্প সামগ্রীর মধ্যে যা সমাজে একাধিক মাধ্যমের শিল্পকলা চর্চার ইঙ্গিতবাহী। পাশাপাশি অপর একটি বিষয়ও উল্লেখ করা চলে এই সকল ফলকে এই ধরণের ভূমিকায় নারীর উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে বাস্তবিক জীবনেও ক্ষেত্র বিশেষে সমাজে নারীদের অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়। তারা যে কেবল ঘরে আবদ্ধ ছিলনা, বহির্জগৎ সম্পর্কেও ওয়াকিবহল ছিলেন তার আভাষ মেলে। তবে বলা বাহুল্য তা নিঃসন্দেহেই সমাজের সকল শ্রেণীর নারীর কাছে সমান ছিলনা, তা বিশেষ কিছু জনের মধ্যেই সীমিত ছিল। হয়তো রাজ দরবারে বা সমাজে সমৃদ্ধ নাগরিক শ্রেণীর নিকট বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে এই সকল শিল্পীদের বিশেষ কদর ছিল। কেননা এইরূপ বিনোদন বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিকাশ উপযুক্ত নাগরিক পরিবেশেই বিশেষ রূপে বিস্তার লাভ করে বলে মনে করা যায়। ফলত হতেই পারে উক্ত বিষয়বস্তুকে পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রেও তুলে ধরা হয়েছে শহুরে পৃষ্ঠপোষকদের পছন্দ বা চাহিদার কথা মাথায় রেখে।

চিত্র- ১৫ বীণা বাদক সহ নৃত্যরত উপস্থাপনা, চন্দ্রকেতুগড়, আনুমানিক ১ম-২য় শতক, সৌজন্যে – 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৩৮

তবে উল্লেখ্য এগুলি সম্পর্কে কিন্তু আবার ২ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা যায়। প্রথমত, তা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বিনোদন জগতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যা শিল্পী তার কাজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছে এবং দ্বিতীয়ত, অবশ্যই এর কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ এই ধরণের অবয়ব সম্পূর্ণতই ধর্মীয় সংযোগ বিহীন শিল্প অবয়ব এমন কথাও কিন্তু নিশ্চিত রূপে সর্বদা বলা যায়না। হতেই পারে উক্ত নৃত্য গীত ইত্যাদি সমাজের লোকায়ত ধর্মবিশ্বাসের সহিত জড়িত ছিল। তাই সার্বিকভাবে সকল অবয়বকে একই চিন্তাধারায় শ্রেণীভুক্ত করা যথার্থ হবেনা। তবে উদ্দেশ্য যাইহোক, আলোচ্যপর্বে বঙ্গীয় সমাজে এজাতীয় বিষয়াবলীর উপস্থিতির কিন্তু ইঙ্গিত দেয় প্রাপ্ত ফলকগুলি। অর্থাৎ ধর্ম, বিনোদন, পেশা, শিল্প, নান্দনিকতা সকল চিন্তাধারাই কিন্তু এখানে একত্রে সম্মিলিত বলা যেতে পারে।

উপরিউক্ত শিল্পকলা বা বিনোদন জনিত বিষয়াদির উপস্থাপনা যেমন মেলে পাশাপাশি তেমনই চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত নানান ভঙ্গির নরনারী অবয়ব গুলি থেকে কিন্তু সমকালীন পোশাক পরিচ্ছদ, অলংকারাদির ব্যবহার সম্পর্কেও কিছু ধারণা করা যেতে পারে। কেননা পোশাক পরিচ্ছদ উক্ত মানুষের রুচি পছন্দ বা সামাজিক অবস্থান বোঝানোর ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত সমাজ-সংস্কৃতি, পরিবেশ, আর্থ সামাজিক অবস্থান, ঐতিহ্যগত সম্মিলন প্রভৃতি মানুষের বাহ্যিক পোশাক পরিচ্ছদ বা রুচির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যেকোনো অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জগতে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। ফলত সমসাময়িক বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চর্চায় প্রাপ্ত টেরাকোটা

অবয়বে প্রতিফলিত পোশাক পরিচ্ছদ বা অলংকরণের ওপর আলোকপাত তাৎপর্যপূর্ণ। উপস্থাপিত নারী অবয়বগুলি প্রায় সবই অত্যাধিক জাঁকজমকপূর্ণ রূপে উপস্থাপিত কেননা ভারতীয় সৌন্দর্যের রহস্যই সেখানে। প্রায় অধিকাংশ নারী মূর্তির পরনে সাধারণত শাড়ি জাতীয় বস্ত্রখন্ড পরিলক্ষিত যা নাভীদেশ স্পষ্ট রূপে উন্মুক্ত রেখে কোমরের নীচের দিক থেকে হাঁটু বা তার কিছুটা নিচ পর্যন্ত পরিহিত, এবং দেহের ওপরের অংশ অসংখ্য অলংকার দ্বারা সজ্জিত থাকলেও মূলত তা অনাবৃত বা নগ্ন রূপে উপস্থাপিত তবে কখনো কখনো উত্তরীয় জাতীয় বস্ত্রের উপস্থিতিও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া মৌর্য পর্বের কিছু ফলকে স্কার্ট বা ঘাঘরার উপস্থিতি লক্ষণীয়। (চিত্র নং-১৬) পাশাপাশি শুঙ্গ কুষান পর্বীয় অবয়বে আবার পোশাকে হেলেনীয় সংযোগের প্রতিফলন উল্লেখযোগ্য। অপর দিকে পুরুষ অবয়বে ধুতি, উত্তরীয়, উষ্ণীষ প্রভৃতি মূলগতভাবে স্থান পেয়েছে। আবার ক্রমে কুষান রীতির পোশাকাদির ব্যবহার কিন্তু পরিলক্ষিত হয়েছে পুরুষ পরিধেয়তেও যা নিঃসন্দেহে বাংলার সহিত বহিরাগত আদর্শের সংযোগের অন্যতম ফলশ্রুতি। অর্থাৎ ক্রমে সময়ের বিবর্তনে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে পোশাক পরিচ্ছদেও নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য এসেছে যার আভাষ পাওয়া যায় এই ফলকগুলির মধ্য দিয়ে। এছাড়া নারী পুরুষ নির্বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে পোশাক পরিধানের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সম্ভবত সমাজে ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন যাপনকে তুলে ধরে বলে অনুমান করা চলে।

চিত্র- ১৬ মৌর্য শৈলীর উত্তর ভারতীয় ধাঁচের স্কার্ট পরিহিতা নারীমূর্তি, তমলুক, সৌজন্যে- এস এস বিশ্বাস, টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল, আগম কলা প্রকাশন,দিল্লী, ১৯৮১ Plate-v(a)

পাশাপাশি একই ধারা লক্ষণীয় উপস্থাপিত অলংকারাদির ক্ষেত্রেও, মোটামুটি প্রাকমৌর্য পর্যায় থেকেই প্রায় অধিকাংশ নারী ও পুরুষ অবয়বে বিচিত্র অলংকরণ পরিলক্ষিত। যা ক্রমে সময়ের ব্যবধানে জাঁকজমকপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রূপ লাভ করেছে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে। এর মধ্যে গলার মালা, বিভিন্ন ধাঁচের কানের দুল, হাতে বালা, বাজুবন্ধ, পায়ে নূপুর, কোমরে কটিবন্ধ ,মাথায় অলংকৃত উষ্ণীষ ,মেডালিয়ন প্রভৃতি অনবদ্য। অলংকার সমূহের সূক্ষ্ম উপস্থাপনা উন্নত কারিগরি দক্ষতার দিকটিকে পরিস্ফুট করে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে অলংকারের বিশেষ উপস্থিতি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য তৎকালীন প্রেক্ষিতে অবয়বে 'কেশসজ্জা' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, মৌর্য পর্ব থেকে শুরু করে প্রায় অধিকাংশ অবয়বেই কেশবিন্যাশ লক্ষণীয়। কেশবিন্যাশের মধ্যে পাগড়ি বা উষ্ণীষের উপস্থাপনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তা সাধারণত সম্মান বা পদমর্যাদার প্রতীক যা ব্যক্তি বিশেষে, অবস্থান বিশেষে ভিন্নতর হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পোড়ামাটি শিল্পঅবয়ব সমূহেও এই উষ্ণীষের মধ্যে কিন্তু একাধিক বৈচিত্র্য বিদ্যমান। সময়ের পরিবর্তনে, পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের রুচি,পছন্দ অনুযায়ী কেশসজ্জার প্রণালী বা অলংকারও পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন সংগ্রহালয় এবং গ্রন্থাবলীর ক্যাটালগ এ উপস্থাপিত আলোচ্য পর্বের বিভিন্ন বঙ্গীয় পোড়ামাটি অবয়বগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে কখনো ত্রিপত্রাকৃতি উষ্ণীষ, কখনো গোলাকার, কখনো টুপির ন্যায় উপাদান, আবার কখনো চুলে খোপার সাথে সজ্জিত হয়েছে নানা পুঁতি, ফুল, শস্যাদি বা মুক্তোর অলংকার কিংবা শৃঙ্গযুক্ত কেশবিন্যাশ, কিংবা আবার কখনো মেডালিয়ন।(চিত্র নং-১৭,১৮) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, বিচিত্র মানুষের পছন্দ অপছন্দ বা তার অর্থনৈতিক অবস্থানেরও প্রতীক ছিল এই উষ্ণীষ বা কেশ অলংকরণের উপাদানগুলি। ফলত টেরাকোটা শিল্পীগণও তাদের মূর্তি নির্মাণে এই উপাদানটিকে অবশ্যম্ভাবী রূপে বজায় রেখেছেন। এছাড়া চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত অসংখ্য যক্ষিণী মূর্তির পায়ে চটির উপস্থাপনা লক্ষণীয়, যদিও তা আদতে হেলেনীয় প্রভাবপুষ্ট মূর্তি নির্মাণ ঐতিহ্যের প্রকাশ রূপে মনে করা হয়ে থাকে।[২০]

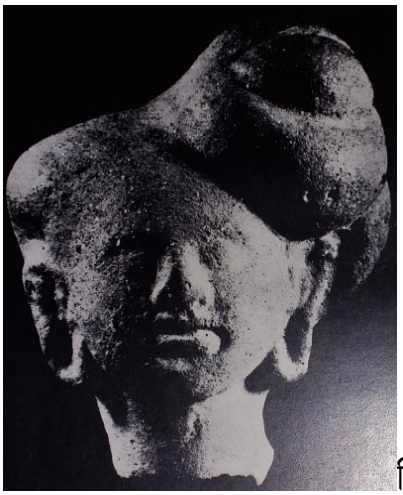

চিত্র-১৭

চিত্র-১৮

চিত্র-১৭- উল্লেখযোগ্য উষ্ণীষ সহ মুখাবয়ব, তমলুক, সৌজন্যে- এস এস বিশ্বাস, 'টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল' , আগম কলা প্রকাশনী, দিল্লি,১৯৮১ প্লেট- IV-B

চিত্র-১৮ উল্লেখযোগ্য উষ্ণীষ সহ মুখাবয়ব, চন্দ্রকেতুগড়, এনামুল হক, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেসার হাউস অফ বেঙ্গল টেরাকোটাস', স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, আই–সি-এস-বি-এ ঢাকা ২০০১ পৃষ্ঠা-১০৫

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অপর কিছু ফলক বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, যাদের সময়কাল মোটামুটি ২য়-৩য় শতক। প্রথমে উল্লেখ্য অবয়বটিই একমাত্র যেখানে দৈনন্দিন গৃহস্থালী জীবনযাত্রার কিছু দৃশ্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে একজন পুরুষ কাঁধে বাঁক নিয়ে উপস্থাপিত, অপর দিকে একজন নারী তার সম্মুখে হাতে পাত্র নিয়ে বসে রয়েছে। আবার উনুনে রন্ধনের প্রতিচ্ছবিও পরিলক্ষিত। অর্থাৎ সবমিলিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাপনের আভাষ তুলে ধরেছেন শিল্পীগণ আলোচ্য ফলকটির মধ্য দিয়ে। (চিত্র নং- ১৯) আবার অন্যত্র একটি ফলকের ভগ্নাংশে দেখা যাচ্ছে এক পুরুষ মূর্তি একটি বেদীর সম্মুখে নতজানু রূপে উপস্থাপিত। যার পরিচিতি পুরোপুরি নির্ধারিত না হলেও সম্ভবত এটি কোন ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানে লিপ্ত ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। (চিত্র নং- ২০) অর্থাৎ সমকালীন মানুষের দিনযাপনের কিছু আভাষ কিন্তু পাওয়া যেতে পারে এই ফলক দুটির মধ্য দিয়ে।

চিত্র-১৯ দৈনন্দিন জীবনচিত্র, চন্দ্রকেতুগড়, খ্রিষ্টীয় ১ম-২য় শতক, সৌজন্যে- 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২১০

চিত্র-২০ ধর্মীয় আচারাদি পালন(?) , চন্দ্রকেতুগড়, ১ম-৩য় শতক, সৌজন্যে- এলোকোয়েন্ট আর্থ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯৪

বাংলার পোড়ামাটি শিল্পের অন্যতম বিশেষত্বই হল বিপুল পরিমাণ মিথুন শিল্পরীতির উপস্থাপনা। যার সাথে মূলত উর্বরতা বা প্রজনন স্বত্তার ধারণা একাত্ম। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর সাথে সম্পর্কিত উক্ত উর্বরতা তথা আধ্যাত্মিক চেতনার দিকটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি এও ঠিক আবিষ্কৃত এই শ্রেণীর সকল ফলককে একই ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়তো কিছুটা সরলীকরণ হয়ে যেতে পারে। একটু অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাংলায় এই ধরণের ফলকগুলির সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে শুঙ্গ পর্যায় (খ্রিষ্টপূর্ব ২য়-১ম শতক) থেকে অর্থাৎ টেরাকোটা

শিল্পধারার সমৃদ্ধির পর্ব, যেসময় থেকে এই শিল্পধারা ব্যাপ্তি, প্রসার ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। যখন মানব প্রয়োজনের বাইরে নান্দনিক শিল্পকর্ম রূপে পোড়ামাটি উপাদান জনপ্রিয়তা অর্জন করছে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটেছে কালক্রমে। ফলত এই ধরণের মিথুন শৈলী সম্পন্ন উপস্থাপনারও যে এক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে বলা বাহুল্য। লক্ষ করলে দেখা যাবে মিথুন ফলকের মধ্যেও কিন্তু বিভাজন রয়েছে; চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ একাধিক বঙ্গীয় প্রত্নকেন্দ্রে এক শ্রেণীর ফলকে সুসজ্জিত আলিঙ্গনবদ্ধ নারী পুরুষের প্রেমময় মুহূর্ত ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অপর দিকে বিশেষ রূপে চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া যায় রতিক্রিয়ার বিস্তীর্ণ ভঙ্গির নিখুঁত উপস্থাপনা। উল্লেখ্য প্রথম প্রকারটির বাহ্যিক উপস্থাপনায় নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত লক্ষ করা গেলেও বা কোন উর্বরতার প্রতীক স্বরূপ কোনও ক্রিয়াকর্মের অঙ্গ রূপে অনুমান করা গেলেও দ্বিতীয় প্রকারটি নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সংশয় দেখা দিতেও পারে। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত এজাতীয় ফলক গুলিতে বহু ক্ষেত্রে মাথার উপরিভাগে ছিদ্রের উপস্থিতি পাওয়া যায় যা থেকে তাকে হয়তো অলংকরণের উদ্দেশ্যে নির্মিত বলে অনুমান করা যেতে পারে। এর দ্বারা নিজ জীবনযাত্রার সাথে কোথাও গিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছিল মানুষ। তাহলে কি প্রশ্ন করা যায় নাগরিক সমাজ বিলাস,বিনোদনের মাধ্যম রূপে এগুলির ব্যবহার করছিল? আজও শিল্পক্ষেত্রে এই জাতীয় উপস্থাপনা বিদ্যমান তথা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নানাভাবে এই মিথুন উপস্থাপনা গৃহীত ঠিকই, কিন্তু উক্ত প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও উক্ত চেতনার বিকাশ ঘটেছিল এরূপ অনুমান কি যুক্তিযুক্ত? সেই প্রশ্ন হয়তো রয়েই যায়। (চিত্র নং-২১)

চিত্র নং-২১ মিথুন দৃশ্য, চন্দ্রকেতুগড়, ১ম-৩য় খ্রিষ্টাব্দ, সৌজন্যে- এলোকোয়েন্ট আর্থ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৫

চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানের পোড়ামাটি শিল্পধারার অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ বিভিন্ন কাহিনী সম্বলিত ফলকগুলি। যেখানে দৈনন্দিন জীবনের নানান কাহিনীর পাশাপাশি কিছু অসামান্য মাইথোলজিকাল কাহিনী যথা জাতক, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ বা বিভিন্ন স্থানীয় লোককাহিনীর নানান দৃশ্যাবলী বর্ণিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয় । ক্রমে পোড়ামাটি শিল্পে তার উপস্থাপনার ফলে এতদিন যে গল্প শুধু মানুষ শুনেছিল, এই উপস্থাপনার দ্বারা তারা এক নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে শুরু করল। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তা মানুষ অতি সহজেই গ্রহনও করেছিল। সর্বোপরি এগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা প্রচারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল অর্থাৎ সামাজিক ইতিহাসের ধারায় এর অবদান যে অসামান্য তা বলাই চলে। এইরূপ বেশ কিছু ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়নপুর, তমলুক অঞ্চলে এছাড়া মহাস্থানগড়ে গুপ্তপর্বীয় অসংখ্য রামায়ণ কাহিনী সম্বলিত ফলক মেলে। যেমন চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত একটি গোলাকার ফলকে উপস্থাপিত এক মানব একটি কচ্ছপ ধরে আছেন , যা সম্ভবত **'কচ্ছপ জাতক'** এর দৃশ্য বলে মনে করা হয়। (চিত্র নং-২২) আবার বেশ কিছু ফলকে দেখা যায় এক দৈত্য এক নারী মূর্তিকে তার হাতে করে বহন করছে, (চিত্র-২৩) কেউ কেউ একে রাবন কর্তৃক সীতার অপহরণের দৃশ্যের উপস্থাপনা কিনা সেই উল্লেখ করেছেন। যার উপস্থাপনা মেলে কৌশাম্বীতেও।[২১] আবার মহাস্থান দূর্গাঞ্চলের নিকটবর্তী একটি ঢিবি পলাশবাড়ি থেকে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কাল যথা গুপ্ত পর্বীয় (আনুমানিক ৪র্থ-৫ম খ্রিষ্টাব্দ) বেশ কিছু ফলক পাওয়া যায় যেখানে রামায়নের আদিকান্ড ও অযোধ্যাকান্ডের প্রায় সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণিত বিস্তীর্ণ ফলকের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেগুলি প্রতিটি ব্রাহ্মী লিপি সম্বলিত, ফলে উক্ত অঞ্চলে রামায়ণ কাহিনীর জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় আলোচ্য উপাদান থেকে।[২২] (চিত্র নং- ২৪) এছাড়াও এইরূপ একাধিক গল্পকাহিনী উঠে এসেছে পোড়ামাটি শিল্পীদের হাত ধরে, জায়গা করে নিয়েছে সাধারন মানুষের ঘরে ঘরে শিল্প ইতিহাসচর্চায় যাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

চিত্র-২২ কাহিনী সম্বলিত ফলক (কচ্ছপ জাতক?), চন্দ্রকেতুগড়, খ্রিষ্টীয় ১ম-৩য় শতক, সৌজন্যে- 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৭

চিত্র-২৩ দানব কর্তৃক নারী অপহরন দৃশ্য, চন্দ্রকেতুগড়, খ্রিষ্টীয় ১ম-৩য় শতক, সৌজন্যে- এলোকোয়েন্ট আর্থ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২১৫

চিত্র-২৪ রামায়ণ অবলম্বনে দশরথের মৃত্যুদৃশ্য, পলাশবাড়ি, মহাস্থানগড়, আনুমানিক ৪র্থ – ৫ম খ্রিষ্টাব্দ, সৌজন্যে, আর্কিওলজিকাল ইনভেস্টিগেশন ইন বোগড়া ডিসট্রিক্ট , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৩

এছাড়া সর্বোপরি যাদের কথা না বললে এই সমগ্র আলোচনাটিই অসম্পূর্ণ থেকে যায় তারা হলেন বিপুল শিল্পী সম্প্রদায়। বাংলায় প্রাপ্ত এই বিপুল টেরাকোটা সামগ্রী নিঃসন্দেহে সমাজে সুদক্ষ মৃৎশিল্পীদের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে, যারা এই আলোচ্য পোড়ামাটি শিল্পধারাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে নিজ দক্ষতায়। কিন্তু এই শিল্পীদের সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে এনামুল হক চন্দ্রকেতুগড়ের টেরাকোটা সংক্রান্ত আলোচনায় উক্ত শিল্পী বা কারিগরদের সম্পর্কে কিছু আভাষ দিয়েছেন। তৎকালীন পোড়ামাটির শিল্পের সঙ্গে জড়িত পেশাজীবি সম্প্রদায় সম্পর্কে উল্লেখ করেন, শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত এসকল মানুষ সমাজে পুরোহিত বা বণিক সম্প্রদায়ের ন্যায় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন শ্রেণীভুক্ত ছিলনা ঠিকই কিন্তু সমকালীন সামাজিক নানান খুঁটিনাটি ও বাস্তবিক দিকগুলির অনুধাবনে তারা অত্যন্ত দক্ষ ও সচেতন ছিলেন যা তাদের কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হত, যার দ্বারা তারা সমাজে বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পানিণি ও জাতকের তত্ত্বের উল্লেখ করে শিল্পীদের মধ্যেকার বিভাজন গত দিকের প্রতিও ইঙ্গিত দেন; কিছু সমৃদ্ধ উপাদানের প্রেক্ষিতে রাজকুম্ভকারের উপস্থিতির সম্ভাবনার কথা বলেন। এই শ্রেণীর শিল্পীরা সাধারণ বাজারের জন্য নয় বরং কিছু নির্দিষ্ট পৃষ্ঠপোষক যথা রাজপরিবার বা কোন শ্রেষ্ঠী পরিবারের স্বার্থে কাজ করতেন। ফলে তাদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল তুলনামূলক ভাবে অধিক। তিনি আরও বলেন শিল্পীরা ছিল স্বাধীন, সমকালীন রীতি প্রযুক্তি বা পরিস্থিতির ভিত্তিতে বিভিন্ন অবয়বগুলিকে নিজের মত করে বর্ণনা করতেন। উক্ত পরিস্থিতিতে টেরাকোটা কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণীর জীবন ধারনের

মাধ্যম ছিল তা নয় মৌর্য আমলে তা রীতিমত উচ্চ দামে বিক্রয় হত যা রাজকোষের সমৃদ্ধিকরণের অন্যতম মাধ্যম ছিল। পানিণির সূত্র ও পতঞ্জলির রচনায় এই জাতীয় ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৩] তার এই বক্তব্য দ্বারা তৎকালীন বঙ্গীয় টেরাকোটা শিল্প ও শিল্পীদের সামাজিক গুরুত্ব সংক্রান্ত কিছু ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয় বলা বাহুল্য।

তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উক্ত প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সমাজে উৎপাদিত এজাতীয় সকল উপাদানই খুব সচেতন ভাবে শিল্প উপাদান ছিল বা শিল্পীরা প্রথম থেকেই নিজেদের শিল্পী মনে করত এমনটা নয়। ঐতিহাসিক আর এন মিশ্র প্রাচীন ভারতের শিল্পীদের অবস্থান সম্পর্কিত বিস্তীর্ণ আলোচনার প্রারম্ভেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, প্রাথমিক পর্বে সমাজে 'শিল্পী' রূপে কোন আলাদা প্রতিষ্ঠান ছিলনা। বরং সাধারণ কারিগর হিসেবে তাঁদের অবস্থান ছিল যারা একাধিক কারিগরি কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পর্কিত ছিল।[২৪] বর্তমানে যাকে 'শিল্প' রূপে আখ্যা দেওয়া হয়, বা 'সৃজনশীলতা', 'নান্দনিকতা' এগুলি সূচনাপর্বে ছিল বহুলাংশে প্রয়োজনভিত্তিক। বিভিন্ন পোড়ামাটির উপাদানগুলি নিজস্ব চাহিদা পূরণের জন্য প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্মীয় চিন্তাভাবনা রীতিনীতি প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট সমাজের উৎপাদিত দ্রব্য। সেগুলি যেমন উপাস্য দেবতা বা উপাসনার সামগ্রী, শিশুদের খেলনা, গৃহস্থালি বা অলংকরণের কাজে ব্যবহৃত হত তেমনই পাশাপাশি পোড়ামাটির সীল তৈরি হত নানান নথীপত্রাদি সংরক্ষনের মাধ্যম হিসেবে; যেগুলি একাধারে ক্ষোদকের (Engraver) শৈল্পিক দক্ষতার দিকটিকেও প্রকাশিত করে। আবার সাধারণ মানুষ তার নিজ সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে টেরাকোটার অলঙ্কারাদি ব্যবহার করে এসেছে সুদূর অতীত থেকে যা আজও বিদ্যমান।[২৫] অর্থাৎ নিজ চাহিদা, বিশ্বাস, সামাজিক প্রয়োজনে তারা যাবতীয় শিল্প অবয়ব গড়ে তুলছে কিন্তু পাশাপাশি তাতে নিজেদের নান্দনিক চিন্তাভাবনার সংমিশ্রণও ঘটিয়েছে যার ফলস্বরূপ ক্রমে সময়ের ব্যবধানে উক্ত ধারায় এসেছে নিত্যনতুন রীতি-পদ্ধতি, বিকাশ ঘটেছে শিল্পধারার। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে কারিগর ক্রমে শিল্পীর ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছে- তার শিল্পজ্ঞান বা সৃজনশীল চেতনার বিকাশ ঘটেছে এবং সামাজিক নিশ্চয়তা লাভ করায় গনউৎপাদন এর প্রসার ঘটেছে ব্যাপক রূপে। তার সাক্ষী রূপে দণ্ডায়মান দেশের বিভিন্ন সমৃদ্ধ প্রত্নস্থল ও সেখানে আবিষ্কৃত অসংখ্য পোড়ামাটি শিল্পসামগ্রী যা আজ শিল্প ইতিহাসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ন অধ্যায় তথা সমকালীন সমাজ সংস্কৃতির অনুধাবনের ক্ষেত্রে এক অসামান্য উপাদান সন্দেহ নেই। দেবাঙ্গনা দেশাই সাতবাহন পর্বে দক্ষিণ ভারতে নাসিকের গুহায় মৃৎশিল্পীদের গিল্ডের উল্লেখ সম্বলিত এক শিলালেখর উল্লেখ করেছেন যেখানে উক্ত গিল্ড কর্তৃক বৌদ্ধমঠের সমৃদ্ধিকল্পে আর্থিক বিনিয়োগের উপস্থাপনা রয়েছে যা নিঃসন্দেহে সমকালীন ভারতীয় মৃৎকারিগরদের বিপুল আর্থ-সামাজিক

সমৃদ্ধির পরিচায়ক।[২৬] এছাড়াও পোড়ামাটি শিল্প ব্যতীত বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত অন্যান্য অসংখ্য প্রত্নদ্রব্যাদি থেকে প্রাচীন বঙ্গীয় সমাজে আরও একাধিক শিল্প ও কারিগরি জনিত কর্মকাণ্ডের উপস্থিতি অনুমান করা সম্ভব। যার মধ্যে চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ বাংলার বেশ কিছু প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত বিভিন্ন আকৃতি ও বৈচিত্র্যের কারুকার্যমণ্ডিত মৃৎপাত্র, হাতির দাঁতের শিল্প, কাঠের স্থাপত্যাংশ, শঙ্খ ও হাড়ের উপকরণ প্রভৃতি অন্যতম।

অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে এসে বলা যায়, আনুমানিক ২য় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২য়-৩য় শতাব্দী পর্যন্ত সময়কাল তথা আদি ঐতিহাসিক পর্যায় বাংলার টেরাকোটা শিল্প ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। অধ্যায়ের প্রারম্ভেই উল্লিখিত এই বিপুল টেরাকোটা শিল্প সামগ্রীর মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ সংস্কৃতির অনুধাবন বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু। যেকোনো কালপর্বের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার বস্তু উপাদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলত প্রাচীন বাংলার ক্ষেত্রেও তার পুরাদ্রব্যের ভূমিকা অসামান্য, কেননা এগুলি সমকালীন মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। তারা তাদের নিজের প্রয়োজনে, সমাজের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত দ্রব্যাদি তৈরি বা ব্যবহার করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দেখা গেছে পোড়ামাটি ফলকগুলি তৎকালীন মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস বা ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও তৎসম্পর্কিত বিবিধ অবয়বের আভাষ যেমন দেয়; তেমনই এই শিল্পের এক সামাজিক প্রেক্ষিতও কিন্তু বিদ্যমান। যার থেকে সমকালীন সমাজের একাধিক চিত্রের আভাষ পাওয়া যায়। তেমনই সাধারণ মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা, পরিবেশ, পশু-পাখি, কৃষি-বাণিজ্য-শিল্প তথা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিনোদন মাধ্যম, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিবিধ দিক কিন্তু প্রকাশিত এই ফলক গুলির মধ্য দিয়ে দিয়ে যা শিল্পীদের রুচিবোধ, প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান, সর্বোপরি শিল্প সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ ও অভিজ্ঞতার দিকটিকে উপস্থাপিত করে। কোন সময়ের নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থা বা অর্থনীতিকে বুঝতে হলে তার কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সমাজ সংগঠন, পরিবহণ বা সংযোগ মাধ্যম, দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে অনুধাবন আবশ্যক যার বিস্তীর্ণ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে বাংলার এই শিল্প মাধ্যম। আদি ঐতিহাসিক পর্বের বাংলার লিখিত উপাদানের যে অনুপস্থিতি তার ঘাটতি পূরণে এর অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ রূপে শুঙ্গ- কুষান পর্যায়ে সামগ্রীক আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি সাধারণ মানুষের রুচি, চাহিদায় প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে যার ফলে পূর্ববর্তী ধর্মীয় অবয়বের পাশাপাশি 'শিল্প' অবয়ব রূপে টেরাকোটার বিকাশ ঘটতে থাকে বলে মনে করা হয়। যার ফলে প্রযুক্তি, কলাকৌশলের পাশাপাশি উপস্থাপিত বিষয় বস্তুতেও

নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য আসে বলে মনে করা হয় যারই ফলশ্রুতিতে উক্ত উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সমকালীন মানুষের জীবনযাপনের বেশ কিছু দিক প্রকাশিত হয় বলে মনে করা যেতে পারে।

এপ্রসঙ্গে দেবাঙ্গনা দেশাই[২৭] এর বক্তব্য উল্লেখ করা চলে, যিনি সর্বদা এই শিল্পের বিকাশকে সামাজিক চাহিদা, বাজারীকরণ ও নগরায়নের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী বৃহৎ মাত্রার টেরাকোটা উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের দিকটি মাথায় রাখা একান্ত প্রয়োজন কেননা সমাজে তার চাহিদা থাকলে তবেই এইরূপ উৎপাদন সম্ভব। সেটি যেকোনো কিছু হতে পারে অর্থাৎ ধর্মীয় উপকরণ হোক কিংবা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা, এবং তা যথার্থ রূপে বিকশিত হয় নাগরিক পরিমন্ডলে কেননা সেক্ষেত্রে অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বাজারের উপস্থিতি যা যেকোনো শিল্প বা বাণিজ্য বিকাশের অন্যতম আবশ্যিক শর্ত। ফলে টেরাকোটা শিল্পের সমৃদ্ধি বা বিকাশ মূলত নগরের উত্থান ও বিকাশের সহিত সম্পর্কিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। প্রাথমিক পর্বে যে টেরাকোটা মাতৃকামূর্তিগুলি তা অতীব সাধারন অলংকরণ যুক্ত ও হাতে নির্মিত যার কারন রূপে দেশাই দেখান এগুলি নগর সভ্যতার একদম প্রাথমিক পর্বের উপাদান, ফলস্বরূপ সাংস্কৃতিক জীবনে তার প্রভাব অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু পরবর্তীতে টেরাকোটা অবয়বগুলিতে নাগরিক রুচির প্রভাব সুস্পষ্ট, উক্ত নারীমূর্তি গুলিতে উপস্থাপিত যাকজমকপূর্ন অলংকার বা অপূর্ব দৈহিক ভঙ্গিমার উপস্থিতি তার নাগরিক চরিত্রের পরিচায়ক। নগরের সমৃদ্ধ অভিজাতদের পছন্দ-অপছন্দের নমুনা ফলকে উপস্থাপিত বিচিত্র বিষয়াদি যথা- পশুশিকার, মিথুন দৃশ্য, নানান নৃত্যগীত তথা বিনোদন দৃশ্য, সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত দৃশ্যাবলী প্রভৃতি আরও নানাবিধ দৃশ্যাবলী। অর্থাৎ তিনি আলোচ্য পর্বের পোড়ামাটি শিল্পধারার বিকাশকে মূলত নাগরিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ বলে উপস্থাপিত করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সাম্প্রতিক সোনালিকা কল[২৮] তার সম্পাদিত ‘কালচারাল হিস্ট্রি অফ আর্লি সাউথ এশিয়া’ গ্রন্থের সূচনায় দেবাঙ্গনা দেশাই এর এই বক্তব্য সম্পর্কে কিছু মত প্রকাশ করেছেন। এরূপে দীর্ঘপর্যায়ে বিকশিত টেরাকোটা শিল্পে যেখানে বিশেষরূপে সমকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের সার্বিক বিশ্বাস, ধর্মচিন্তা, রীতিনীতি বৃহৎ মাত্রায় সম্পৃক্ত তাকে নির্দিষ্ট রূপে ‘নাগরিক’ চরিত্রসম্পন্ন রূপে আখ্যায়িত করার বিরোধিতা করেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, কিরূপে এজাতীয় অবয়বকে ‘নাগরিক’ বা ‘গ্রামীণ’ চরিত্র সম্পন্ন বলে বিভাজিত করা সম্ভব? শুধুমাত্র অবয়বের শৈলীগত চাকচিক্যই কি তার নাগরিক চরিত্র নির্ধারণে যথেষ্ট? প্রকৃতই তার এই বক্তব্য ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলা যেতে পারে। কেননা যেকোনো অবয়বে বাহ্যিক সবকিছুর উর্ধ্বে

বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল তার অন্তর্নিহিত চেতনা বা উদ্দেশ্য যার বিশ্লেষণ আবশ্যক। যেমন বলা চলে- একটি উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন, অলংকৃত, সূক্ষ্ম আঙ্গিক বা বাহ্যিক চাকচিক্য সম্বলিত তথা সার্বিক সমৃদ্ধ মিথুন ফলক বা কৃষি সম্পর্কিত পোড়ামাটি ফলক শহুরে নাগরিক শ্রেণীর নিকট যেমন শুভ হতে পারে তেমনই গ্রামীন সাধারণ মানুষের নিকটও নিঃসন্দেহে শুভ বা মঙ্গলজনক রূপেই প্রতিভাত, ফলত তার চরিত্রকে এভাবে নির্দিষ্ট রূপে সংজ্ঞায়িত করার দিকটি বহুলাংশে দ্বিধান্বিত।

যাইহোক, আলোচ্য এই পোড়ামাটি শিল্পের একাংশে সমকালীন সমাজ চিত্রের আভাষ রয়েছে ঠিকই কিন্তু অবশ্যই মনে রাখা দরকার আলোচ্য বিষয়টি কিন্তু কিছুটা দ্বিধান্বিতও বটে। হয়তো প্রশ্ন করাই যায় যে উপস্থাপিত এসকল উপাদান যথা পোশাক ,অলংকারাদি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয় পোড়ামাটি শিল্পে তার বাস্তবিক ভিত্তি কতটুকু ছিল? উল্লেখ্য, এই সকল টেরাকোটা অবয়বের ভিত্তিতে কিন্তু আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে পারিনা সকল উপস্থাপিত পরিধেয়, অলংকরণ বা অন্যান্য অভিব্যক্তি আদতে সমাজে সর্বস্তরের মানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। কেননা মনে রাখা দরকার বাংলার অন্যান্য কেন্দ্র সহ চন্দ্রকেতুগড় বা মহাস্থানগড়ের ন্যায় বৃহৎ অঞ্চলেও কিন্তু প্রাপ্ত অলংকৃত সুসজ্জিত টেরাকোটা নারী- পুরুষ অবয়বের অধিকাংশই কোন না কোন ভাবে ধর্মীয় আচারাদি বা উক্ত বিশ্বাসের ভাবধারা বহনকারী রূপে প্রতীকায়িত। যেমন – বিভিন্ন 'যক্ষ- যক্ষী' অবয়ব বা দেব-দেবী রূপে পরিগণিত অবয়বগুলিই মূলত সংখ্যাগত ভাবে অধিক। সুতরাং তাদের ওপর আরোপিত পোশাক বা সাজসজ্জা সমভাবে সমাজের সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও গ্রহণীয় ছিল কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থাকতে পারে। পাশাপাশি অন্যান্য অন্যান্য যে অবয়ব অর্থাৎ নৃত্য-গীত, কৃষি, শিকারের ন্যায় উপস্থাপনা সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে সমাজে তার উপস্থিতির ইঙ্গিত দিলেও তার পশ্চাতে নিহিত উদ্দেশ্য বা ফলকগুলির চরিত্র কি ছিল সেটি প্রধান বিবেচ্য বলা চলে। আদতে সমাজ, ধর্ম শিল্প কিন্তু একই সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং সামাজিক প্রেক্ষিত রয়েছে বলে তাকে মানুষের বিশ্বাস বা আস্থার জায়গা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে 'ধর্মনিরপেক্ষ নান্দনিক শিল্প' অবয়বের আখ্যা দেওয়া সম্ভব কিনা সেটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষিত।

সর্বশেষে আরেকটি প্রসঙ্গের উপস্থাপনা করা চলে, যেহেতু বর্তমান অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় পোড়ামাটি শিল্পধারার সহিত সম্পৃক্ত সামাজিক চরিত্রের বিশ্লেষণ, ফলত এক্ষেত্রে অপর একটি অবশ্য উল্লেখ্য দিক হল, বহুক্ষেত্রে খুব সহজ ভাবে একে লোকশিল্প বা প্রান্তীয় শিল্প রূপে গন্য করা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষও অনেক সময় পোড়ামাটি শিল্প বা মৃৎশিল্প মানেই কোনোরূপ

চিন্তা না করে তাকে লোকশিল্প রূপে বা সমাজের মূল স্রোতের শিল্পধারার বাইরে টেরাকোটার অবস্থান নির্ধারন করে থাকেন। কিন্তু এখানে অবশ্যই প্রশ্ন আসে সত্যই কি তাই ? যে শিল্প উপদান তৈরি হচ্ছে তার পশ্চাতে তার সমাজ অর্থাৎ কোন সমাজে কাদের উদ্দেশ্যে সেগুলি তৈরি হয়েছে তা মাথায় রাখা আবশ্যক। চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় বা বাংলার প্রাপ্ত পোড়ামাটি অবয়বগুলি নিঃসন্দেহে সমাজের সাধারণ মানুষদের দ্বারা স্বল্পব্যায়ে সহজ উপায়ে নির্মিত, এবং সেখানে তাদের উপস্থাপনেও বহুলাংশে শিল্পী লোকায়ত জীবন থেকে রস আস্বাদন করে থাকেন যার ফল স্বরূপ সমাজের অতি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ইতিহাস, ধর্মবিশ্বাস রীতিনীতি প্রতিফলিত হয় এই শিল্পের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শিল্পের উপাদান লোকায়ত হলেও তার মাধ্যম বা চরিত্রও যে লোকায়ত হবে কিংবা প্রান্তীয় স্তরের শিল্প রূপে গন্য করা হবে এমনটা কখনই নয়,কেননা লোকায়ত উপাদান থাকলেও অধিকাংশই তা পরিশীলিত হয় নাগরিক অভিজাতদের দ্বারা। অর্থাৎ এই শিল্পের সাথে সংযুক্ত শিল্পীদের জীবনধারণ বা শিল্পক্ষেত্রে অধিক সমৃদ্ধি বা উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিনব প্রযুক্তি পদ্ধতির প্রয়োগ প্রভৃতি কারণে বিপুল অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। যা আসত নগরের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় যথা শাসক, জমিদার, বা বণিক প্রভৃতি শ্রেণীর নিকট থেকে অর্থাৎ নাগরিক অর্থনীতির সহিত ভীষণ ভাবে সম্পর্কিত ছিল এই শিল্প। এছাড়া ইতিপূর্বে বাংলার টেরাকোটা শিল্পধারার বিশ্লেষণে স্পষ্ট, সেক্ষেত্রে উপস্থাপিত বিষয়াদি নিঃসন্দেহেই কেবল গ্রামীণ সমাজে আবদ্ধ ছিলনা।

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[২৯] খুব স্পষ্টতই ব্যাখ্যা করেছেন, ‘গ্রামীণ লোকশিল্পী বা স্বভাব শিল্পী যখন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তথাকথিত উচ্চ স্তরের বা উচ্চ কোটির মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতায় কোন বিশিষ্ট প্রযুক্তি ও শৈলীতে শিক্ষিত হয়ে তাঁদের বা সাধারনের প্রয়োজনে যে শিল্প সৃষ্টি করেন বা মধ্যযুগ অবধি করেছিলেন তাকে সমাজের তথাকথিত “উচ্চ-কোটির” পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট ও পুষ্ট “উচ্চ” মার্গের শিল্প কর্মের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।’ একই শিল্পী লোকশিল্পের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ মার্গের শিল্পের সৃষ্টিকর্তা রূপে পরিচিতি লাভ করতে পারে উপযুক্ত আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ পেলে। অর্থাৎ তার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা চলে, যে আঞ্চলিক পরিসরে শিল্পধারার বিকাশ ঘটছে তার সামগ্রীক অবস্থান তথা শিল্প গড়ে ওঠার পশ্চাতে যে আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট বিদ্যমান থাকে সেটি অনুধাবন অত্যন্ত জরুরী, তার ওপর নির্ভর করে শিল্পের চরিত্র কিরূপ হবে। সেই অনুসারে বাংলার ন্যায় উর্বর মৃত্তিকা সমৃদ্ধ অঞ্চল যেখানে প্রস্তর অপ্রতুলতার দরুন আদি ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক যুগ তো বটেই এমনকি গুপ্ত পর্বের শেষ ভাগ এবং পাল শাসন থেকে প্রস্তর শিল্পের বিকাশ স্বত্তেও মধ্যযুগের শেষ ভাগেও বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ

শিল্পমাধ্যম ছিল মৃত্তিকা তথা পোড়ামাটি শিল্পধারা। পাশাপাশি চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলের যে বিপুল বাণিজ্যিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় এবং টেরাকোটা শিল্পধারায় যে বিপুল বৈদেশিক শৈলীর প্রভাব ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয় সে সকল প্রেক্ষিত থেকে এই শিল্পকে নিছকই লোকশিল্প বলা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা তা প্রকৃতই প্রশ্নের উদ্রেক করে।

তথ্যসূত্র

১) কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, 'টেরাকোটা অবজেক্টস ইন আর্কিওলজিঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি' , গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত - 'আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া , নিউ পার্সপেক্টিভস '', সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, কলকাতা – ২০০২ পৃষ্ঠা- ৩৭৯-৩৮৮

২) অরুন্ধতী ব্যানার্জী, ''ইমেজ, অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড মোটিফস, স্টাডিস ইন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড নিউমিসমেটিকস্'', খন্ড-১, সন্দীপ প্রকাশন, দিল্লী ,১৯৯৩ প্রথম মুদ্রণ, পৃষ্ঠা- ৮২

৩) গৌরীশঙ্কর দে শুভ্রদীপ দে ,– 'চন্দ্রকেতুগড় আ লস্ট সিভিলাইজেশন-, আর্ট এন্ড আর্ট মোটিফ'(ভলিউম ১)২০০৪ ,কলকাতা ,সাগ্নিক বুকস , পৃষ্ঠা-১৬-১৭

৪) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল , কলকাতাঃ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম , ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৩৪৯

৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬০

৬) এস এস বিশ্বাস , 'টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল' , আগম কলা প্রকাশনী, দিল্লি,১৯৮১ , পৃষ্ঠা – ১৭৯-১৮১

৭) গৌরীশঙ্কর দে শুভ্রদীপ দে , – ‘চন্দ্রকেতুগড় আ লস্ট সিভিলাইজেশন’ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৬৯-৭৪

৮) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩৫

৯) তদেব, পৃষ্ঠা-২১৯-২৬৮

১০) অশোক কুমার ভট্টাচার্য, ‘টেরাকোটাস্ অফ বেঙ্গল’, শুঙ্গ কুষান পিরিয়ড - প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত, “ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড”, মার্গ পাবলিকেশন, খণ্ড- ৫৪, নং- ১, ২০০২ পৃষ্ঠা – ৬৯

১১) তদেব, পৃষ্ঠা- ৭০

১২) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৪

১৩) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম “উচ্চ” মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৩৯

১৪) অরুন্ধতী ব্যানার্জী, “ইমেজ, অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড মোটিফস, স্টাডিস ইন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড নিউমিসমেটিকস্”, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৮২-৮৪

১৫) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ‘নিউ এপিগ্রাফিক অ্যান্ড পেলিওগ্রাফিক ডিসকভারিস’ , “প্রত্নসমীক্ষা”- ১ম খন্ড, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি , গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা,১৯৯২ পৃষ্ঠা- ১৩৫-১৫৪

১৬) গৌরীশঙ্কর দে ও শুভ্রদ্বীপ দে– ‘চন্দ্রকেতুগড় আ লস্ট সিভিলাইজেশন-, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ৪৮

১৭) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘এলোকোয়েন্ট আর্থ’, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৩৮

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ২১২

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৪-৩৪২

২০) এস এস বিশ্বাস , ‘টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল’ , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – ১১৩-১৩৪

২১) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ' প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ২১৫

২২) আফরোজ আকমাম – 'মহাস্থান', বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ঢাকা ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৮৪

২৩) এনামুল হক, স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরাকোটাস, আই সি এস বি এ, ঢাকা ২০০১ পৃষ্ঠা- ৭৯-৮০

২৪) আর এন মিশ্র, 'এনসিয়েন্ট আর্টিষ্ট অ্যান্ড আর্ট-অ্যাক্টিভিটি', ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডি, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-১

২৫) সরসী কুমার সরস্বতী , আর্লি স্কাল্পচার অফ বেঙ্গল, সম্বোহী পাবলিকেশন, কলকাতা,১৯৬২ পৃষ্ঠা- ৯৩

২৬) দেবাঙ্গনা দেশাই, ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস ইন দেয়ার সোশ্যাল কন্টেক্সট (সি. ৬০০ বিসিই – সি ই ৬০০)', ইন "আর্ট অ্যান্ড আইকনঃ এসেস অন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট", আরিয়ান বুকস ইন্টারন্যাশনাল , ২০১৩ পৃষ্ঠা- ৬৪

২৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫০-৬০

২৮) সোনালিকা কল সম্পাদিত, 'কালচারাল হিস্ট্রি অফ আর্লি সাউথ এশিয়া', ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড,২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৩

২৯) ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, লোকশিল্প বনাম "উচ্চ" মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩

উপসংহার

বঙ্গীয় মৃৎশিল্প তথা আদি ঐতিহাসিক পর্ব (আনুমানিক তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দ) জুড়ে বাংলায় বিকশিত সমৃদ্ধ পোড়ামাটি শিল্পধারার বিস্তীর্ণ চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে গবেষণা পত্রটির অদ্যাবধি আলোচনা সূত্রে। যার ভিত্তিতে দেখা গেছে এক বিপুল যুগ পরিবর্তন তথা আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সাক্ষী বাংলার এই টেরাকোটা শিল্প ঐতিহ্য। সেখানে যেমন প্রাক মৌর্য সংস্কৃতির উপাদান মেলে তেমনই মৌর্য, শুঙ্গ, কুষান বা ক্ষেত্র বিশেষে গুপ্ত শৈলীর প্রতিফলনও পরিলক্ষিত হয়। সময়ের প্রেক্ষিতে ভিন্ন প্রযুক্তি, কলাকৌশল, বিষয়বস্তু তথা চারিত্রিক বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটেছে বঙ্গীয় শিল্পক্ষেত্রে যা শিল্পইতিহাস ইতিহাস চর্চার ধারায় বাংলাকে এক বিশেষ স্থান প্রদান করে। এরই পাশাপাশি এসকল উপাদানের সাথে সম্পৃক্ত বিচিত্র প্রেক্ষিত আদি ঐতিহাসিক বাংলা কেন্দ্রিক একাধিক ভিন্ন ক্ষেত্রের ইতিহাস চর্চার সম্ভাবনাকেও যে প্রসারিত করে বলা বাহুল্য।

দেখা গেছে আলোচ্য পর্বে পোড়ামাটি সমৃদ্ধ বঙ্গীয় কেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলটি। উক্ত সময়ে দাঁড়িয়ে **চন্দ্রকেতুগড়** যেমন বাংলার বাণিজ্যিক বিকাশে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনই অপরদিকে বাণিজ্য নগরীর পাশাপাশি রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে সমৃদ্ধ কেন্দ্রেরও বিকাশ ঘটে উক্ত পর্বে বাংলায় যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অধুনা বাংলাদেশের **মহাস্থানগড়** অঞ্চলটি। এখান থেকেও গাঙ্গেয় উপত্যকার ন্যায় সমৃদ্ধ পোড়ামাটি শিল্পের নিদর্শন বা অন্যান্য প্রত্নদ্রব্যের প্রাপ্তি একে ইতিহাসে বিশেষ স্থান প্রদান করে। উল্লেখ্য শুধু এই ২টি অঞ্চলই কিন্তু নয়, সমগ্র আলোচনার ভিত্তিতে দেখা গেছে- সমগ্র নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে তমলুক, হরিনারায়নপুর, মঙ্গলকোট, বোড়াল, আটঘড়া, তিলপি, ধোসা, পান্না, বাহিরি, তিলদা, পোখন্না[১] প্রভৃতির ন্যায় আরও অসংখ্য প্রত্নস্থলের উপস্থিতি পাই যেখানে অসাধারন শিল্পসাক্ষ্যের তথা টেরাকোটা উপাদানের সন্ধান মেলে। যা দীর্ঘ আদি ঐতিহাসিক পর্ব জুড়ে সামগ্রীক রূপে বাংলার টেরাকোটা শিল্প চর্চার অনুধাবন তথা সমকালীন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও তার ক্রমবিবর্তনের নানাবিধ দিককে প্রতিফলিত করে।

আমরা জানি আনুমানিক তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে বঙ্গীয় উপত্যকায় ক্রমে স্থায়ী বসতি, কৃষিকার্যের বিস্তারের পাশাপাশি কারিগরী কর্মকান্ড, প্রযুক্তিগত উন্নতি, সক্রিয় ব্যবসা-বাণিজ্যের

সূচনা তথা ক্রমে নগরায়নের সূত্রপাত হয় অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি নানান ক্ষেত্রে এক উত্তরণের সূচনা হয় যা বাংলার ইতিহাসকে নতুন পথে পরিচালিত করে, নতুন চিন্তাভাবনা ও মননশীলতার জন্ম দেয় এবং একাধারে সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের অংশ করে তোলে। বলা বাহুল্য এইরূপ সার্বিক সমৃদ্ধিই যে আদি ঐতিহাসিক বাংলার বিপুল মৃৎশিল্প বিকাশের প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলত খুব স্বাভাবিক শিল্পী বা কারিগরদের অসীম কর্মদক্ষতায় বিকশিত এই শিল্পধারা উক্ত সমাজব্যবস্থা, সময়কাল তথা ইতিহাসের সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

সাধারণত দেখা গেছে চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ অন্যান্য বিভিন্ন আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় প্রত্নস্থল জুড়ে সূক্ষ্ম তারতম্যে প্রায় সমজাতীয় পোড়ামাটির অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায়। যা অবশ্যই সমগ্র বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে বলা বাহুল্য। সার্বিক রূপে আলোচ্য পর্ব জুড়ে বঙ্গীয় ক্ষেত্রে দুই ধরণের পোড়ামাটি অবয়বের উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়- প্রথমত, যেগুলি ধর্মীয় অবয়ব রূপে নির্ধারিত যথা বিভিন্ন প্রতীকী সম্বলিত নারী ও পুরুষ অবয়ব এবং দ্বিতীয়ত যেগুলির মধ্যে সামাজিক জীবনযাত্রার প্রতিফলন রয়েছে বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। সুতরাং আপাতভাবে একাধারে সমকালীন সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার আভাষ প্রদানে যে এগুলি সক্ষম বলা বাহুল্য। কিন্তু প্রতিটি টেরাকোটা অবয়ব তার নিজস্ব ভঙ্গীতে অনন্য; তার সহিত সম্পৃক্ত ভিন্ন প্রতীক, আদর্শ বা দর্শনের পৃথক ভূমিকা রয়েছে যা এই শিল্পের চরিত্রায়ন, উদ্দেশ্য ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষিত। গবেষণা পত্রটির সামগ্রীক আলোচনা থেকে এই আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্প সম্পর্কে একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষিতের আভাষ পাওয়া যায়, বা কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সামগ্রীক আলোচনার কিছু সংক্ষিপ্তায়নের সহিত উক্ত চিন্তাধারা বা সিদ্ধান্ত সমূহকে বর্তমান অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রয়াস করা যেতে পারে।

বিশেষ উল্লেখ্য, আলোচ্য শিল্পক্ষেত্রে মানুষের চিন্তন, বিশ্বাস, লক্ষণ এক আলাদা ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যা মূলগতভাবে প্রতিষ্ঠিত ধর্মদর্শনের বাইরে সমাজের খুব সাধারণ লোকায়ত স্তরের রীতিনীতি, ঐতিহ্য, আদর্শের প্রতিফলন বলে মনে করা যেতে পারে। প্রাপ্ত পোড়ামাটি অবয়ব সমূহের মধ্যে প্রাথমিক পর্বের হাতে গড়া অলংকরণ বর্জিত 'মাতৃ অবয়ব' সমূহের ভূমিকা অসামান্য। একাধিক ভঙ্গীতে যাদের উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় সমগ্র ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রে। দেখা যায় বর্তমান সময়পর্বেও এক শ্রেণীর পোড়ামাটি অবয়বের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের প্রকৃতি বা ব্যবহার আমাদের সহস্র বছর পেছনে ফিরে যেতে বাধ্য করে। বর্তমানে বিভিন্ন ব্রত, লোকায়ত ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদিতে ব্যবহৃত নিরলংকার, জাঁকজমক বিহীন হাতে গড়া ছোট ছোট

নারী ও বিশেষত পশুপক্ষীর অবয়বগুলি বিশেষ তাৎপর্য। যাদের কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় সীমানা নেই, সকল প্রচলিত সম্প্রদায়ের মানুষই নিজ আকাঙ্ক্ষা পূরণে বিভিন্ন রীতিনীতিতে এই শ্রেণীর অবয়বের ব্যবহার করে থাকে। ইতিহাসের ধারায় এই জাতীয় অবয়বের তাৎপর্য অপরিসীম, কেননা সামগ্রীক আলোচনার ভিত্তিতে দেখেছি মানব সভ্যতার একদম প্রাথমিক পর্বের শিল্পধারার সূচনা কিন্তু এই শ্রেণীর অবয়ব দ্বারা। যেখানে প্রধান চেতনা রূপে 'উর্বরতা' বা 'প্রজনন স্বত্তা' কাজ করেছিল বলে অনুমিত। আলোচ্য সামগ্রীক পর্ব জুড়ে কিন্তু এই শ্রেণীর অবয়বের প্রাসঙ্গিকতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রে। ইতিহাসের দীর্ঘ বিবর্তন অতিক্রম করে আজও এই অবয়বের ক্রমপ্রবহমানতা থেকে একাধারে এই শিল্পের নির্মাণ শৈলী ও সম্পৃক্ত চিন্তনের অপরিবর্তনশীল চরিত্রের আভাষ পাওয়া যায়।

সর্বোপরি সামগ্রীক চর্চার ভিত্তিতে বিষয়টি সম্পর্কে মূল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, এই বিপুল টেরাকোটা শিল্প বিকাশের পশ্চাতে আদতে এক বিশেষ চেতনা নিহিত ছিল তা হল 'উর্বরতা' বা 'প্রজনন স্বত্তা' তথা সুখ, সমৃদ্ধি, মঙ্গলময়তার আকাঙ্ক্ষা। সংসারে সার্বিক সুখ সমৃদ্ধি, বা যেকোনো ভয়, বিপদ থেকে সংরক্ষনের চেতনা সর্বদাই সাধারণ মানুষের চিন্তনে প্রাধান্য লাভ করে এবং সেইমত বিভিন্ন কালপর্বে নানান ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, প্রথা, আচার বিচারের উদ্ভব ঘটেছে। নিঃসন্দেহেই বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম নয়। আলোচ্য পোড়ামাটি অবয়বগুলি যে সমকালীন ধর্ম, সমাজ সবকিছুর সাথেই অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ছিল বলাবাহুল্য। আর বলা যায় এই সূত্রেই আদি ঐতিহাসিক বাংলা তথা ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্পধারায় পরিলক্ষিত হয় অসংখ্য মাতৃমূর্তির বিকাশ বা নারী শক্তির উপাসনা সংক্রান্ত ধারণা। কেননা 'উর্বরতা' বা 'প্রজনন স্বত্তা'র সাথে নারীর সংযোগ অবিচ্ছেদ্য, তেমনই মাতৃ রূপে সে সকল আশ্রয়, সংরক্ষণের আধার। ফলত খুব স্বাভাবিক উভয় চেতনা একত্রে সম্মিলিত হয়ে একাধিক 'দেবী' স্বত্তার বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন কালপর্যায়ে।

পূর্বল্লিখিত প্রাথমিক পর্বের হাতে গড়া মাতৃ মূর্তিগুলি যেমন সমগ্র আদি ঐতিহাসিক পর্ব জুড়ে স্বমহিমায় বিদ্যমান থেকেছে তেমনই পাশাপাশি দেখা গেছে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সমাজে নতুন ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটেছে যার প্রভাব পরিলক্ষিত পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রেও। মৌর্য বা বিশেষত শুঙ্গ শৈলীর প্রভাবে সেখানে কালক্রমে একাধিক বিচিত্র আঙ্গিকের নারী তথা 'মাতৃ' অবয়বের বিকাশ ঘটেছে যারা এই শিল্পধারার বৃহৎ স্থান জুড়ে বিদ্যমান। এই অবয়বগুলি বাহ্যিক রূপে পূর্ববর্তী হাতে গড়া মাতৃ অবয়ব অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিচিত্র ছাঁচের প্রয়োগ, জাঁকজমকপূর্ণ অলংকার ও বস্ত্রাদি, কেশবিন্যাস বা দৈহিক ভঙ্গিমায় তারা অপরিসীম রূপ

লাবণ্যের অধিকারিণী। বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা গেছে সেই সমস্ত অবয়বের সাথে পৃথক পৃথক প্রতীকেরও সংযোগ ঘটেছে যারা বহুলাংশে বাংলার পাশাপাশি সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকীয় সংস্কৃতিকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। তবে এই ধরণের অবয়বগুলির নাম বা পরিচিতির বিষয়টি বহুলাংশে জটিলতর কেননা বহুক্ষেত্রে এজাতীয় অবয়ব কখনো প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে কালের নিয়মে বিলীন হয়ে গেছে, কখনো অন্য দেবস্বত্তার অবয়বের সাথে অভিযোজিত হয়েছে আবার কখনো বা হয়তো নিজেরই প্রতীকের বিবর্তন ঘটেছে। একাধিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সম্ভবত এজাতীয় অবয়ব তার চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ফলত বর্তমানের প্রেক্ষিতে বা শিল্পশাস্ত্রের বিশ্লেষণ অনুযায়ী তাদের অনুসন্ধান সম্ভবপর নয়।

আলোচনা প্রসঙ্গে গবেষণা পত্রটিতে এই বিষয়ের উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে 'শ্রীলক্ষী', (সম্পদের দেবী/পদ্মসংলগ্না দেবী) 'ধান্যদেবী', (শস্যদেবী) 'বসুধারা'(মৎস্য দেবী/ জল দেবী) রূপে উল্লিখিত অবয়বগুলির রূপগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়, তমলুক সহ আলোচ্য পর্বে বাংলার বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত এজাতীয় অবয়বগুলি আদতে ছিল স্থানীয় লোকায়ত স্তরের নানান দেবদেবী। প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বাইরে বিভিন্ন সময়ে সমাজের অতি সাধারণ স্তরের মানুষের প্রয়োজন থেকে যাদের উদ্ভব ঘটেছে। তবে পরবর্তীতে বহুক্ষেত্রে যারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে সম্মিলিত হয়েছে বলেও অনুমান করা হয়ে থাকে। যেমন উপরিল্লিখিত এই সমস্ত লোকায়ত অবয়বের মূল প্রতীকগুলির (ধান, পদ্ম ইত্যাদি) পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্য সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর স্বত্তার মধ্যে একীকরণের সম্ভাবনার দিকটি অনুমান করা হয়। এছাড়া দেখা গেছে চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ বাংলার অন্যান্য প্রত্নস্থলগুলিতে বৃহৎ মাত্রায় পাওয়া গেছে নানান বিচিত্র ভঙ্গীতে বহুলাংশে উপরিউক্ত দেবী মূর্তির ন্যায় দৈহিক আঙ্গিক বিশিষ্ট সুসজ্জিত অলংকৃত যক্ষিণী অবয়ব। যারাও একাধারে উর্বরতা, সমৃদ্ধি, সংরক্ষনের উদ্দেশ্যেই উপাসিত হত বলে ধারণা করা যায় এবং বাংলায় প্রাপ্ত অবয়বসমূহের মধ্যে যাদের সংখ্যা সর্বাধিক। যা থেকে এই শ্রেণীর অবয়বের জনপ্রিয়তা বা এর সঙ্গে সম্পর্কিত চেতনার ব্যাপ্তি সম্পর্কে খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

সুতরাং এই যে বিপুল অবয়ব সমূহ এদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সকল অবয়বই আদতে উর্বরতার প্রতীক স্বরূপ বিকশিত। উপরিউক্ত অবয়বগুলির সাথে সম্পৃক্ত প্রতীকগুলি লক্ষ করলে দেখা যায় 'শ্রীলক্ষী' রূপে অভিহিত অবয়বের সহিত 'পদ্ম','মুদ্রা', ধান্যদেবীর সহিত 'শস্যদানা', মৎস্যদেবী/জলদেবীর সহিত 'মৎস্য', যক্ষিণী অবয়বের সহিত তাঁর কেশবিন্যাশে 'অস্ত্ররূপী চূড়া/শলাকার' ব্যবহার, এই সবকিছু আদতে সাধারণ মানুষের জীবন

যাপনের প্রয়োজনীয় সুখ, সমৃদ্ধি, উর্বরতা, সংরক্ষন বা প্রতিরক্ষার সহিত সম্পর্কিত। যেখানে সম্ভবত উক্ত কাম্য বস্তু লাভের আশায় এই ধরণের অবয়বের উপস্থাপনা ও উপাসনা করছে। ফলস্বরূপ পৃথক পৃথক 'দেবী' নয় বরং বলা শ্রেয় সার্বিকভাবে এক Pantheon গড়ে উঠেছিল যা মূলত নারী শক্তি কর্তৃক অধ্যুষিত।

আবার উপরিউক্ত এসকল নারী অবয়বের পাশাপাশি একাধিক তাৎপর্যপূর্ণ অবয়বের সন্ধান পেয়েছি আলোচ্য শিল্পক্ষেত্রে যাদের সাথে মানুষের বিশ্বাস, ধর্মচিন্তা জড়িত ছিল বলে অনুমান করা হয়। যার মধ্যে মধ্যে দেখা যায়-

(১) সুসজ্জিত অলংকারসম্পন্ন পক্ষযুক্ত নারী ও পুরুষ অবয়ব যাদের লক্ষ্মী, ব্রাহ্মণ্য দেবস্বত্তা সূর্যের প্রাথমিক রূপ, কামদেব, যক্ষ ইত্যাদি নানারূপে অনুমান করা হয়। আবার অপর কিছু অবয়বে ঘোড়াবাহিত রথে পরিণত রূপে অলংকৃত সূর্যের উপস্থিতিও কল্পিত। (২) মেদবহুল পেটযুক্ত, হাতে অর্থের থলি, কখনো পদ্ম কখনো বা পক্ষী, পানপাত্র ইত্যাদি সহযোগে কুবের। যারাও মূলত সম্পদ ও সমৃদ্ধির ধারণার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। (৩) হস্তীমুখ সম্পন্ন অবয়ব। (৪) হস্তী, ভেড়া প্রভৃতির পিঠে উপবিষ্ট রূপে একাধিক সুসজ্জিত অবয়ব যাদের ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য অবয়বের উপস্থাপনা রূপে কল্পনা হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায় ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রম ছাড়া এসকল অবয়বগুলিকে সাধারণত মানুষের বিশ্বাসের অঙ্গ রূপে বা তৎসম্পর্কিত ধর্মীয় চিন্তনের প্রতিচ্ছবি রূপে গন্য করা হয়ে থাকে। ইন্দ্র বা অগ্নির নিশ্চিত পরিচিতি নিয়ে সংশয় থাকলেও বা হস্তীমুখ সম্পন্ন অবয়বের চরিত্র নিয়ে দ্বন্দ থাকলেও তাদের বাহ্যিক উপস্থাপনা ও বহুল প্রাপ্তি থেকে এদের সহিত সম্পৃক্ত কাল্ট সংযোগকে স্পষ্ট রূপেই অনুমান করা যায়। ফলত এদের থেকেও সমৃদ্ধি বা উর্বরতার চেতনা যে বিচ্ছিন্ন ছিল এমনটা কখনোই বলা চলেনা। এছাড়া বেশ কিছু বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তির সন্ধান মেলে বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পক্ষেত্রে, যারা প্রথাগত আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় ধারার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও এর পশ্চাতে নিহিত বিশ্বাস বা আদর্শের অনুমান করা যেতে পারে। সুতরাং প্রাপ্ত বঙ্গীয় টেরাকোটা শিল্পে এসকল অবয়ব নির্মাণ যে নিছকই মানুষের খেয়াল নয়, অধিকাংশ অবয়বের পশ্চাতে এক পৃথক আদর্শ বা প্রয়োজনীয়তা নিহিত ছিল তার প্রমাণ উপরিউক্ত বিপুল অবয়বগুলি।

আবার দেখা যায় এই উর্বরতার চেতনার সহিত একাধিক অবয়বের উপস্থাপনা রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম সন্তান প্রসব ভঙ্গীতে উপস্থাপিত নারী অবয়বের উপস্থাপনা। যা থেকে খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায় তার সাথে সন্তান কামনা ও সন্তানের মঙ্গল চেতনা জনিত কিছু বিশ্বাস জড়িত বা উক্ত কোন ক্রিয়াকর্মের অপরিহার্য অঙ্গ রূপে সম্ভবত ব্যবহৃত হত এই শ্রেণীর অবয়বগুলি। সূক্ষ

তারতম্যে যার উপস্থাপনা মেলে বাংলা সহ উত্তর ভারতের একাধিক প্রত্নস্থলে (কৌশাম্বী, ভিটা প্রভৃতি) যা এর সহিত সম্পর্কিত মঙ্গল চেতনা জনিত দিকটিকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই প্রকার অবয়বের ক্ষেত্রে রূপগত যে পার্থক্যই থাকুক বা যে নামেই ('লজ্জাগৌরী'[২] , 'অদিতি উত্থনপদ'[৩]) অভিহিত করা হোক প্রধান তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এর সহিত নিহিত মূল চেতনা, যা নিশ্চিতরূপেই উর্বরতার সহিত সম্পর্কিত ছিল বলা বাহুল্য। তেমনই সন্তান সহযোগে একাধিক মাতৃ অবয়বের উপস্থাপনা লক্ষণীয় যাদেরও শিশুর সংরক্ষণ চেতনা বা রক্ষাকর্ত্রী দেবী রূপে গন্য করা হত বলে ধারণা করা যেতে পারে। এছাড়া উল্লেখ্য বাংলায় প্রাপ্ত পোড়ামাটি অবয়বের সিংহভাগ নারী অবয়বগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে তাদের বাহ্যিক রূপে দৈহিক আঙ্গিকের স্পষ্টতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেখানে তাদের সুস্পষ্ট স্তন, উন্মুক্ত নাভিদেশ ও প্রজনন অঙ্গ ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিমা বারংবার তার সহিত সম্পর্কিত 'উর্বরতা' র দিকটিকে ইঙ্গিতবাহী করে সন্দেহ নেই। চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ আদি ঐতিহাসিক বাংলার টেরাকোটা শিল্পক্ষেত্রের সর্বপ্রধান স্থান জুড়ে এই শ্রেণীর অবয়ব বিদ্যমান যারা নিঃসন্দেহে সমাজে সাধারণ মানুষের প্রাথমিক ধর্মচিন্তা বা বিশ্বাসের ফলশ্রুতি যারা বহুক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের আবির্ভাব স্বত্বেও দীর্ঘকালব্যাপী সমভাবে নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল নিশ্চিত।

দেখা যায় আলোচ্য পর্বে বাংলার সাধারণ স্তরের মানুষ তার আরাধ্য দেবদেবীর রূপায়নে কিংবা উক্ত নানান কর্মানুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধর্মীয় উপাদান সৃষ্টিতে মৃৎশিল্পের ব্যবহার করেছে। যার অনুরূপ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় বর্তমান কালপর্বেও যেখানে বিশেষ রূপে বাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকায়ত অবয়ব সহ আরাধ্য প্রধান দেবদেবীর অবয়বও নির্মিত হয়ে থাকে মৃত্তিকার মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যদিও আমরা ধরে থাকি প্রাচীন বঙ্গীয় প্রাপ্ত সকল অবয়ব অধিকাংশই সাধারণ মানুষের প্রাথমিক ধর্মচিন্তার ফলশ্রুতি বা সমকালীন ধর্মীয় ইতিহাসের পুনর্গঠনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কিন্তু বাংলায় বিকশিত এই শিল্পধারায় নির্মিত অবয়ব সমূহকে ঠিক প্রথাগত 'ধর্মীয় অবয়ব' আখ্যা দেওয়া যায় কিনা সে দিকটিও ভেবে দেখা দরকার। কেননা তা যেকোনো ধর্মীয় সীমানার বাইরে একান্তই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস, সুখ সমৃদ্ধি, ভীতি বা উর্বরতার চেতনা থেকে বিকশিত। তাই হয়তো বলা ভাল সার্বিক ভাবে আদতে মঙ্গল চেতনা কেন্দ্রিক বেশ কিছু কাল্ট ('শস্য' সম্পর্কিত, 'সম্পদ – সমৃদ্ধি' সংক্রান্ত, 'শিশুর রক্ষণ বা মঙ্গল' সম্পর্কিত, 'প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত' প্রভৃতি) এর বিকাশ ঘটেছিল আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় সমাজে। আবার এরই অন্তর্ভুক্ত ছিল একাধিক বিচিত্র অবয়ব, যার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয় এই বিপুল পোড়ামাটি শিল্প ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে।

অন্যদিকে অপর কিছু শ্রেণীর অবয়ব অবশ্য উল্লেখ্য আলোচ্য শিল্পক্ষেত্রে যাদের ভূমিকা অপরিসীম। আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্য দিয়ে সামাজিক দৃশ্যাবলী প্রতিফলিত হলেও তাদের চরিত্র কিন্তু কিছুটা সংশয়াত্মক, অর্থাৎ উপরিউক্ত অবয়বগুলিকে মোটামুটি সার্বিক রূপে উপাসনার অঙ্গ রূপে বা বিশেষ প্রতীকী লক্ষণ জড়িত ছিল বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেলেও এসকল অবয়বগুলির চরিত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ। যেমন- বিভিন্ন নৃত্যগীত, লোকানুষ্ঠান, কৃষি, শিকার, পক্ষী বা দর্পণ সহ মনুষ্য উপস্থাপনা, মিথুন ফলক কিংবা কাহিনীমূলক উপস্থাপনাগুলিকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। পূর্বেই এই সংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে যেখানে এই শ্রেণীর অবয়বগুলির পশ্চাতে নিহিত একাধিক প্রেক্ষিতের সম্ভাবনার উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ কতখানি প্রকাশিত সেদিকটি বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে। বলা বাহুল্য প্রাপ্ত সকল অবয়বই যে সমকালীন সমাজ সম্পর্কে ধারণা দেয় সন্দেহ নেই। কেননা পূর্বেও উল্লিখিত যেকোনো শিল্পধারার বিকাশ ঘটে নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপটে, যার প্রভাব উক্ত শিল্পক্ষেত্রে প্রকাশিত হতে বাধ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল তার প্রেক্ষিত বা চরিত্র; অর্থাৎ এপ্রকার অবয়বের বিকাশকে কোন পর্যায়ে ধরা যায়। পূর্বোক্ত অবয়ব সমূহের ন্যায় এগুলির সাথে মানুষের কিছু বিশ্বাস বা প্রতীকী চেতনা জড়িত ছিল নাকি সেগুলি নান্দনিক শিল্পকর্ম রূপে কেবল সমাজচিত্রের প্রতিফলন সে সংক্রান্ত সংশয়ের দিকগুলি পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে উত্থাপন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এজাতীয় আলোচনায় গৃহীত যেকোনো সিদ্ধান্তে সংশয় বা মতানৈক্য অবশ্যম্ভাবী। তা স্বত্তেও সমগ্র গবেষণা পত্রটির আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা চলে আদি ঐতিহাসিক পর্ব জুড়ে সার্বিকভাবে বাংলায় প্রাপ্ত এসকল টেরাকোটা অবয়বগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে কোনও না কোনওভাবে এর পশ্চাতে মানুষের বিশ্বাস তথা শুভ বা মঙ্গল চেতনার প্রেক্ষিতটি কিন্তু অব্যাহত রয়েই গেছে। উক্ত চেতনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রূপে এসকল উপাদানকে কল্পনা করা কখনোই সম্ভবপর নয়। যেমন কৃষির কথা যদি ধরা যায়, সমাজে ও পাশাপাশি টেরাকোটা শিল্পীদের নিকট উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আভাষ পাওয়া যায় তৎসংক্রান্ত একাধিক উপস্থাপনা থেকে। লক্ষ করলে দেখা যাবে আদতে কিন্তু মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনযাপন, উর্বরতার সাথে কৃষির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। ফলত নিঃসন্দেহেই তার সুরক্ষা বা সমৃদ্ধির চেতনা বিশেষ প্রাধান্য পাবে মানব জীবনে। পাশাপাশি শিকার বা নৃত্য-গীত তথা বিভিন্ন লোকানুষ্ঠানগুলি যেমন বিনোদনের অঙ্গ হতে পারে তেমনই তার সাথে জীবনধারণের চেতনা বা লৌকিক বিশ্বাস জড়িত থাকার সম্ভাবনাও প্রবল। যেখানে হয়তো নির্দিষ্ট কোনও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের অঙ্গ রূপে সেগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে যা সম্ভবত সাধারণ মানুষের নিকট শুভলক্ষণসম্পন্ন রূপে পরিগণিত হত। আবার বহুক্ষেত্রে দর্পণ

কিংবা পক্ষী (টিয়া, ময়ূর, রাজহাঁস) সহযোগে একাধিক উপস্থাপনা পরিলক্ষিত হয় চন্দ্রকেতুগড়ে। যাদের সাধারণ মানুষের জীবন চিত্র হিসেবে অনুমান করা হয় ঠিকই, কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে যাদুবিদ্যা জনিত ক্রিয়াকর্মে দর্পণের সংযোগ যেমন থাকে তেমনই বিভিন্ন পক্ষী সহযোগে উৎকীর্ণ অলংকৃত নারী অবয়বগুলির উপস্থাপনার সহিতও যে বিশেষ ধর্মীয় চেতনা বা বিশ্বাস জড়িত থাকতে পারে তা সহজেই অনুমানযোগ্য।

আর যে মিথুন শৈলী বা বিভিন্ন কাহিনী মূলক উপস্থাপনা সেক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে উর্বরতার চেতনা বা মঙ্গল চেতনা জড়িত ছিল। সম্ভবত মানুষ সেগুলিকে শুভ লক্ষণ হিসেবে নিজের সঙ্গে রাখছিল বা ঘরে রাখছিল, এই শ্রেণীর অধিকাংশ ফলকে মাথার উপরিভাগে ছিদ্রের উপস্থিতি থেকে তা দেওয়ালে টাঙানোর ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়। দেখা গেছে রতিক্রিয়ার দৃশ্য যেমন উপস্থাপিত তেমনই কিন্তু নারী পুরুষের স্বাভাবিক প্রেমময় মুহূর্তও উপস্থাপিত। খুব সম্ভবত সাধারণ মানুষের এজাতীয় উপস্থাপনার প্রতি এক শৈল্পিক আকর্ষণ থাকলেও পাশাপাশি এই বিশ্বাসও নিঃসন্দেহে ছিল এর প্রভাবে সন্তান প্রসব বা দাম্পত্য জীবন সুখী হবে। অপরদিকে বিভিন্ন কাব্য কাহিনী সম্বলিত ফলক ঘরে রাখলে তা থেকে সংসারে হয়তো শুভ প্রভাব পড়বে এবং হতেও পারে কোথাও গিয়ে এসব অবয়বকেও তারা ক্রমে উপাসনার অঙ্গে পরিণত করেছে। যদিও এগুলির জনপ্রিয়তা বা চাহিদা বৃদ্ধির সময়কাল বা প্রেক্ষিত একে নগরায়ন বা সমাজের ধনী পৃষ্ঠপোষকের সাথে সংযুক্ত করে ঠিকই কিন্তু তা স্বত্তেও এর সাথে সম্পৃক্ত চেতনাকে কখনোই অস্বীকার করা চলেনা। বলা বাহুল্য, উর্বরতার ধারণা বাদ দিয়ে কেবল নাগরিক শ্রেণীর বিলাশ, বিনোদনের অঙ্গ রূপে এগুলির উপস্থাপনা এমনটা মন্তব্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর চাহিদা বেড়েছে, নিত্য নতুন প্রযুক্তিতে নতুন কারিগরি জাঁকজমক এসেছে, বিভিন্ন অবয়বের বাহ্যিক রূপগত পরিবর্তন এসেছে কিন্তু সেক্ষেত্রেও মঙ্গল চেতনা অব্যাহত থেকেছে। শিল্পের উপাদান পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু সম্পৃক্ত চেতনা বা প্রেক্ষিত নয়। ক্রমে প্রয়োজন ভেদে নিঃসন্দেহে হয়তো কেবল সৌখিনতা বশত, বা নান্দনিকতা স্বরূপ কিছু অবয়বের বিকাশ ঘটেছে কিন্তু তা বহুলাংশে সীমিত। উক্ত সৌখিনতারও সর্বাধিক প্রয়োগ ঘটেছে ধর্মীয় অবয়বেই যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি, চিন্তন কাজ করেছে। সার্বিক সুখ সমৃদ্ধি ভালো থাকার প্রবণতা সম্পৃক্ত থেকেছে।

একটি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার, সমগ্র ভারতীয় প্রেক্ষাপটেই আদি ঐতিহাসিক পর্বে টেরাকোটা শিল্পধারায় ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ কিন্তু নগরায়ন বা বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি। দেবাঙ্গনা দেশাই বক্তব্য উল্লেখ্য, যেখানে তিনি দেখান উক্ত পর্বের অধিকাংশ টেরাকোটা সমৃদ্ধ অঞ্চল গুলিই নগরকেন্দ্র ছিল এবং তার পৃষ্ঠপোষকদের বৃহৎ অংশ ছিল

প্রতিপত্তিসম্পন্ন নাগরিক সম্প্রদায়। বিশেষ ভাবে শুঙ্গ পর্ব থেকে সমাজে বেশ কিছু শ্রেণী আর্থিকভাবে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে ফলত শিল্পক্ষেত্রে তাদের একটা আকর্ষণ বা প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আর স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের চাহিদা বা রুচি অনুযায়ী পোড়ামাটি উপকরণ উৎপাদনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।[৪] নিঃসন্দেহেই বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়। উল্লেখ্য, বাংলাতেও টেরাকোটা প্রাপ্তির প্রধান কেন্দ্রগুলি যথা- চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড়, তমলুক, হরিনারায়ণপুর ইত্যাদি কিন্তু অধিকাংশই মূলত সমৃদ্ধ নগরকেন্দ্র রূপেই পরিচিত। ফলত বলা বাহুল্য এই সূত্রেই মানুষের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন জাঁকজমকপূর্ণ, অলংকৃত অবয়বের ক্রমবিকাশ ঘটে সামাজিক ক্ষেত্রে। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে আদতে মূলগতভাবে পূর্বের ন্যায় মানুষের ধর্মীয় চেতনা বা মঙ্গলচেতনা সম্পন্ন অবয়বেরই বিকাশ ঘটেছে কিন্তু তার চরিত্র হয়ে উঠেছে অনেক বেশি মার্জিত, রুচি সম্পন্ন ও শৈল্পিক। পূর্ববর্তী অনাড়ম্বরের পরিবর্তে অনুপ্রবেশ ঘটেছে শহুরে চাকচিক্যের। যেমন- 'অলংকৃত যক্ষিণী' বা 'শ্রীলক্ষ্মী' বা 'ধান্যদেবী'র কথা যদি বলা যায় সেক্ষেত্রে বলা চলে পূর্বের নগ্ন হাতে গড়া মাতৃদেবীর অপেক্ষা পরিবর্তন ঘটেছে তার রূপগত বৈচিত্র্যে, নগ্ন রূপের পরিবর্তে অলংকার, বস্ত্রাদি ইত্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু তার ন্যায় উর্বরতা বা সমৃদ্ধির চেতনাই কিন্তু সম্পৃক্ত থেকেছে প্রতিটি অবয়বে। বলা চলে সামাজিক বিবর্তনে জীবন ধারণের প্রয়োজনে কিছু বিশেষীকরণ ঘটেছে মানব চেতনায় যার প্রতিফলন এই অবয়ব সমূহ ।

আর অপর একটি উল্লেখ্য বিষয় হল সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্রে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগের সুস্পষ্ট প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্প তথা সমগ্র সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। উন্নত প্রযুক্তি, কলাকৌশল, অলংকরণের মূল আদর্শ সাধারণত মধ্য গাঙ্গেয় সংস্কৃতি থেকেই আগত বলে মনে করা হয়ে থাকে। আলোচনা সূত্রে দেখা গেছে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়ে শিল্পক্ষেত্রে এক সার্বিক সংজ্ঞা ও প্রতীকের বিস্তার ঘটেছে। উভয় ক্ষেত্রেই কিছু উল্লেখযোগ্য অবয়বের বিস্তার উক্ত অবয়বের বিকাশের পশ্চাতে নিহিত সুদৃঢ় চিন্তন বা আদর্শের দিকটিকেই প্রতিফলিত করে। যেমন উভয় অঞ্চলে আবিষ্কৃত একই প্রতীকী সম্পন্ন হাতে গড়া নিরলংকার মাতৃ অবয়ব, অর্ধ মানবী অর্ধ সর্পিণী অবয়ব, পঞ্চচূড়া যক্ষিণী অবয়ব, শস্য সংলগ্না নারী অবয়ব, পদ্মসংলগ্না নারী অবয়ব, সন্তান প্রসব অবয়ব, পক্ষযুক্ত অবয়ব, মিথুন অবয়ব, বিভিন্ন পশু অবয়ব বা অন্যান্য সমগোত্রীয় একাধিক অবয়বের প্রাপ্তি তার সাথে সম্পর্কিত উর্বরতার চেতনাকে কিন্তু আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা ব্যাপী তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন 'কাল্ট' এর উপস্থিতির প্রমাণ দেয় অনুমান করা চলে। অর্থাৎ বঙ্গীয় শিল্প, সংস্কৃতি যে কেবল নির্দিষ্ট সীমানাতেই আবদ্ধ ছিলনা তার ব্যপ্তি বিপুল ও বিস্তীর্ণ তার প্রমাণ দেয় এই বিপুল

টেরাকোটা অবয়ব সমূহ। তবে অপর একটি বিষয়ও খেয়াল রাখা প্রয়োজন এসকল অবয়বের পাশাপাশি উত্তর ভারতীয় প্রেক্ষাপটে কিছু নান্দনিক শিল্প উপাদান স্বরূপ মদ্যপান,সার্কাস বা সমাজের বিশিষ্ট মানুষদের প্রতিকৃতি প্রভৃতির ন্যায় বেশ কিছু অবয়বের বিকাশ ঘটে যাদের সহিত ধর্মীয় সংযোগ সম্পৃক্ত নেই বলেই মনে করা যায়, বাংলার ক্ষেত্রে কিন্তু তা অনুপস্থিত। ফলত উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বঙ্গীয় টেরাকোটাকে পুরোপুরি বিচার না করে আঞ্চলিক ঐতিহ্য বিকাশের দিকটি খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

সুতরাং বলা যায় বঙ্গীয় টেরাকোটা শিল্পধারা চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় সহ সমগ্র বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন,সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক বিস্তীর্ণ চিত্র তুলে ধরে। যেখানে একাধারে মানুষের ধর্মীয় আদর্শ-রীতিনীতি, সমাজে প্রচলিত কৃষি, শিকার, শিল্প, বাণিজ্য, প্রচলিত নৃত্য-গীত-বাদ্য, লোকানুষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু পাশাপাশি বলা চলে উক্ত উপস্থাপনার পশ্চাতে নিহিত চিন্তনের ভূমিকা অসামান্য। বলা যায় সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, লক্ষণ, মঙ্গলচিন্তা সর্বদাই কিন্তু সমকালীন পোড়ামাটি শিল্পধারার বৃহত্তর অংশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকেছে। আর এই আদর্শই পোড়ামাটি শিল্পকে ধর্মীয়, সামাজিক- সাংস্কৃতিক তথা সমগ্র ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিশেষ স্মরণীয় স্থান প্রদান করে সন্দেহ নেই। ভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার, ভিন্ন অঞ্চল, সময়কাল বা ভিন্ন সমাজব্যবস্থাতেও এই অবয়ব নির্মাণের পশ্চাতে নিহিত প্রধান ভিত্তি কিন্তু বহুলাংশে একই থেকেছে। উপরিল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট যে, অবয়ব হাতে গড়া হোক কিংবা ছাঁচে গড়া, নিরলংকার হোক কিংবা জাঁকজমকপূর্ণ অলংকারসম্পন্ন, সুস্পষ্ট প্রতীক সম্পন্ন হোক কিংবা প্রতীকী লক্ষণ বিহীন প্রতিটি অবয়বই কিন্তু নিজ প্রেক্ষিতে প্রানবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত। সাধারণত ২ধরনের অবয়ব পাওয়া যাচ্ছে সমগ্র পর্যায়ে, যথা- প্রাপ্ত অবয়বগুলির বৃহৎ অংশ যেমন শস্যদেবী, মৎস্যদেবী, সর্পিণী অবয়ব, সূর্য, শ্রী বা যক্ষ-যক্ষিণীর ন্যায় উল্লেখযোগ্য প্রতীক সম্পন্ন অবয়বগুলি সাধারণ মানুষের নির্দিষ্ট উপাসনা বা পূজার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। তেমনই আবার অন্যান্য উপাদান যথা – মিথুন ফলক, সন্তান প্রসব ফলক বা কাহিনী সম্বলিত ফলক বা উপরিল্লিখিত অন্যান্য এই শ্রেণীর অবয়বগুলি কিন্তু আবার শুভ লক্ষণ হিসেবে গন্য করা হত বলে মনে করা হয়। ফলত এই শিল্পধারায় বিপুল অবয়বের মধ্যে পৃথক ভাবে কোনটি ধর্মীয় চেতনা সম্পন্ন অবয়ব আর কোনটি তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত সেভাবে বিশ্লেষণ করা মুশকিল। প্রাচীন সমাজে মানুষ এগুলি উৎপাদন করত নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য থেকে যা ছিল অবশ্যই বিলাশ বিনোদন অপেক্ষা বৃহত্তর। অধিকাংশ অবয়বই এক প্রগাঢ় চরিত্রের অধিকারী, যাদের বিকাশের পশ্চাতে বিশেষ চিন্তন বা আদর্শ জড়িত ছিল। ফলত কিছু অবয়বের ধর্মীয় উপস্থাপনা বা প্রতীকী চেতনা সংশয়াত্মক মনে

হলেও উর্বরতা বা মঙ্গলচেতনা জনিত তাৎপর্য তাদের ধর্মীয় আদর্শ বহির্ভূত কেবলই নান্দনিক অবয়ব হিসেবে গন্য করার ঘোর পরিপন্থী সন্দেহ নেই। শেষে একটি কথা অবশ্যই উল্লেখ্য, সমগ্র গবেষণা পত্রটির আলোচনা সূত্রে বলা যায় এই শিল্পক্ষেত্র এমন এক ধারার অন্তর্গত যেখানে বৈদিক সংস্কৃতি ও পরবর্তী পৌরাণিক ঐতিহ্যের মধ্যবর্তী এক পর্যায় সম্পৃক্ত। যার মধ্যে দিয়ে এই উভয় সংস্কৃতির থেকে আলাদা এক স্থানীয় লৌকিক সংস্কৃতি, চিন্তন, ঐতিহ্য বিশেষ রূপে প্রাধান্য পেয়েছে আর এই প্রবনতাই আদি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় পোড়ামাটি শিল্পের প্রধান বিশেষত্ব।

তথ্যসূত্র

১) গৌতম সেনগুপ্ত, সীমা রায়চৌধুরী, শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত "এলোকোয়েন্ট আর্থ", আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল , কলকাতাঃ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম , ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৬-১৩

২) সি আর বোলন, 'ফর্মস অফ দ্য গডেস লজ্জাগোরী ইন ইন্ডিয়ান আর্ট', মোতিলাল বানারসী দাস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লী, ১৯৯৭

৩) স্টেলা ক্র্যামরিশ, ' অ্যান ইমেজ অফ অদিতি উত্তনপদ', ইন "এক্সপ্লোরিং ইন্ডিয়াস সেক্রেড আর্ট", ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভ্যানিয়া পাবলিকেশন,১৯৮৩ পৃষ্ঠা- ১৪৮-১৫৮

৪) দেবাঙ্গনা দেশাই, 'ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস ইন দেয়ার সোশ্যাল কন্টেক্সট (সি. ৬০০ বিসিই – সি ই ৬০০)', ইন "আর্ট অ্যান্ড আইকনঃ এসেস অন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট", আরিয়ান বুকস ইন্টারন্যাশনাল , ২০১৩ পৃষ্ঠা- ৫৯

গ্রন্থপঞ্জী

প্রাথমিক উপাদান (Primary Sources)

- আলম, মহম্মদ শফিকুল ও Jean-Francois SALLES সম্পাদিত "ফ্রান্স বাংলাদেশ জয়েন্ট ভেঞ্চার এক্সকাভেশানস্ অ্যাট মহাস্থানগড়", ফার্স্ট ইন্টেরিম রিপোর্ট ১৯৯৩-১৯৯৯, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি,বাংলাদেশ, ২০০১
- ইন্ডিয়ান আর্কিওলজিঃ আ রিভিউ, (আই.এ.আর)এক্সপ্লোরেশান অ্যান্ড এক্সকাভেশানস্ঃ চন্দ্রকেতুগড়, ওয়েস্ট বেঙ্গল– ১৯৫৬-৫৭, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী, পৃষ্ঠা - ২৯-৩০
- ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৫৭-৫৮, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫১-৫৩
- ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৫৮-৫৯, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৫-৫৬
- ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৫৯-৬০, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫০-৫২
- ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬০-৬১ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৩৯-৪০
- ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬১-৬২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৬২-৬৩
- ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬২-৬৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৬-৪৭
- ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬৩-৬৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৩-৬৫
- ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬৪-৬৫ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫২-৫৩
- ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬৫-৬৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৯-৬০
- ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬৬-৬৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৮
- ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি: আ রিভিউ (আই.এ.আর) – ১৯৬৭-৬৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ৫০
- ইসলাম, সিরাজুল সম্পাদিত, 'বাংলাপিডিয়া', বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড- ৮, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

- ভাণ্ডারকর ডি.আর – 'মরিয়ান ব্রাহ্মী ইনস্ক্রিপশন অফ মহাস্থান', ; হীরানন্দ শাস্ত্রী, কে.এন.দীক্ষিত, এন.পি.চক্রবর্তী সম্পাদিত "এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা", খন্ড- ২১ (১৯৩১-৩২), দ্য ডিরেক্টর জেনারেল আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, জনপথ, নিউ দিল্লী, ১৯৮৪ (পুনর্মুদ্রণ)
- মুখার্জ্জী রমারঞ্জন, এস.কে.মাইতি - 'করপাস অফ বেঙ্গল ইনস্ক্রিপশনস,' বিয়ারিং অন হিস্ট্রি এন্ড সিভিলাইজেশন অফ বেঙ্গল, ফার্মা কে এল এম, ক্যালকাটা ১৯৬৭

- **পত্র পত্রিকা**

  - পুরালোক বার্তা (আঞ্চলিক ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বার্ষিক পত্র) – সপ্তম সংখ্যা, ২০১৫-২০১৬
  - বর্তমান পত্রিকা (দৈনিক বাংলা সংবাদ পত্র) - ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৭

সহায়ক সূত্র (Secondary Sources)

ইংরেজি গ্রন্থ

- আকমাম, আফরোজ– 'মহাস্থান', বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ঢাকা, ২০১৬
- আগরওয়াল, ভি এস- 'মথুরা টেরাকোটাস্', পৃথিবী প্রকাশনী, বারানসী, ১৯৩৬
- আগরওয়াল, শিবানী - 'টেরাকোটাস ফ্রম মথুরা অ্যান্ড অহিচ্ছত্রঃ অ্যান আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি (৪০০ বিসি টু সেভেন্থ/এইটথ্ সেঞ্চুরি এডি)' ,, উপিন্দর সিং অ্যান্ড নয়নজ্যোৎ লাহিড়ী এডিটেড "এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া নিউ রিসার্চ", অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী , ২০০৯
- আলম, মহম্মদ শফিকুল- 'সিরামিকস ফ্রম মহাস্থানঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি', জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,আই–সি-এস-বি-এ খণ্ড- ৪, ১৯৯৯

- আহমেদ, নাজিমুদ্দিন - 'মহাস্থান', ঢাকা, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম ১৯৮১
- কল, সোনালিকা সম্পাদিত- 'কালচারাল হিস্ট্রি অফ আর্লি সাউথ এশিয়া', ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড,২০১৪
- কলা, এস সি - 'টেরাকোটাস অফ নর্থ ইন্ডিয়া' আগম কলা প্রকাশন,দিল্লী, ১৯৯৩
- কুমারস্বামী, এ কে – ' Yakshas' , খণ্ড – ১ এবং ২ , মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিকেশন, নিউ দিল্লী, ২০০১
- কুমারস্বামী, এ কে – 'হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইন্দোনেশিয়ান আর্ট', মুন্সীরাম মনোহরলাল পাবলিকেশন, নিউ দিল্লী, ১৯৭২
- ক্র্যামরিশ, স্টেলা -'ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস' ; বারবারা স্টোলার মিলার সম্পাদিত, "এক্সপ্লোরিং ইন্ডিয়াস সেক্রেড আর্ট"- সিলেক্টেড রাইটিংস অফ স্টেলা ক্র্যামরিশ, ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস অ্যান্ড মোতিলাল বানারসী দাস প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী ১৯৯৪
- গঙ্গোপাধ্যায়, কৌশিক - 'টেরাকোটা অবজেক্টস ইন আর্কিওলজিঃ অ্যান এথনো আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি', গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত – "আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, নিউ পার্সপেক্টিভস", সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, কলকাতা – ২০০২
- গুপ্তা, পি এল - 'গাঙ্গেটিক ভ্যালী টেরাকোটা আর্ট', পৃথিবী প্রকাশনী, বারাণসী-৫(ইন্ডিয়া), ১৯৭২
- ঘোষ, সুচন্দ্রা - 'হেলেনেস্টিক এলিমেন্ট ইন দ্য আর্ট অফ বেঙ্গলঃ আ ফার্দার এভিডেন্স', জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, খন্ড- ৭, দ্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডি অফ বেঙ্গল আর্ট, ২০০২
- চক্রবর্তী রণবীর – 'মেরিটাইম ট্রেড ইন হর্সেস ইন আর্লি হিস্টোরিকাল বেঙ্গলঃ আ সিল ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়' ; "প্রত্নসমীক্ষা", খন্ড- ১ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম গভঃ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৯২

- চক্রবর্তী, দীলিপ কুমার , কালম্যান গ্লান্টয্ (Kalman Glantz) – 'ইরোটিক টেরাকোটাস্ ফ্রম লোয়ার বেঙ্গল', ; ডি সি সরকার সম্পাদিত, 'জার্নাল অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি', ভলিউম- ৫, পার্টস- ১-২, ডিপার্টমেন্ট অফ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, ১৯৭২
- চক্রবর্তী, রণবীর – 'মেরিটাইম ট্রেড অ্যান্ড ভয়েজেস ইন এনসিয়েন্ট বেঙ্গল' ; "ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি", এন ডি মনোহরলাল পাবলিকেশন, ২য় মুদ্রণ, ২০০৬
- চক্রবর্তী, রনবীর- 'ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি', মনোহর পাবলিকেশন, ২০০২
- চক্রবর্ত্তী, দিলীপ কুমার – 'আর্কিওলজিক্যাল জিওগ্রাফি অব দ্য গঙ্গা প্লেইন' দ্য লোয়ার এন্ড দ্য মিডিল গঙ্গা, পার্মানেন্ট ব্ল্যাক, দিল্লী-২০০১
- চক্রবর্ত্তী, দিলীপ কুমার- 'এনসিয়েন্ট বাংলাদেশ', আ স্টাডি অফ দ্য আর্কিওলজিক্যাল সোর্সেস উইথ এন আপডেট অন বাংলাদেশ আর্কিওলজি ১৯৯০-২০০০, দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১
- চট্টোপাধ্যায়, ব্রজদুলাল - 'স্টাডিং আর্লি ইন্ডিয়া' আর্কিওলজি, টেক্সটস্ অ্যান্ড হিস্টরিকাল ইস্যুস, পার্মানেন্ট ব্ল্যাক পাবলিশার্স, দিল্লী, ২০১১- ৩য় সংস্করণ
- চৌধুরী, সীমা রায় - 'আর্লি হিস্টোরিক টেরাকোটাস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ স্টাডি ইন থিমস্ অ্যান্ড মোটিফস', "প্রত্নসমীক্ষা", খণ্ড- ৪ ও ৫, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম গভঃ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৯৫-৯৬
- চৌধুরী, সীমা রায় - 'আর্লি হিস্টোরিক টেরাকোটাস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ স্টাডি ইন থিমস্ অ্যান্ড মোটিফস'; "প্রত্নসমীক্ষা", খণ্ড- ৪ ও ৫, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম গভঃ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৯৫-৯৬
- জাহান, শাহনাজ হুসেন - 'বেঙ্গল অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান ওসিয়ান মেরিটাইম ট্রেড নেটওয়ার্ক ডিউরিং দ্য আর্লি হিস্টোরিক পিরিয়ড', ইন গৌতম সেনগুপ্ত ও শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত "আর্কিওলজি অফ আর্লি হিস্টোরিক সাউথ এশিয়া" প্রগতি পাবলিকেশানস্ এবং সেন্টার

ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিস অ্যান্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত, নিউ দিল্লী,২০০৮

- দত্ত রীতা – 'ইরোটিক প্লাকস্ ফ্রম চন্দ্রকেতুগড় ইন দ্য কালেকশন অন ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম'; "জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট", খণ্ড- ১১-১২, ২০০৬-২০০৭
- দে গৌরীশঙ্কর, শুভ্রদীপ দে- 'চন্দ্রকেতুগড়' আ লস্ট সিভিলাইজেশন -সাগ্নিক বুকস, খন্ড-প্রথম ও দ্বিতীয়, ২০০৪ ,কলকাতা
- দে গৌরীশঙ্কর, শুভ্রদীপ দে- 'ন্যারেটিভ প্লাকস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়' ; "জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট", খণ্ড- ৬, ২০০১
- দে, গৌরীশঙ্কর - 'উইংগড্ ডিভিনিটিস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়', জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট,খণ্ড-১৩-১৪ দ্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডি অফ বেঙ্গল আর্ট,২০০৮-২০০৯ পৃষ্ঠা- ৫৯-৬৪
- দেশাই, দেবাঙ্গনা - 'এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস ইন দেয়ার সোশ্যাল কনটেক্সট' (৬০০ বি সি ই – সি ই ৬০০) ইন "আর্ট অ্যান্ড আইকনঃ এসেস অন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট", আরিয়ান বুকস ইন্টারন্যাশনাল , ২০১৩
- নিউম্যান, এরিখ - 'দ্য গ্রেট মাদার'- অ্যান অ্যানালিসিস অফ দ্য আর্কিটাইপ,(র‍্যালফ ম্যান্সিম অনুবাদিত), প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪
- বসু, শক্তি কালী- 'ডেভেলপমেন্ট অফ আইকনোগ্রাফি ইন প্রি-গুপ্ত বঙ্গ', পুঁথি পুস্তক প্রকাশনী, কলকাতা,২০০৪
- বিশ্বাস , এস এস 'টেরাকোটা আর্ট অফ বেঙ্গল' , আগম কলা প্রকাশনী, দিল্লি,১৯৮১
- ব্যানার্জী, অরুন্ধতী - "ইমেজ, অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড মোটিফস, স্টাডিস ইন আর্লি ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড নিউমিসমেটিকস্", খন্ড-১, সন্দীপ প্রকাশন, দিল্লী ,১৯৯৩ প্রথম মুদ্রণ
- ব্যানার্জী, জে এন - 'দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইকনোগ্রাফি' , মুন্সীরাম মনোহরলাল প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী, ১৯৭৪
- ব্যানার্জ্জী, অরুন্ধতী- 'আর্লি ইন্ডিয়ান টেরাকোটা আর্ট', ২০০০ -৩০০০ বিসি, নর্দান-ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া, হারমন পাবলিকেশন হাউস,নিউ দিল্লী, ১৯৯৪

- ব্যুসাক, এম এফ (Boussaac, M F) ও স্যান্ড্রিন গিল- 'মোল্ডেড টেরাকোটা প্লাকস্ ফ্রম মহাস্থান', জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, খন্ড-৬, ২০০১
- ভট্টাচার্য, অমিতাভ - 'ট্রেড রুটস অফ এনসিয়েন্ট বেঙ্গল' ; অশোক দত্ত সম্পাদিত "হিস্টরি অ্যান্ড আর্কিওলজি অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া", বুকস অ্যান্ড বুকস ,নিউ দিল্লী, ১৯৯৮
- ভট্টাচার্য, অশোক কুমার- 'টেরাকোটাস্ অফ বেঙ্গলঃ শুঙ্গ কুষান পিরিয়ড' ; প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত, "ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড", মার্গ , ২০০২
- ভট্টাচার্য, এন এন – 'ইন্ডিয়ান মাদার গডেস', ইন্ডিয়ান স্টাডিস, পাস্ট অ্যান্ড প্রেসেন্ট, কলকাতা, ১৯৭১
- ভট্টাচার্য, শ্রেয়সী - 'মেরিটাইম পোর্টস অ্যান্ড পলিটিক্যাল অথরিটি ইন আর্লি হিস্টোরিক কোস্টাল বেঙ্গলঃ এক্সপ্লোরিং সার্টন হিস্টোরিকাল ইস্যুস' ; ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় এডিটেড "পার্সপেক্টিভস অফ ইন্ডিয়ান হিস্টরি" , প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা, ২০০৬
- মজুমদার, রমেশচন্দ্র – 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' (ভলিউম ১), দ্য ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা পাবলিশার্স, মে,১৯৪৩
- মিশ্র, আর এন - 'এনসিয়েন্ট আর্টিষ্ট অ্যান্ড আর্ট-অ্যাক্টিভিটি', ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডি, ১৯৭৫
- মুখার্জ্জী, সমীর কুমার - 'আ নোট অন সাম বুদ্ধিষ্ট অ্যান্টিকুইটিস ইন টেরাকোটা ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল', জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, ১ম খন্ড, দ্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডি অফ বেঙ্গল আর্ট,১৯৯৬ পৃষ্ঠা- ৮৫-৮৭
- মুখার্জ্জী, সমীর কুমার - 'টেরাকোটা আর্ট ইন দ্য গাঙ্গেটিক ভ্যালী আন্ডার দা কুষানাস', প্রতাপাদিত্য পাল সম্পাদিত, "ইন্ডিয়ান টেরাকোটা স্কাল্পচারঃ দ্য আর্লি পিরিয়ড", মার্গ, খণ্ড-৫৪, নং-১, ২০০২
- মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ – 'আর্লি মেরিটাইম ট্রেড অফ বঙ্গ – আ রিভিউ অফ দ্য ডাটা' ; "প্রত্নসমীক্ষা", খণ্ড- ২-৩ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম গভঃ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ১৯৯৩-১৯৯৪

- মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ - 'নিউ এপিগ্রাফিক অ্যান্ড পেলিওগ্রাফিক ডিসকভারিস', "প্রত্নসমীক্ষা"- ১ম খন্ড, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি , গভর্মেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা,১৯৯২
- রহমান, শাহ সুফী মোস্তাফিজুর - 'রিসেন্ট ডিসকভারি অফ গ্লাস বিডস ফ্রম মহাস্থানগড়ঃ অ্যান আর্কিওলজিক্যাল পার্সপেকটিভ', জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট , আই–সি-এস-বি-এ, খন্ড-৪, ১৯৯৯
- রহমান, শাহ সুফী মোস্তাফিজুর - 'আর্কিওলজিকাল ইনভেস্টিগেশন ইন বোগড়া ডিসট্রিক্ট' , (ফ্রম আর্লি হিস্টোরিক টু আর্লি মিডিয়েভাল পিরিয়ড) , স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডি অফ বেঙ্গল আর্ট পাবলিকেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ ২০০০
- রায় চৌধুরী, সীমা - 'স্টাইল এন্ড ক্রোনোলজি': প্রবলেমস্ ইন ইভলভিং আ টেম্পোরাল ফ্রেমওয়ার্ক ফর দ্য আর্লি হিস্টোরিকাল টেরেকোটাস ফ্রম বেঙ্গল' ; গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত - 'আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া , নিউ পার্সপেক্টিভস " , সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, কলকাতা – ২০০২
- রায়, সুধাংশু কুমার - 'দ্য রিচুয়াল আর্ট অফ দ্য ব্রতস অফ বেঙ্গল', ফার্মা কে এল এম প্রকাশনা, কলকাতা, জানুয়ারি-১৯৬১
- রায়, হিমাংশুপ্রভা - 'দ্য আর্কিওলজি অফ সীফেয়ারিং ইন এনসিয়েন্ট সাউথ এশিয়া, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৩
- শর্মা, আর সি – 'মথুরা অ্যান্ড চন্দ্রকেতুগড় টেরাকোটাস' ; "জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট", খণ্ড-৭, ২০০২
- শর্মি চক্রবর্তী, 'চন্দ্রকেতুগড়-আ সাইট ইন লোয়ার বেঙ্গল', ; গৌতম সেনগুপ্ত ও শীনা পাঁজা সম্পাদিত - 'আর্কিওলজি অব ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, নিউ পার্সপেক্টিভস", সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, কলকাতা – ২০০২
- শ্রীবাস্তব, এস কে - 'টেরাকোটা আর্ট ইন নর্দান ইন্ডিয়া', পরিমল পাবলিকেশন, দিল্লী, ১৯৯৬

- সত্তর, নুর বানো - 'ফরেন ইনফ্লুয়েন্স অ্যাস নোটিশড অন সাম ইউনিক টেরাকোটা ফিগারিনস ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়', জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, খণ্ড- ৯-১০, ২০০৪-২০০৫
- সরস্বতী, সরসী কুমার – 'আর্লি স্কাল্পচার অফ বেঙ্গল', সম্বোহী পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৬২ পৃষ্ঠা- ৯৩-৯৫
- সহায়, ভগবন্ত – 'আইকনোগ্রাফি অফ সাম ইম্পর্টেন্ট মাইনর হিন্দু অ্যান্ড বুদ্ধিষ্ট ডিটিস', অভিনব পাবলিকেশন, নিউ দিল্লী, ১৯৭৫
- সেনগুপ্ত গৌতম, সীমা রায়চৌধুরী, এবং শর্মি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'এলোকোয়েন্ট আর্থ', আর্লি টেরাকোটাস ইন দ্য স্টেট আর্কিওলজিকাল মিউজিয়াম ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতাঃ ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিয়াম, ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড সেন্টার ফর আর্কিওলজিকাল স্টাডিজ এন্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ২০০৭, পৃষ্ঠা-৬-১৩
- সেনগুপ্ত, অর্পুঠারানী - 'আর্ট অফ টেরাকোটাঃ কাল্ট অ্যান্ড কালচারাল সিন্থেসিস ইন ইন্ডিয়া', আগম কলা প্রকাশন ২০০৫
- হক, এনামুল- 'মহাস্থানগড়' ; প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, " বেঙ্গল সাইট অ্যান্ড সাইটস", নিউ দিল্লী : মার্গ ,২০০৩
- হক, এনামুল - 'দ্য আর্ট হেরিটেজ অব বাংলাদেশ ', দ্য ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডি অব বেঙ্গল আর্ট, ঢাকা, বাংলাদেশ- ২০০৭
- হক, এনামুল- 'চন্দ্রকেতুগড়' ; প্রতাপাদিত্য পাল এবং এনামুল হক সম্পাদিত, "বেঙ্গল সাইট এন্ড সাইটস্" নিউ দিল্লী, মার্গ ,২০০৩
- হক, এনামুল- 'চন্দ্রকেতুগড়ঃ আ ট্রেজার হাউস অব বেঙ্গল টেরেকোটাস', স্টাডিস ইন বেঙ্গল আর্ট সিরিজ: নং-৪, আই–সি-এস-বি-এ ঢাকা ২০০১
- হোসেন, মহম্মদ মোশারফ - 'রিসেন্ট ডিসকভারি অফ আ হোর্ড অফ পাঞ্চ মার্কড কয়েনস অ্যাট মহাস্থানগড়', জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট, খণ্ড- ৪, ১৯৯৯
- Jean yves Breuil, Jean Francois Salles – 'এক্সকাভেশনস্ অ্যাট মহাস্থানগড়: এভিডেন্স অফ সাম স্ট্রাটিগ্রাফিকাল ডাটা', *'জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট'*, আই–সি-এস-বি-এ, খণ্ড- ৬, ২০০১

- Salles Jean Francois - 'এক্সকাভেশনস্ অ্যাট মহাস্থানগড়: নিউ এভিডেন্স অফ কন্ট্যাক্টস উইথ দ্য গঙ্গা ভ্যালী' , "জার্নাল অফ বেঙ্গল আর্ট", আই–সি-এস-বি-এ, খণ্ড- ৪, ১৯৯৯
- Salles Jean Francois, Marie Francoise Boussaac, Jean yves Breuil - 'মহাস্থানগড় (বাংলাদেশ) অ্যান্ড দ্য গাঙ্গেস ভ্যালি ইন্ দ্য মরিয়ান পিরিয়ড' 'আর্কিওলজি অফ ইষ্টার্ণ ইন্ডিয়া" নিউ পার্সপেক্টিভস", সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিস এন্ড ট্রেনিং ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, কলকাতা – ২০০২

বাংলা গ্রন্থ

- ঘোষ, দেবপ্রসাদ – 'ভারতীয় শিল্পধারা' (প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তর ভারত) , সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৬
- দাশগুপ্ত, পরেশ চন্দ্র – 'প্রাগৈতিহাসিক বাংলা' অনিমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১
- দে, গৌরীশঙ্কর ও শুভ্রদীপ দে' -প্রসঙ্গঃ প্রত্ন প্রান্তর চন্দ্রকেতুগড় , 'বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স ,কলকাতা, ২০১৩
- প্রামাণিক, শ্যামল কুমার – ' পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস' , ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০
- বন্দ্যোপাধ্যায়, দোয়েল – 'দক্ষিণ বঙ্গের বাণিজ্যিক বিকাশে চন্দ্রকেতুগড়ঃ একটি প্রত্নসমীক্ষা' ; অনিরুদ্ধ রায় সম্পাদিত "ইতিহাস অনুসন্ধান", পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০৯, খণ্ড- ২৩
- বিদ্যাভূষন, অমূল্যচরণ - 'লক্ষ্মী ও গনেশ', পুরোগামী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬০
- চট্টোপাধ্যায়, সাগর - 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পুরাকীর্তি' , প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার- তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা ২০০৫

- মজুমদার, রমেশচন্দ্র– ‘বাংলাদেশের ইতিহাস’ প্রাচীন যুগ (১ম খন্ড), জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২
- মণ্ডল, কৃষ্ণকালী - ‘দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল’ , দক্ষিণ ২৪ পরগণা প্রত্নইতিহাস সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০২, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা বইমেলা
- মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ - ‘ বঙ্গ বাঙ্গালা ও ভারত’ , প্রগ্রেশিভ পাবলিশার্স কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০০
- মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ - লোকশিল্প বনাম “উচ্চ” মার্গীয় শিল্প প্রাক-গুপ্তবঙ্গের প্রেক্ষাপটে, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ১৯৯৯
- যাকারিয়া, আব্দুল কালাম মোহাম্মদ - ‘ বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ’ , বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪
- রায়, নীহার রঞ্জন - ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’,আদিপর্ব , দে’জ প্রকাশনী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৪০২
- রহমান, শাহ সুফী মোস্তাফিজুর সম্পাদিত – ‘প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য’ , বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭